“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

একাদশ বর্ষ]

[মূল্য দেড় টাকা

হিমানী প্রেস

মুদ্রাকর—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,

৮৩, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং,

৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,—কলিকাতা।

নিবেদন

বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক এবার নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতির ভূমিকা লিখিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন কিন্তু পুস্তক প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা আগেও যখন তাহা আসিয়া পৌছিল না তখন এই শ্রদ্ধা-নিবেদনের ভার পূর্ব্ববৎ আমাকেই লইতে হইল।

বাংলার যে সব কবি, কথাশিল্পী ও চিত্র-শিল্পী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতির শ্রী, সৌষ্ঠব ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহারাই এই পুস্তকের প্রাপ্য প্রশংসার প্রথম অধিকারী কারণ তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর হইত না।

তারপর যদি কিছু প্রশংসার দাবী করিতে পারেন তো সে বেঙ্গল পারফিউমারীর উদ্যোক্তাগণ; যাঁহারা বাঙ্গলার সাহিত্যে, চিত্রে ও মুদ্রণ শিল্পে একটা যুগান্তর আনিতে সমর্থ হইয়াছেন কারণ নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি লোকলোচনের সমক্ষে আসিবার পূর্ব্বে এ শ্রেণীর পুস্তক আর ছিল না। অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া সুরমা পুস্তক প্রকাশ করিতে, আজ আর যে পুস্তক-ব্যবসায়ীগণ দ্বিধা বোধ করেন না তাহা এই নিরুপমা-বর্ষস্মৃতিরই কল্যাণে। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বাঙলা পুস্তকের মর্য্যাদা আজ যে অসাধারণ ভাবে বাড়িয়াছে সে জন্য নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতির প্রকাশকগণই মুখ্যভাবে না হৌন, গৌণ ভাবে যে প্রশংসার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

এবারে হিমানী প্রেসেই পুস্তকের সমস্ত চিত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছে, ফলে পুস্তকের সৌন্দর্য্য যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে দুই মত নাই।

এত যত্ন, এত কষ্ট করিয়া যাঁহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল তাঁহারা ইহার যোগ্য সমাদর করিলেই আমরা পরম পুলকিত হইব ও আগামী বারে যাহাতে ইহার আরও উন্নতি করিতে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট রহিব।

এ বৎসর পুস্তকের বহু বর্ণ চিত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ফর্ম্মাও দু'চারটী বাড়িয়াছে তথাপি মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

কলিকাতা ৯ই আশ্বিন, সোমবার।
শারদীয়া ১৩৩৪।

বিনীত
সম্পাদক

চিত্রসূচী

বহুবর্ণ

দুই ও একবর্ণ

পাঠ্যসূচী

সারা বছরের

আনন্দ ও সুখের

স্মৃতি উজ্জ্বল

রাখিবার মানসে

নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি

....

....

উপহার

দিলাম

শারদীয়া ১৩৩৪

.... } ....

....

অর্থাৎ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

নাট্য-মন্দিরে "সীতা"র অভিনয় দেখিতেছিলাম। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গড়িতেছিলেন। তাঁহার সেই বিলাপ-বিলোল চাহনী, অরুন্তুদ মর্ম্ম-ব্যথা ও দুঃসহ জীবনের প্রচণ্ড কাতরতায় শতকরা নিরানব্বই জন দর্শকের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত। দুই একজন মহিলার অস্ফুট ব্যাকুলতা ফুঁফাইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল। আমাদের পার্শ্বের বক্স হইতে খুব স্পষ্ট একটা "ব্যক্ত" মর্ম্মোচ্ছ্বাস উঠিল—"ওঃ হোঃ।"

শত কণ্ঠের গুঞ্জন সেই দম-বন্ধ করা অব্যক্তকাতরতার কাল হইল। "চোপ," "আস্তে" "অর্ডার!" "আঃ!" "উঃ!" "হিঃ"—প্রভৃতি গোল্-থামানর শত নিবেদন শ্রীরামচন্দ্রের গভীর শোকের উৎসটাকে প্রায় নীরস করিয়া তুলিল। কত চক্ষু যে আমাদের ও আমাদের পাশের বক্সে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। চাহনীর অগ্নিবাণ আর তিরস্কারের অগ্নিকণা জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমরা যে বে-আদব চিৎকারটার জনক নই তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বিনয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া গললগ্নী-কৃত রেশমী-চাদর হইয়া পাশের বক্সের দিকে ফিরিয়া বলিল—"একটু চুপ করুন না, মশায়।"

এ কথায় রোষটা হাসিতে পরিণত হইল। একটা হৈঃ চৈঃ সৃষ্ট হইল। আশঙ্কা হইল রামরূপী শিশিরকুমারের নাট্যকলা বুঝি এই হাসির উত্তাপে দগ্ধ হয়। কিন্তু তাহা নিষ্প্রভ হইল না। কারণ নিমেষের মধ্যে গোলমাল প্রশমিত হইল। আবার সকলের হৃদয় শ্রীরামচন্দ্রের হা-হুতাশের বন্যায় পড়িয়া তালে তালে নাচিতে লাগিল—লোকেও বিরহের দোদুল দোলায় দুলিতে লাগিল।

আমাদের পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে ছিল একটি কান্ত-যুবাপুরুষ—গৌরবর্ণ নিটোল দেহ, পরণে খয়ের রঙের সিল্কের চুড়ীদার পাঞ্জাবী আর অতি মিহি শান্তিপুরের ধুতি। তিনিই ভাবের আত্যন্তিকতাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট বদ্ধ করিয়া দিতে না পারিয়া "ওঃ হোঃ" বলিয়া চীৎকার

করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গিনী এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী, বিলাস-বিলোল কটাক্ষ—ঢল ঢল তরল রূপ। তৃতীয় ব্যক্তি বোধ হয় মোসাহেব—একটু পিছনে সশ্রদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট, বাবুর কখন কি আজ্ঞা হয় তাহার অপেক্ষায় সদাই সতর্ক। তাহারও পিছনে প্রকোষ্ঠের দ্বারে এক বালিয়া জেলার ত্রিবেদী প্রতিহারী, সাদা ধুতির উপর খাকিরঙের চাপকান, কোমরে চিত্র-বিচিত্র কোমর-বন্ধ পিতলের তকমা এবং মাথায় ক্রিটনের পাগড়ী। তাহার পার্শ্বে একটা ফতুয়া পরা গাল-পাট্টা দাড়ী সমেত খানসামা একটা বেতের বাক্সের তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

আমরা ছিলাম তিন জন—নিস্পরোয়া, নির্ব্বিকার। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই—কারণ প্রত্যেকে অন্যূন দশবার সে অভিনয় দেখিয়াছিলাম। অভিনয়ের মোহিনী শক্তি হতপ্রভ হয় পুনরাবৃত্তিতে, আমরা হাসিতেছিলাম মাঝে মাঝে—কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও ভোঁতা রসিকতার দ্বারা আমাদের আসর মস্‌গুল রাখিতেছিলাম। পুনরাবৃত্তির উল্লেখ করিয়া বিনয় বলিল—এক এক জন লোক আছে রোজ গীতা পাঠ করে। এতে তাদের উপর ঠিক সেই ফল হয় হরবোলা টিয়াপাখীর উপর হরিনামের যে ফল।

অবনী বলিল—তাই তো ও ধর্ম্মের বই পড়ে না, যে দিন পড়বে বাস—

"ডানা বার হবে আর উড়বে।"

যুবকটি আমাদের গল্প শুনিতেছিল—আর বলিলে অবশ্য গর্ব্ব করা হয়—সুন্দরীটী ও তাহার সুঠাম কর্ণ দুটি আমাদের ও ভাদুড়ি মহাশয়ের মধ্যে আধা-আধিরূপে বাটোয়ারা করিয়া দিয়াছিল। শ্রীমান্ মোসাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে দেখিতেছিল।

যখন সেই অঙ্কের শেষে যবনিকা পড়িল—সানাইয়ে আশাবরীর আলাপের সঙ্গীত উঠিল। সানাইওয়ালাটা সত্যই আমার বিবাহের সময় আমাদেয় বাড়িতে রসুন চৌকীর দলে সানাই বাজাইয়াছিল, আমি বলিলাম—ভাই এ বেটা আমার বিয়ের সময় বাঁশী বাজিয়েছিল—আর ঠিক এই সুরে এই আলাপ, এই তান যখন আমি বৌ নিয়ে ঘরে ফিরি। এ সুর আমার প্রাণে প্রাণে মিশে আছে।

সকলে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমাদের প্রতিবেশী আমাদের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। আমরা অভ্যর্থনা করিলাম, বিনয় একটা কাঁচি-মার্কা সিগারেট দিল, আমি চৌকী ছাড়িয়া দিলাম, অবনী অমায়িক ভাবে হাসিয়া নেটের পরদার ভিতর দিয়া একবার সেই সুন্দরীটিকে দেখিয়া লইল—আমিও একবার চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ সেই দিকে চাহিয়া লইলাম।

ভদ্রলোকের নাম অমিয়কুমার সেন—হরিণ-ধুবড়ীর জমিদার। সুন্দরী তাহার স্ত্রী। দ্বিতীয় ব্যক্তি মোসাহেব নয় নায়েব—কলিকাতার ছেলে, নাম নীরোদ ভট্টাচার্য্য।

সে সোণার বাক্স হইতে আমাদের মিশরের সিগারেট দিল—রূপার কৌটা হইতে মঘাই পান খাওয়াইল। বলিল—আপনারা বেশ সব ফ্‌র্ত্তি করছেন পৃথিবীতে ফ্‌র্ত্তির চেয়ে আর মজা—ওর নাম কি—

বিনয় বলিল—অর্থাৎ—আনন্দ।

সে হাসিয়া বলিল—অর্থাৎ! বেশ বলেছেন অর্থাৎ। অর্থাৎ মানে অর্থাৎ –

তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। হাসির বেগে কাঁপিতে লাগিল আবার বলিল—অর্থাৎ কি বললেন হ্যাঁ অর্থাৎ একটু অর্থাৎ করা যাক।

আমরা বলিলাম—নিশ্চয় অর্থাৎ—

সে ডাকিল—বিন্দে! অর্থাৎ—বেটা শিগ্‌গির।

বিন্দে সেই ফতুয়া ও গাল-পাট্টার অধীশ্বর। তাহার বেতের বাক্সয় সোডা ছিল; কাঁচের গ্লাস ছিল, বুল্ হুইস্কির বোতল ছিল। সে তাড়াতাড়ি হুইস্কি সোডা আনিয়া অমিয়র নিকট ধরিল! অমিয় বলিল—বেটা বে-আয়াদব। দে বেটা। ডাক্তার বাবুকে দে। বিনয়বাবুকে দে। নবীন বাবুকে—

বিনয় সংশোধন করিয়া দিয়া বলিল—অর্থাৎ অবনীবাবু।

"ঠিক বলেছেন। অর্থাৎ অবনীবাবু। হাঃ হাঃ।

আমরা সুরার রসে বঞ্চিত। বিনয় পান করিত। সে একটা গ্লাস লইল। গল্প বলিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী সুষমা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম। অভিনয় আরম্ভ হইল। অমিয় বলিল—কি ঘ্যানঘেনে প্লে। চলুন বাহিরে।

বুঝিলাম শিশির ভাদুড়ীর আর্টের প্রভাব বুলের প্রভাব অপেক্ষা কমজোর। বাহিরে অপ্রশস্ত ভাঙ্গা বারান্দায় অমিয়কে লইয়া বিনয় আনন্দ করিতে লাগিল। তখন পান-পাত্র নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! অবনী বলিল—আপনিও যেমন সুন্দর আপনার—অর্থাৎ—

"হ্যাঁ। হ্যাঁ! আমার স্ত্রী সুন্দরী, সুষমা—অর্থাৎ—অর্থাৎ—

তারপর সেই হাসি, রক্তিমভাব মুখ ও আনন্দের প্রকম্পন। সে চীৎকার করিয়া বলিল—অর্থাৎ—বিন্দে—ও বাপ বৃন্দাবন, বেটা গয়লা-নন্দন বিন্দে—অর্থাৎ—

বৃন্দাবন চন্দ্র অমনি ঠিক দুই পাত্র স্কচ সুধা আনিয়া ধরিল।

বিনয় আড়ালে বলিল—দেখ লোকটার একটা দুর্ব্বলতা আছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকে বড় দামী জিনিস। "অর্থাৎ"—কথাটা শুনলে ওর পান-প্রবৃত্তি জেগে ওঠে!

আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন রোগীর উল্লেখ আছে। অবনী ফৌজদারী আদালতের উকীল। সে বলিল—তোর মুণ্ড। ফ্‌র্ত্তির মুখে, মালের মুখে ওরকম করছে।

বিনয় বলিল—এ মক্কেলের কাচা থেকে টাকা খুলে নেওয়া নয়, জানিস। আর অনাহারী

হাকিম নাচাবার ডুগডুগী বাজানো নয়। একে বলে সাইকলজি। জানিস্ পাঁচ আইন নয়—সা—ই—ক—ল—জি।

শ্রীরামচন্দ্র সভাস্থ হইয়াছেন। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণের শান্তি। লোকে শেষ কাঁদিবার পূর্ব্বে মনের মধ্যে একটু লঘু চিন্তার প্রশ্রয় দিয়াছে—অথচ তাহাদের মনের পিছনের স্তরে আছে সেই দারুণ উৎকণ্ঠা—সীতাদেবীর অস্তিমের আশঙ্কা। বিনয় বলিল—দেখবি ?

সে পাশের বক্সের দিকে মুখ ফিরাইয়া নেটের পর্দ্দার এপার হইতে বলিল—অমিয়বাবু—বেশ রাজ-সভাটা সাজিয়েছে কি বলেন ? আমরা যখন হরিণ-ধুবড়ীতে যাব আপনিও এমনি করে সভা সাজাবেন। কি বলেন ?

সে হাসিয়া বলিল—আমার কি আর এমন সৌভাগ্য হবে ?

বিনয় বলিল—সৌভাগ্যটা আমাদের নিশ্চয়! অর্থাৎ—আমরা ঠিক্ যাব—অর্থাৎ—

"হাঃ! হাঃ! অর্থাৎ! বিনয়বাবু অর্থাৎ—বিন্দে! ওরে বেটা!"

বলা বাহুল্য হুইস্কি আসিল।

অভিনয় শেষ হইল। বিনয় ও অমিয় বারান্দায় দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। নায়েব সুষমার সহিত ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিল। বলিল—ডাক্তারবাবু এবার একটু নিরস্ত করুন। আজ মাত্রাটা খুব হয়েছে। বিনয়বাবুকে আর অর্থাৎ বলতে—

আমি বলিলাম—তা'হ'লে সত্য! অর্থাৎ বললেই ওর তেষ্টা পায়।

"ধ্রুব সত্য! এমন দুর্ব্বলতা দেখেন নি। অন্য সময় তেমন খায় না। কিন্তু "অর্থাৎ" বললে আর উপায় নেই।

আশ্চর্য্য! কি ভীষণ ব্যাধি!

২

দুইদিন পরে নায়েব নীরোদ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত। বলিল—অমিয় ডেকেছে একবার যেতে হবে। বাড়ীতে অসুখ।

সে অমিয়র সহিত বাল্যকালে হিন্দুস্কুলে পড়িয়াছিল। তাহার পর বি, এ ফেল হইয়া তাহার নিকট চাকুরী করিতেছিল। প্রায় ছয় মাসাবধি তাহারা কলিকাতাতেই বাস করে। অমিয় তাহাকে বন্ধুর মতই দেখে—দুজনে একসঙ্গে সর্ব্বদা থাকে—একত্র "অর্থাৎ" করে।

ভবানীপুরের এক রম্য অট্টালিকার এক সুসজ্জিত কক্ষে আরাম কেদারায় উপবিষ্ট ছিল সুষমা। একটিমাত্র দাসী ছিল তাহার পরিচারিকা। বাবু গৃহে ছিলেন না, নীরোদ আমাকে রোগিণীর নিকট লইয়া গেল। হাসিয়া বলিল—বল। ডাক্তারবাবুর কাছে লজ্জা ক'র না।

মনিব পত্নীর সহিত এমন ভাবে তাহাকে কথা কহিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এত বড় বাড়ীতে থাকে অমিয়, নীরোদ ও সুষমা। দাসী এক—দাস গোটাকতক—পাচক ব্রাহ্মণ একজন।

সুষমা হাসিয়া বলিল—তোমাদের সব বাড়াবাড়ি। আমার কি হয়েছে যে ডাক্তার বাবুকে কষ্ট দিলে? বলুন ডাক্তার বাবু।

নীরোদ বলিল—আমার সঙ্গে লড়াই করলে আর কি হবে? বাবুর হুকুম! বন্ধু হ'লেও আমি তা'র চাকর!

সুষমা তাহার চক্ষের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া হাসিল। সে বাহিরে গেল। একখানা চৌকীর উপর বসিয়া তাহাকে বলিলাম—আপনার কি অসুখ?

সে হাসিয়া বলিল—হাত দেখে ধরুন। সে হাত বাড়াইয়া দিলাম। আমি বলিলাম—দেখব কি? নাড়ি তো মুক্তা আর সোণার ঘেরা-টোপে ঢাকা।

সে বলিল—ডাক্তার বাবু আমার এ মুক্তার মনতাসাটা কেমন? বাবুর খেয়াল মতির উপর। আমার কিন্তু অত মুক্তা ভাল লাগে না।

কি জানি কোন্ দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার ওষ্ঠ হইতে বাহির হইল—মণি-মুক্তার কোনই দরকার হয় না এ দেহের জন্য।

তাহার অপাঙ্গে এমন একটা চাহনী চপলার মত খেলিয়া গেল যে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সে মাটির পানে চাহিয়া বলিল—আপনারা সবাই সমান। আমাকে নিয়ে সবাই এমন রঙ্গ করেন কেন্ বলুন তো।

সর্ব্বনাশ! তাহার সঙ্গে আমার সেই প্রথম কথা। আমি গৃহের সাজ-সজ্জা দেখিলাম—চারিদিকে বিলাস, চারু-শিল্পের এমন নিখুঁত সমাবেশ—অথচ এত হাল্কা এই সুষমাময়ী সুষমা! আমার মনের ভাব যেন বুঝিতে পারিল সে। বলিল—ডাক্তার বাবু ঘর আমার নিজের হাতের সাজানো। বাবুর আসল নেশা—সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা—তিনি যা চান তাঁকে সেটা দেওয়া হিন্দু-স্ত্রীর কর্ত্তব্য—কি বলেন?

আবার সেই চাহনী। বুঝিলাম না। হিন্দু-স্ত্রীর কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে সেই উন্মাদক চাহনীটা প্রবেশ করিয়া এমন একটা ওলট্ পালট্ বিদ্‌ঘুটে ভূকম্পনের সৃষ্টি করিল যে, আমার দেহের প্রত্যেক রক্ত-কণিকা পাগলের মত তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে শিরা-উপশিরায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছিল—আমার সারা প্রকৃতিটা যেন পণ্ডিতের হাতের বর্ণ পরিচয় পুস্তক। আমি নিজেকে সামলাইয়া বলিলাম—আপনার রোগটা —অর্থাৎ—

সে হাসিল। বলিল—অর্থাতে আমার পিপাসা জাগে না। ঐ অর্থাতের জন্যই আপনাকে

ডেকেছিলাম। দেখুন বাবু কলকাতায় একেলা। আপনাদের সঙ্গ তাঁর ভাল লেগেছে। প্রায়ই ডাক্ পড়বে। আমি অবলা—হিন্দু-রমণী—উনিই আমার সর্ব্বস্ব। দয়া করে—

আবার সেই চাহনী। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া সে বলিল—দয়া করে ওঁর সামনে "অর্থাৎ" কথাটা ব্যবহার করবেন না।

আমি অপ্রস্তুত হইলাম। সে বলিল—আপনাদের খেলায় অনেকের প্রাণান্ত হ'বে।

আমি বলিলাম—আর লজ্জা দেবেন না। আমি প্রতিশ্রুত হচ্চি। বিনয়কে—

"সে লোকটিকে মোটেই আমার ভাল লাগে না, সে বাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে পান করবে মনে করেছে। কিন্তু"—

নিমেষে সে দৃঢ় হইল। হাল্কা মোটে না। সে অপাঙ্গের চাহনী—কাজ বাগানোর হাতিয়ার। এই সব বিলাস ও মৃদুতার নীচে একটা দৃঢ়তার স্রোত ছিল সুষমার চরিত্রে। আমি তাহাকে বুঝাইলাম বিনয় সম্বন্ধে তাহার ধারণা ভ্রান্ত। সে বলিল—ভাল।

একটা সোরগোল উঠিল—প্রথমে আসিল দাসী, তাহার পর বৃন্দাবন, দ্বারবান, নায়েব শেষে বাবু। শোভাযাত্রা সেই কক্ষে আসিয়া শেষ হইল। বাবু ও নায়েব গৃহে প্রবেশ করিল—বাকী সবাই স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বিশেষ কার্য্যে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। সুষমার কি ব্যবস্থা করিলাম তাহা জানিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম—রোগ তো ধরতে পারি নি।

"তবে কোনও সিনিয়ার ডাক্তার"—

আমি বলিলাম- না। অভিজ্ঞতা বা বিদ্যের অভাবে ধরতে পারিনি এমন না। দুটো কারণে রোগ ধরতে পারি নি। প্রথম কারণ—আপনার স্ত্রী রোগের লক্ষণ বলেন না আর দ্বিতীয় কারণ—

সবাই হাসিল। অমিয় বলিল—নীরদ যানা ভাই বেটাদের ভাগানা। এখানে আমি আছি।

সে নিঃশব্দে বাহিরে গেল। আমি বলিলাম—দ্বিতীয় কারণ আপনার স্ত্রীর নাড়ীটি যে রকম মোতির বর্ম্মে ঢাকা তাতে সে "পদার্থের" মারফতেও তো রোগ ধরবার উপায় নেই।

সকলে খুব হাসিল। অমিয় বলিল—আচ্ছা সত্যি কথা বলুন তো। ডাক্তার বাবু সুমুকে আমার মতির গহনা কেমন সাজে!

সুষমা কৃত্রিম রোষে আমার দিকে চাহিল। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম— মিসেস সেনকে ভগবান যে মতি দিয়ে গড়েছেন—ওঁর—মানে হ'চ্চে—

বাবু বলিল—অর্থাৎ—হ্যাঁ অর্থাৎ ওর আর কিছু সাজবার দরকার হয় না! অর্থাৎ দাঁড়ান আমি একবার আসছি—অর্থাৎ হ্যাঁ হ্যাঁ অর্থাৎ।

যেন গ্রহ তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল ! সুষমা আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—দোহাই আপনার। আমি বলিনি উনি নিজেই বললেন—আমি বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে, মানে হ'চ্চে বলেছিলাম।

তাহার সেই নবনীত অধরে ক্ষমার হাসি আসিল।

৩

মাঝে মাঝে সুষমাকে দেখিতে যাই। রোগ কিছু নাই কিন্তু সে কথা কে শোনে ? একটু একটু সিরাপ দাগ কাটা শিশিতে ভরিয়া দিই, তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ পান করিবার জন্য। পুরিয়ায় দুধের চিনি দিই। নানা নিষেধ সত্ত্বেও দর্শনী দেয়—প্রত্যেক দ্বিতীয় দর্শনে একটি করিয়া গিনি।

বিনয় যায়—"অর্থাৎ" করে। কিন্তু আমার বিস্ময়ের আসল কারণ ছিল অমিয়নাথের সহিত তাহার নায়েব নীরদ ভট্টাচার্য্যের মেলামেশা। ঠিক সমান ভাবে প্রভু ও ভৃত্যে মিলিত। প্রভু পত্নীকে সে "তুমি" বলিত, বাহিরে বাবু আমাদের সহিত গল্প করিত, কিন্তু নীরদ সে সময় অন্দরে থাকিত নিশ্চয়ই সুষমার নিকট। ইহাদের বন্ধুত্বে নিশ্চয়ই একটা উচ্চতা ছিল—আর না হয় তো—যাক্।

পূজার ছুটি আসিল। অমিয়নাথ সপরিবারে শিমলা শৈলে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেল। বিনয়ের খুব ইচ্ছা যে সে তাহার সহিত যায় কিন্তু অফিসের কার্য্যের অবসর অভাবে যাইতে সক্ষম হইল না। বিজয়া দশমীর দিন টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে দুই শত টাকা আসিল। তাহার সহিত অনুরোধ সিমলা শৈলে রওনা হইতে, কারণ সুষমা সেখানে পীড়িতা হইয়াছিল। অগত্যা হিমালয় ভ্রমণে, অর্থাৎ সিমলা শৈলে গিয়া উঠিতে হইল।

নাভাধিপতির একটি ভাড়াটিয়া বাটিতে উহারা বাসা লইয়াছিল। আমি যখন রিকসা হইতে নামিলাম—ফেরোজা রঙের বেনারসী সাড়ি পরিয়া, হাতে শিল্কের ছাতা লইয়া আমার রোগিণী স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। এই কয়েক দিনের শৈল-বাসে তাঁহার গাল দুটি পাকা আপেলের বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। অমিয়নাথের মুখও রক্তিমাভ—তবে সে অর্থাতের ফলে কি স্থান মাহাত্ম্যে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে দেখিয়া তাহারা উভয়ে উচ্চ হাস্য করিল। আমি কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিলাম—আচ্ছা ফিরে আসুন। যখন রোগের ভাণ করে আমাকে বারোশো মাইল টেনে এনেছেন তখন অন্ততঃ বারো দাগ তেতো দাবাই যদি না খাওয়াই তো আমি ডাক্তার নই।

সুষমা বলিল—লক্ষ্মীটি ডাক্তার বাবু। আপনি তো কোনও দিন আমার হাতের রান্না খান নি। আজ তিন রকম মাংস আর কপির সিঙাড়া খাওয়াব।

আমি বলিলাম—সে অনুগ্রহটা বাঙ্গালা দেশে কি করা যেত না।

সুষমা বলিল—আপনার রসবোধ কম। আমার এই সোণার দেহটা বাঙ্গলা দেশের ঝলসানো গরমে কি আগুন তাত সহিতে পারে?

অমিয় বলিল—আমার সোণার সুমুর ননীর গা তাতে গলে গাওয়া ঘি হ'য়ে যাবে।

সুন্দরী একটা দুষ্টামীর চাহনী প্রহারে স্বামীকে মুগ্ধ করিয়া অধীনের উপর কৃপা করিলেন। আমি সেলাম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ে পাহাড়ের গড়ানে রাস্তা দিয়া উঠিতেছে। রূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের যে যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

৪

আমরা চারি জনে সারাদিন একত্র থাকি—ছোট বাড়ী, মাঝে হল চারিদিকে ঘর। নীরদ একটু কম কথা কয়, কর্ত্তা গৃহিণীও তাহাকে একটু আমল দেয় কম। একটা অসন্তোষের ভাব তাহার মুখে দেদীপ্যমান ছিল! অমিয়নাথও যেন তাহাকে কাছ-ছাড়া করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা দুজনে ভ্রমণে বাহির হইলাম। সুষমা নাভার মহারাজার বাগানে বসিয়া রহিল। পথে পরেশ বাবুর বাড়ী গান বাজনার মাইফেল বসিয়াছিল—ফিরিবার সময় অমিয়নাথ সেখানে জমিয়া গেল। একটু "অর্থাৎ" হইবে বুঝিলাম। আমি বাড়ি ফিরিলাম ড্রয়িংরুমে কেহ ছিল না, আমার মাথায় দুষ্ট স্বরস্বতী চাপিয়াছিল। পা টিপিয়া সুষমার গৃহে উঁকি মারিলাম।

যে সন্দেহটা চোরের মত—দেবালয়ে অস্পৃশ্যের মত অতি সন্তর্পণে উঁকি মারিত—যাহার অনুভূতিকে দমন করিবার জন্য সমস্ত মানসিক ও নৈতিক বল কেন্দ্রীভূত করিতাম—আজ দেখিলাম সে সন্দেহ বুক ফুলাইয়া সত্যের দাবী করিয়া চোখের সম্মুখে দাঁড়াইল। কি ভীষণ ব্যাপার। সেই সাত হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ে ৫৫ ডিক্রী শৈত্যের মাঝে আমার ললাটে স্বেদোদ্গম হইল। মানুষের উপর, সারা বিশ্বের উপর ঘৃণাতে দেহ জর্জ্জরিত হইল।

একখানি আরাম কেদারায় বসিয়াছিল সুন্দরী। তাহার পদ-প্রান্তে ভূমিতে কার্পেটের উপর বসিয়া নীরোদ। তাহার এক হাত সুষমার জঘনের উপর অপর হস্ত তাহার দক্ষিণ হস্তে। যেন ক্লিয়োপেট্রার পদতলে কোনও সাধারণ সৈনিক প্রেমিক।

নীরদ বলিল—মাইরি, সুমু আমার আট হাজার টাকা এক হপ্তার মধ্যে চাই। তা না হলে বাড়ি গাঁথা বন্ধ করে দিতে হবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার সৌজন্যে

শরৎ

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

Himani Press, Calcutta

সুষমা বলিল—রোজ রোজ অত টাকা চাহিলে কি বলবে বল ত! এই তো আসবার আগে তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এসেছি।

"না ভাই তা না হ'লে আমি চলে যাব। আমার আট হাজার টাকা চাই।"

সে দুই হাত এবং মুখ রাখিল সুষমার হাঁটুর উপর, সুষমা অতি ধীরে তাহার মুখ তুলিল বলিল—পাগলামী ক'রনা ভাই। আমি যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করব। এ সতীত্ব রত্ন পায়ে দল্‌চি কার জন্যে?

নীরদ তাহাকে চুম্বন করিল। আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে প্রাচীর ধরিয়া নিজের খাটিয়ায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। বলিলাম—ভগবন্‌, ভগবন্‌! এ কি পৃথিবী সৃষ্টি করেছ? এমন সোণার আবরণের মধ্যে কি আবর্জ্জনা জমা করে রেখেছ নাথ?

৮

তাহার পরদিন একটা প্রগাঢ় ভালবাসা আর তার সঙ্গে দয়া জন্মিল আমার প্রাণে অমিয়-নাথের প্রতি। তাহার সরল অমায়িক ভাব, তাহার কমনীয় দেহ, তাহার মিষ্ট কথা যদি আমাকে না বাঁধিত তো আমি আর এক মুহূর্ত্ত সে পাপ পুরীতে বাস করিতাম না। দুপুরে সে ঘরে নিদ্রাভিভূত ছিল। নীরদ বাজার গিয়াছিল। আমি ঘরে শুইয়া "অর্চ্চনা" পড়িতে-ছিলাম। হঠাৎ ঘরে একটা সুবাস আসিল—নিরুপমা, হিমানী প্রভৃতির মিশ্র সুবাস। তাহার পর রেশম তাহার মাঝে কনক প্রতিমা সুষমা। কিন্তু আমার মানস চক্ষু আরও নীচে দেখিতেছিল—পিশাচিনীর মূর্ত্তি।

হাসিতে হাসিতে সে আসিয়া আমার শয্যার উপর বসিল। আমি তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া উঠিতে গেলাম, সে আমায় হাত দিয়া টিপিয়া ধরিল, বলিল—উঠবেন না। আমি শুইয়া রহিলাম তাহার প্রহেলিকাময় চক্ষের দিকে চাহিয়া।

সে বলিল—কাল রাত থেকে আপনার একটু ভাবান্তর হয়েছে ডাক্তার বাবু।

আমি বলিলাম হ্যাঁ।

"আড়ি পেতেছিলেন বুঝি আমার ঘরে?"

"হুঁ!"

"ঘরে কে ছিল? অমিয় বাবু না নীরদ বাবু!

নির্লজ্জা রমণী! -বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি? হিন্দু ঘরের সেরা সম্পদ? আমি তাহার মুখের দিকে কি দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম জানি না। সে হাসিয়া বলিল—ডাক্তার সতীত্ব কাকে বলে? স্বামী সেবা, স্বামীর মন জোগান না?

এবার তাহার এ উৎকট রসিকতা মোটে ভাল লাগিল না। আমি বলিলাম—আমরা ও পবিত্র বিষয়টা—

"অপবিত্র মুখে উচ্চারণ নাই বা করলাম। ঠিক বলেছ ডাক্তার। কিন্তু আমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে তার ইচ্ছায় যদি আমি দ্বিচারিণী"—

এবার আমি উঠিয়া বসিলাম। বলিলাম—আপনার পায়ে পড়ছি মিসেস সেন আপনি নিজের ঘরে যান। আমার ও সব শোনবার দরকার নাই।

সে হাসিল বলিল—ডাক্তার বাবু—এত মরা চিরেছেন কোনও দিন নিজেকে চিরে মনের ভেতরটা দেখেছেন কি? বলুন সেখানে এ সোণার সুষমার ঢলঢলে রূপটা—অর্থাৎ পাপী আমি আর পুণ্যাত্মা মশায়।"

আমি বলিলাম—ক্ষমা করুন। আপনি যেই হন, আজ আমায় বিদায় দিন। আপনি ভুলবেন না আপনি পরস্ত্রী—ভদ্রঘরের—

সে বলিল—একশ' বার। ডাক্তার বাবু পাহাড়ে পাথর গড়ানো দেখেছেন। যে যতক্ষণ তার নিজের স্থানে থাকে সে স্থির ধীর দৃঢ় তার দৃঢ়তার ভিতর হ'তে তার সৌন্দর্য্য ফুটে বার হয়। কিন্তু যদি সে একবার স্থানান্তরিত হয় তখন সে গড়ায়। কোথায় গড়ায় সে জানে না যতক্ষণ না একেবারে খাড়ে গিয়ে জমে। ডাক্তারবাবু—

আমি তাহার হাত ধরিলাম। বলিলাম—সুষমা—মিসেস সেন—দোহাই তোমার এসব কথা ব'লনা। কত সৌন্দর্য্য, কত কমনীয়তা, কত মাধুরী নিংড়ে বিধি তোমায় সৃষ্টি করেছেন—ওমুখে এসব কথা বার ক'রনা।

সে হাসিয়া বলিল—কিন্তু বিধি আমায় এমন স্বামীর হাতে কেন দিলেন যিনি ইচ্ছা করে আমায় দ্বিচারিণী করলেন? ডাক্তারবাবু আপনার আর আপশোষ থাকে কেন—এ অধরের সুধা মনে মনে পান না করে—

আমি উঠিলাম। সে আমার হাত ধরিল বলিল—দেখুন স্ত্রীলোক নয় এক-নিষ্ঠ সতী হয় না হয় বহুচারিণী হয়। গড়ানে পাথরের মত। ডাক্তার ভালবাস যদি সত্য—

আমি হাত ছাড়াইয়া বাহিরে গেলাম।

৬

সন্ধ্যার পর যখন ঘরে এলাম তাহাদের তিনজনের কাহাকেও দেখিলাম না। তখনও মাথার মধ্যে অনেকগুলা ভাব তাল পাকাইয়া নাচিতেছিল—কেহ স্কন্ধকাটা—কাহারও স্কন্ধে পরের মাথা। নীরদের প্রেম তো টাকা শোষণের। অমিয়নাথ কি যাদুর মোহে নিজের অনিন্দ্য-সুন্দরী

স্ত্রীকে তাহার ভৃত্যের বিলাস ও শঠতার সামগ্রী করিয়াছিল? ছিঃ! ছিঃ! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আত্মপ্রসাদে তুমি অহর্নিশি আবর্ত্তনশীল।

বৃন্দাবন আসিল। তাহার চক্ষে যেন রোদনের চিহ্ন। সে বলিল—ডাক্তারবাবু আপনি কবে কল্‌কাতায় যাবেন?

আমি বলিলাম—কাল্।

"একটা বিহিত করতে পারবেন না?"

"কিসের বিহিত, বৃন্দাবন?"

"এই পাপের?"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে চোখ মুছিতে মুছিতে একখানা পত্র আমার হাতে দিল। স্ত্রীলোকের লেখা। পড়িলাম—

শুভাশীর্ব্বাদ—বৃন্দাবন। তোমার পত্র পেলাম। আমি তো চিঠি লিখে বাবাজীবনের জবাব পাই না। পিশাচী তাকে যাদু করেছে। এখান থেকে সদর নায়েব কেবল টাকা পাঠাচ্চে আর সে টাকা শয়তানী চুরি করছে। এদিকে আমার সোণার চাঁপা বৌ-মা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে! আহা! মা আমার কত ভাল, বলে মা তাঁর যাতে সুখ হয় তাতে বাধা দিয়ো না। মা চুল বাঁধে না, ভাল সাড়ি পরেনা কেবল পূজো আর পূজো! বাবা বিন্দে তুই যে কর্ত্তার বড় আদরের খানসামা ছিলিরে! তুই কি কিছু করতে পারিস না। শুনছি নাকি অমি সেই ছাইভস্মগুলা আবার বেশী বেশী খাচ্চে। তুই সেগুলা ফেলে দিয়ে জল পুরে রেখে দিবি। যদি তুই সেই মাগীকে খ্যাংরা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে পারিস তোকে পাকা দালান গাঁথিয়ে দব। বৌমার মুখ চেয়ে—

মাথামুণ্ড কিছু বুঝিলাম না। তাহাকে বলিলাম—কে কাকে লিখেছে?

"কর্ত্তৃঠাকরুণ—আমাকে?"

"কর্ত্তৃঠাকরুণ কে? অমিবাবুর মা।"

"হ্যাঁ!"

"বৌকে?"

ঠিক সেই সময় অমিয়বাবু আসিল। একাকী। আমি বলিলাম—"মিসেস সেন?"

সে বলিল—ঐ শালা নীরদের সঙ্গে আসছে। শালা একটা দাঁওয়ের মতলব করছে। আরও আটহাজার চাই। তাহ'লে পুরা ৫০,০০০ হয়।

"কার কথা বলছ?"

সে পথে "অর্থাৎ" করিয়াছিল। বলিল—বাবা ন্যাকা নাকি? তুমিও কি নটের ভেতর আছ? ছুঁড়ি তোমার ওপর খুব পড়তা। মাইরি।

আমি বলিলাম—কি বলছ অমিয়। কে?

"কে? কে? কে? সুমী—নীরদশালার পরিবার, সুমী। চেহারাটা ভাল। নীরদ-শালার তাঁওতায়—নগদ বিয়াল্লিশ হাজার দিয়েছি আর পঞ্চাশহাজার টাকা কাপড় চোপড়ে গয়নায়। যাক্—অমন ঢের পাওয়া যাবে—বাবা ভাত ছড়ালে কাকের অভাব—

আমি বলিলাম—অর্থাৎ—

"ঠিক্ বলেছ বাবা! অর্থাৎ—বিন্দে অর্থাৎ। এই বিন্দেদূতী বেটা অর্থাৎ—অর্থাৎ।

কি সর্ব্বনাশ! সমস্ত ঘটনাটা আমার নিকট আত্ম-প্রকাশ করিল। কি ঘটনা-চক্র! কি নীচতার একত্র সমাবেশ!

আমি তাহার জননীর পত্রখানা তাহার হস্তে দিলাম। সে পড়িল। বলিল—ধর্ম্ম ঠিক জয়ী হবে ডাক্তার। স্ত্রীর কাছে একদিন নিশ্চয় ফিরব—তবে—

সুষমা ও নীরদ আসিল। সেই উন্মাদক আঁখির ভয়ে অমিয় পত্রখানা লুকাইয়া ফেলিল। আমি তিনজনের মুখের দিকে চাহিলাম। বুঝিলাম তিনজনের মধ্যে কম অপরাধিনী সুষমা—আর পিশাচ-রাজ সেই নীরদ।

৭

প্রভাতে উঠিয়া আমি বিছানাপত্র বাঁধিতেছিলাম। ড্রেসিংগাউন জড়াইয়া অমিয় আসিল—মুখে চুরুট।

"কিহে এত সকালে?"

সে বলিল—তুমি সঙ্গে যাচ্চ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ!

উভয়ে কিছুকাল নীরব রহিলাম। সে বলিল—ডাক্তার, এ পাপ যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন বিনা ওজরে আপত্তিতে এর মধ্যে পড়েছিলাম তা' ভেবনা। এর প্রারম্ভটা স্মরণ হ'লে এখনও মনকে শান্ত করতে হয়, মদ খেতে হয়।

আমি বিস্মিত নেত্রে তাহার প্রতি চাহিলাম।

সে বলিল—জাননা? অর্থাৎ বল্‌লে মদ খাই।

লোকটা সেয়ানা পাগল। আমি বলিলাম—হুঁ!

সে বলিল—নীরদ আমার কাছে চাকুরী করতে এল। তখন বাল্য বন্ধু হিসাবে তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলে। সুমীর অত রূপ, অত বিদ্যা, অত বুদ্ধি আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে লাগলাম—কিন্তু কোন দিন একটা অপবিত্র চিন্তা তার দিকে যায় নি। আমি তাকে দু'একটা উপহার দিতাম—মা তাকে যত্ন করতেন, আমার স্ত্রী তার সঙ্গে গলা ধরে গল্প করত।

একদিন তার ঘরে গেলাম। নীরদ বল্‌লে সুষমাতে তোমাতে বেশ মানায়। সে জোর করে সুষমাকে আমার কোলে বসিয়ে দিলে। উভয়ের দেহে যেন বিজলী খেলে গেল। আমি কথা কহিতে পারলাম না। সে বলিল 'অমি আজ থেকে সুমী যেমন আমার স্ত্রী তেমনি তোরও স্ত্রী। সুষমার গাল লাল হ'ল। তার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল। আমার মাথা ঘুরছিল—পায়ের জোর কমে যাচ্ছিল—চোখ জ্বালা করছিল। লোভে—হ্যাঁ লোভ ছিল বৈকি—লোভে বিস্ময়ে আমার বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা ফেটে যাবার জোগাড় করছিল। আমি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম—কি রসিকতা নীরদ? সে বল্‌লে—অ—র্থা—ৎ আজ থেকে সুমী তোরও স্ত্রী।"

ঠিক সেই সময় সুষমা এল। মুক্ত কবরী গায়ে একখানা শাল জড়ানো। গম্ভীর মূর্ত্তি বলিল—ডাক্তার কাল তুমি প্রত্যাখ্যান করাতে চোখ ফুটেছে তারপর অমির মার চিঠিখানা রাত্রে পড়েছি। অমির গল্প শুনেছি। আমার দিক থেকে বলি।

আমি বলিলাম—কি হবে সুষমা? আমি জানি দোষী তোমরা দুজন কম—অন্য একজন অধিক।

সে বলিল—কি বল্‌চ ডাক্তার। বিদ্যা ছিল, ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু বয়স ত তখন মাত্র ষোল। তার ওপর সেই হিন্দুর ঘরের শিক্ষা স্বামী দেবতা। দেবতা যখন অমির সঙ্গে ভাব করতে বলত ভাবতাম বন্ধুত্ব। সে রোজ বল্‌ত—আজ অমির কাছে ভাল কাপড় চেও, আঙটি চেও—আমি সম্মত হতাম না। অমি বাবুর ভদ্রতায় দিন দিন আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'তাম আর দেবতা ব্রাহ্মণ স্বামী উত্তেজিত করত, অমি তোমায় খুব ভালবাসে, অমি তোমার ভারি সুখ্যাতি করে, অমিকে তুমি পর ভেব না, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিও। আমার প্রকৃতি এ সব গুলার বিপক্ষে রুকে উঠত কিন্তু স্বামীর উপর দয়া হ'ত। ভাবতাম লোকটা বন্ধুত্বকে এত বড় করেছে যে স্ত্রীকে সেই বন্ধুত্বের মধ্যে টানতে চায়। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি আমারও ছিল অমিরও ছিল। সে আমাদের একেলা রেখে যখন বাইরে যেত, আমরা গম্ভীর হ'য়ে কথা কহিতাম।"

অমি বলিল—হ্যাঁ! বরং তার সামনে হাসি ঠাট্টা করতাম। কিন্তু অন্তরালে আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাটা বাড়ত।

সুষমা বলিল—যে দিন সে বল্‌লে "অ—র্থা—ৎ আজ থেকে সুমী তোর স্ত্রী"—অমি বাবু তো মূর্চ্ছা যান, আমারও প্রাণে এসে তিনি—সীতার ভাব—মা বসুন্ধরা দু-ফাঁক হও তোমার কোলে আশ্রয় নিই। কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্যে যেমন দেবী আছে—তেমনী একটা রাক্ষসী আছে তার নাম প্রতিহিংসা। সে জেগে উঠল। ভাবলাম—এ পাপের শাস্তি আমি পাই কিন্তু দেবতা স্বামীকে ভোগ করাব। আমি সামলে নিয়ে অমিকে আলিঙ্গন করলাম। প্রকৃতি নিজ কর্ম্ম আরম্ভ করলেন, আমি বেশ্যা হলাম—স্বামীর আদেশে, তার অর্থের জন্য। প্রায় লাখ টাকার সম্পত্তি করে দিয়েছি কি বলি বল—অমি।

আমি নীরবে শুনিতেছিলাম।—বিচিত্র এ কাহিনী। পূর্ব্বে কাণাঘুষা শুনিতাম—মানুষের ভিতর এমন লোকও আছে।

অমিয়নাথ বলিল—এখনও শোন নি কেন অর্থাৎ বল্‌লে মদ খাই।

আমি ব'লিলাম—বুঝেছি। অর্থাৎ বল্‌লে সেই পাপের প্রারম্ভটা আর তার সঙ্গে বিবেকের তাড়নার স্মৃতিটা আসে তাই মদ খেয়ে স্মৃতি নাশ করি।

তাহারা হাসিল। অমি বলিল—এখন উপায় কি ?

সুষমা স্থির দৃঢ় স্বরে বলিল—অর্থাৎ অমি তার সাধ্বী স্ত্রীর কাছে ফিরবে, নীরদ নূতন বাড়ীতে থাকবে আমার সব গহনা পত্র সে পাবে—স্বামী দেবতা কি না। আর ভ্রষ্টা সুষমা কাশীতে—

"এই বিলাসের পর !"

"কেন ! অমির স্ত্রী যদি মাটীর শিব নিয়ে দিন কাটাতে পারে—আমি এত ভোগ করে নিয়েছি—আসল বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে তৃপ্তি পাব না ?"

"তার ভবিষ্যত আছে। তোমার ভবিষ্যত থাকবে না—অতীতের জলন্ত স্মৃতি"—

"ছিঃ ডাক্তার। এই বিদ্যা নিয়ে রোগ সারাও। আমার ভবিষ্যত থাকবে না! নীরদ যখন কুষ্ঠব্যাধিতে পঙ্গু হ'বে তখন আমার আবার শুশ্রূষার কাজ থাকবে। অমির শিশুরা যখন মার সঙ্গে কাশী আসবে তাদের বুকে করে সহরময় ঘুরে বেড়াবে কে ? কাশীতে যখন কোনও গৃহস্থের মেয়ে আমার মত কাঁটার উপর দিয়ে—

সে আর বলিতে পারিল না। ভূমিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"বধূ"

"কাটালে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি—
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি"—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী [illegible]

উৎসর্গ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

১

ডাক্তারী পাশ করিয়া ছয় মাস মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল জুনিয়ার হাউস সার্জ্জেনি করার পর তরুণ ডাক্তার বি, সি, ব্যানার্জ্জি ওরফে বিকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন চাকরী শূন্য হইয়া বাড়িতে আসিয়া বসিল, ভাগ্যক্রমে সেই দিনই মফঃস্বল হইতে তাহার একটী ডাক আসিয়া জুটিল। বিকাশের স্বল্পদিন স্থায়ী কার্য্যকালের মধ্যে মাণিকপুরের যে জমিদারের পুত্র হাঁসপাতাল হইতে রোগমুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়াছিল, সেই জমীদারবাটী হইতেই তাহার ডাক আসিয়াছে। দৈনিক একশত টাকা হিসাবে তিনদিনে তিনশত টাকা ও সমস্ত পাথেয় খরচ পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতের ভাবনায় অভিভূত নবীন চিকিৎসকের পক্ষে ইহা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়াই মনে হইল।

ফিরিতে কিছুতেই তিন দিনের বেশী দেরী করিতে পারিবেনা এবং আসিয়াই একশত টাকা তাহাকে দিতে হইবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া পত্নী লীলার নিকট হইতে বিকাশকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। ষ্টেসনে লোক ও গাড়ি রাখিবার জন্য জমীদার বাড়িতে টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়া বিকাশ পরদিন প্রাতের ট্রেণে মাণিকপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

মাণিকপুর ষ্টেসনে যখন ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। অল্প কয়েকজন যাত্রীর নামা উঠা শেষ হইলে ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। ষ্টেসন যাত্রী শূন্য হইলে বিকাশ চারিদিকে খোঁজ করিল, কিন্তু তাহাকে লইতে আসিয়াছে এমন কোন লোকের সে সন্ধান পাইল না। অগত্যা উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ওয়েটিংরুমে নিজের বিছানা, সুটকেশ ও যন্ত্রের ব্যাগ রাখিয়া প্লাটফরমে পায়চারী করিতে আরম্ভ করিল। দৃষ্টি রহিল বাহিরের ফটকের দিকে, কোন লোক তাহার জন্য আসিতেছে কিনা!

বিকাশ একাই ছিল, অল্পক্ষণ পরে দুইজন গোরাসৈন্য আসিয়া তাহারই মত পায়চারী সুরু

করিয়া দিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়া পড়িলে, ষ্টেসনে কয়েকটা তৈলের আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইল। টেলিগ্রাফ করিয়া দেওয়া সত্বেও তাহাকে লইতে সময়ে লোক আসিয়া পৌঁছিল না, এজন্য বিকাশ মনে মনে বড়ই বিরক্তি বোধ করিতেছিল। হঠাৎ ঘোড়াগাড়ি আসার শব্দ শুনিয়া সে ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, একখানি বাড়ির গাড়ী হইতে সাহেব বেশধারী একজন ভদ্রলোক ও একটি মহিলা নামিতেছেন। বিকাশ নিরাশ হইয়া ওয়েটিংরুমের দিকে ফিরিয়া আসিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গের সুন্দরী তরুণীকে ওয়েটিংরুমের মধ্যে বসাইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান বিকাশের আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, পরে ধীরে ধীরে ষ্টেসনমাষ্টারের অফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিকাশ আবার পূর্ব্বের মত পায়চারী সুরু করিয়া দিল।

দুটী গোরা সৈন্য সে সময় প্লাটফরমের শেষ সীমানার দিকে থাকিলেও, তরুণীর আগমন তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহারা ক্রমে আগাইয়া আসিয়া ওয়েটিংরুমের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল। তাহাদের অসভ্যের মত ঘন ঘন তরুণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও হাসির কথাবার্ত্তা বিকাশের নিকট মোটেই সুরুচি সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছিল না। সে কাছাকাছিই ঘুরিতে লাগিল।

পাষণ্ডদের যে এতটা সাহস হইবে তাহা বিকাশ পূর্ব্বে ধারণাই করিতে পারে নাই। হঠাৎ তরুণীর করুণ চীৎকারে দৌড়িয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সৈন্যদের একজন তরুণীর হস্ত ধারণ করিয়াছে ও অপরজন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছে। দুজনের সঙ্গে নিজের শক্তি সামর্থ্যের তুলনার কথা আর তখন বিকাশের মনে আসিল না, মুহূর্ত্তের জন্য একবার তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই সে প্রচণ্ড বেগে প্রথম সৈন্যের নাসিকায় এক ঘুসি বসাইয়া দিল। অপ্রত্যাশিত আঘাতের তীব্র বেগ সামলাইতে না পারিয়া সৈনিক প্রবর পতনোন্মুখ হইতেই, সঙ্গীটি তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তারপর দুই পাষণ্ডে মিলিয়া বিকাশকে আক্রমণ করিল। উপর্য্যুপরি ঘুসি মারিয়া ও সবুট পদাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত ও ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। বিকাশের মাথা ফাটিয়া গেল ও নাক মুখ দিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। তাহাকে রক্ষা করিতে ষ্টেসনের লোকজন আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল।

২

বিকাশের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি প্রায় দশটা। মিষ্টার মুখার্জ্জি পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন এতক্ষণে যেন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, এখন কোন কষ্ট হইতেছে কি না। বিকাশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তিনি তাহাকে চুপ করিয়া

শুইয়া থাকিতে বলিয়া পার্শ্বকক্ষস্থিত কন্যাকে একটু গরম দুধ আনিতে আদেশ করিলেন। বিকাশ ভাবিতে চেষ্টা করিল, কোথায় সে রহিয়াছে।

সুনীলা যখন দুধ লইয়া বিকাশের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সহসা সমস্ত ঘটনা তাহার স্মরণে আসিয়া গেল। এই তরুণীকেই রক্ষা করিতে গিয়া সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিল। মিষ্টার মুখার্জ্জি দুধটুকু তাহাকে খাইয়া ফেলিতে বলিলেন, সুনীলা সাবধানে খাওয়াইয়া দিল। দুর্ব্বল দেহ ও মস্তিষ্ক লইয়া বিকাশ তখনই আবার ঘুমে অভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলে বিকাশ দেখিল তাহার দুর্ব্বলতা অনেকটা দূর হইয়াছে, কিন্তু দেহের নানা স্থান তখনও বেদনায় ভরা। একজন ভৃত্য ঘরের আসবাব পত্র পরিষ্কার করিতেছিল, বিকাশ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জানিয়া লইল যে, গৃহকর্ত্তা মিষ্টার মুখার্জ্জি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সুনীলা তাঁহারই একমাত্র সন্তান। সংসারে পিতাপুত্রী ব্যতীত আর কেহ নাই, গৃহিণী অনেক দিন পূর্ব্বেই গত হইয়াছেন।

মিষ্টার মুখার্জ্জি স্থানীয় সরকারী ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই ডাক্তারই পূর্ব্বরাত্রে বিকাশের অজ্ঞান অবস্থায় তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। রোগীকে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ক্ষত সমূহ পরীক্ষা ও ঔষধাদি ব্যবস্থা করার পর বিকাশের সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিকাশ নিজে যে একজন ডাক্তার, তাহা পূর্ব্বেই তাঁহারা সঙ্গের যন্ত্রপাতি ও নামাঙ্কিত ব্যাগ দেখিয়া অবগত হইয়াছিলেন। বিকাশ ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাইল, যে রোগীটির জন্য তাহার ডাক হইয়াছিল, সে রোগীটি গত কল্য দ্বিপ্রহরেই মারা গিয়াছে এবং সে সময়ে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিকাশকে অন্ততঃ পাঁচ ছয় দিন এখানে শয্যাশায়ী থাকিতে হইবে এবং ভাল বোধ না করিলে তিনি তাহাকে বাড়ী যাইবার অনুমতি দিবেন না জানাইয়া এবং মিষ্টার মুখার্জ্জিকে আশ্বাস দান করিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর মিষ্টার মুখার্জ্জি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। জানাইলেন, অনেকক্ষণ বিকাশের জ্ঞান না হওয়ায়, কাল তিনি বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; বিপদের আর বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। তারপর তিনি আবেগভরে বিকাশকে নিজ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। নিজের জীবনকে এরূপভাবে বিপন্ন করিয়া যে দেব চরিত্র যুবা, সংসারের তাঁহার একমাত্র অবলম্বন আদরের কন্যাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে যে তিনি কি প্রতিদান দিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবেন, তাহা তিনি কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিকাশ বিনয়ের সহিত তাঁহাকে জানাইল যে, নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পুরুষ মাত্রেরই যেটুকু করা একান্ত কর্ত্তব্য, সে সেইটুকু করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। ইহার জন্য সে এতটা প্রশংসার কোন দাবী করিতে পারে না।

কাছারীতে যাইবার সময় মিষ্টার মুখার্জ্জি সুনীলাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যেন সে সমস্ত ক্ষণ বিকাশের নিকটেই থাকে এবং কোন কিছু আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। বাড়ীতে কোন বর্ষিয়সী মহিলা নাই, কন্যার দ্বারা সেবাযত্নের কোনরূপ ত্রুটী হইলে বিকাশ যেন সেজন্য অপরাধ গ্রহণ না করে, একথাও তিনি তাহাকে জানাইতে ভুলিলেন না।

সুনীলা নিঃসঙ্কোচেই বিকাশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতেছিল। বিকাশ শুনিল, তাহার অজ্ঞান হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোরা দুইটা পলায়ন করে এবং ষ্টেসনের লোকেরা তাড়া করিয়া তাহাদের একজনকেও ধরিতে পারে নাই। বিকাশকে গাড়ি করিয়া প্রথমে সরকারী হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি বাঁধার পর বাড়ীতে আনা হইয়াছে। বাড়ীতে আনার অনেকক্ষণ পরে তবে তাহার জ্ঞান হয়। সুনীলা বিকাশের অবস্থা দেখিয়া বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

বেলা তিনটার পূর্ব্বেই সেদিন মিষ্টার মুখার্জ্জি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বিকাশ ও সুনীলাকে জানাইলেন, যে, এক ঘণ্টার মধ্যেই স্থানীয় সেনাবারিকের অধ্যক্ষ, কাল সন্ধ্যার সময় বারিকে অনুপস্থিত ছয়জন গোরা সৈন্য সহ এখানে উপস্থিত হইবেন। ছয় জনের মধ্য হইতে দোষী দুই জনকে তাহাদের সনাক্ত করিয়া দিতে হইবে। সনাক্ত হইলে অধ্যক্ষ সৈন্যদ্বয়ের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। মিষ্টার মুখার্জ্জি ইহা লইয়া আর সাধারণ আদালতে নালিশ করিতে ইচ্ছা করেন না।

যথা সময়ে অধ্যক্ষ ছয় জন গোরা সৈন্য সহ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিকাশ বা সুনীলা কেহই দোষীদ্বয়কে সনাক্ত করিতে পারিল না। সুনীলার সকল সৈন্যের চেহারাই একরূপ মনে হইল। বিকাশের যেন মনে হইল একজনকে সে চিনিতে পারিয়াছে, কিন্তু পাছে তাহার ভুলে কোন নির্দ্দোষ সাজা পায়, সে জন্য সে চুপ করিয়াই রহিল। অধ্যক্ষ, মিষ্টার মুখার্জ্জির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সৈন্যগণ সহ বারিকে ফিরিয়া গেলেন।

৩

দুর্ঘটনার পর ছয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। মিষ্টার মুখার্জ্জি ও সুনীলার ঐকান্তিক সেবা যত্ন ও শুভেচ্ছায় বিকাশ অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। এইবার তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। বাড়ীতে দুর্ঘটনার বিষয় কিছুই জানান হয় নাই। তিন দিন পূর্ব্বে কেবল একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, আরও তিন দিন তাহাকে এখানে থাকিতে হইবে।

লীলা যে তাহার জন্য কয়দিন ধরিয়াই আশা পথ চাহিয়া আছে, তাহা বিকাশের অজ্ঞাত

ছিল না। তথাপি, প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই তাহার মনে হইল,আরও দিন কতক এখানে থাকিতে পারিলেই যেন অন্তরের তৃপ্তি হয়। সুনীলার ব্যবহার তাহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতি বড় বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া যে, প্রতিদানে সে বিকাশকে সেবা যত্নে সন্তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, তাহার কোন কার্য্যেই সেরূপ ভাব একটুও প্রকাশ পায় নাই। সে যেন নিজের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য সহজভাবেই করিয়া গিয়াছে। মুখের কথায় সুনীলা কোন দিন বিকাশকে ধন্যবাদ দেয় নাই, কিন্তু তাহার প্রতি কার্য্যেই যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

বিকাশকে বিদায় দিবার জন্য মিষ্টার মুখার্জ্জি সুনীলাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বিশেষ ম্রিয়মাণ দেখাইতেছিল। ট্রেণে উঠিবার সময় বিকাশ যখন প্রণাম করিতে গেল, তখন তিনি তাহাকে একবারে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। সুনীলা নত হইয়া বিকাশের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। কাহারও মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। বিকাশ চকিতে একবার সুনীলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

ট্রেণে সমস্ত সময়টা বিকাশ সুনীলার চিন্তাতেই কাটাইয়া দিল। তাহার প্রতি সুনীলার কোনরূপ আকর্ষণ জন্মিয়াছে কিনা তাহা সে কিছুতেই সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। নিজের অন্তরতম প্রদেশে কোথায় যেন একটু দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিল, কিন্তু সেটাকে মানিয়া লইতে সে রাজি হইল না। সুনীলার মনে যদি কোন রঙ্গিন আশা জাগিয়া থাকে, তাহার জন্য ত বিকাশ দায়ী হইতে পারে না। দুর্ঘটনার পর দিন প্রাতেই ত সে তাহাদের জানাইয়া দিয়াছিল, যে, সে বিবাহিত।

মস্তকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন লইয়া বিকাশ যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন লীলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিদেশে স্বামীর যে কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় নাই। ফিরিতে আরও তিন দিন দেরী হইবে, টেলিগ্রাম পাইয়া সে স্থির করিয়া লইয়াছিল, যে, রোগীর অবস্থা ভাল নয়, সেই জন্যই বিকাশকে থাকিতে হইতেছে। ছয় দিনে দর্শনীর টাকা যে দ্বিগুণ পাওয়া যাইবে, তাহাও সে হিসাব করিয়া রাখিতে ভুলে নাই। এক্ষণে স্বামীর দুর্ঘটনার কারণ জানিবার জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

বিকাশ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। নারীর সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া স্বামী যে বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছেন সে জন্য ব্যথা পাইলেও, লীলা মনে মনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যে, সে মহাভাগ্যবতী বলিয়াই এমন দেবতুল্য স্বামীর স্ত্রী হইতে পারিয়াছে। সুনীলা যে এত সেবা যত্ন করিয়াছে, তাহা বিকাশের কৃত কার্য্যের তুলনায় কিছুই নয়। এমন দেবতার পূজা না করিয়া কি কোন নারী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। এত দিনে লীলা যেন নিজ অন্তরে প্রকৃত পতিভক্তির উদয় অনুভব করিতে পারিল।

৪

সুনীলার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, তাহা সমস্তই লীলা স্বামীর নিকট জানিয়া লইয়াছিল। বিকাশের কোনরূপ আকর্ষণ জন্মিয়াছে কি না, সে বিষয়ের চিন্তা মাত্র মনে উদয় না হইলেও, সুনীলা যে নিজ রক্ষাকর্ত্তার প্রতি নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়াছে, এ ধারণা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। লীলা এজন্য সুনীলার কথা লইয়া স্বামীর সঙ্গে কৌতুক করিতে ছাড়িত না। বিকাশ বিবাহিত না হইলে, মিষ্টার মুখার্জ্জি যে নিজ কন্যাকে নিশ্চয়ই তাহার হাতে সমর্পণ করিতেন, এ কথা লীলা অনেকবার বিকাশকে শুনাইয়া দিয়াছিল।

কি যে খেয়াল হইল বলা যায় না, লীলা একদিন বিকাশকে ধরিয়া বসিল, যে, তাহাকে সুনীলাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিকাশ কথাটা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সম্পত্তির জন্য বারংবার জিদ্ করাতে তাহাকে বলিতে হইল, সে রাজি আছে। বিকাশ পরে যখন বলিল, আমি রাজি থাকিলে কি হইবে। শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী সপত্নীর অংশীদার হইতে চাহিবে কেন? আর ধনী পিতাই বা কেন একজন বিবাহিত যুবকের হস্তে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে অর্পণ করিবেন! লীলা তখন জোরের সহিত উত্তর করিল, চেষ্টা করিলে এ বিবাহ সম্ভব হইবেই। যদি হয়, তখন সে দেখাইতে পারিবে সপত্নী থাকিতেও কত আনন্দে কাল কাটান যায়। সুনীলার সঙ্গে যে সে নিজ সহোদরার অধিক স্নেহের ব্যবহার করিবে, তাহাও জানাইতে ভুলিল না। বিমলের মনে হইল, তাহার লীলা মানবী নয়, দেবী!

মিষ্টার মুখার্জ্জির নিকট হইতে যে এইরূপ পত্র পাইবে, বিকাশ তাহা স্বপ্নেও আশা করে নাই। নিজের পাঠ করা শেষ হইলে সে পত্রখানি লীলার হস্তে প্রদান করিল। লীলা পড়িতে লাগিল—

"কল্যাণবরেষু—

তোমার দ্বিতীয় পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি। মাথার আঘাতের ক্ষতটা একেবারে সারিয়া গিয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ভগবানের নিকট সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

তোমার নিকট আমরা যে কতটা ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ ঋণ যে জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিব এ দুরাশা আমার নাই। তুমি নিজের জীবন যে কতটা বিপন্ন করিয়া সুনীলাকে চরম অসম্মানের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ, তাহা চক্ষের সম্মুখেই দেখিয়াছি। তুমি আমাদের কাছে নরদেবতা।

সুনীলা অতি শৈশবেই মাতৃহীনা। আজন্ম আমিই তাহার একমাত্র অবলম্বন। পিতা হইয়াও কন্যার অন্তরের ভাবধারার সহিত আমি যতটা পরিচিত, অনেক জননীও তাঁহাদের

কন্যাদের বিষয়ে ততটা নহেন। কয়দিনে আমি বেশ সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি, সুনীলা অন্তরের শূন্য সিংহাসনে তার জীবন-দেবতাকে বসাইয়া গোপনে পূজা আরম্ভ করিয়াছে। সে পূজা অবিরামই চলিতেছে।

তোমার মনের ভাব কি বলিতে পারি না, কিন্তু সুনীলা মনে মনে তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে আমাকে এখন পিতার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। আমি তোমারই সহিত আমার একমাত্র সন্তান, আদরের কন্যার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি!

অত্যন্ত আধুনিক ভাবাপন্ন আমি যে কি করিয়া পুরুষের দুই বিবাহের সমর্থন করিতেছি এবং বিবাহিত যুবকের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে চাহিতেছি, ইহাতে হয় ত তুমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিবে। অত্যধিক কন্যাস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই যে আমি এরূপ প্রস্তাব করিতেছি, এ ধারণাও হয় ত তোমার মনে আসিতে পারে; কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করার পর তোমার যে এ বিবাহে আপত্তি হইবে না, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

হিন্দুপুরুষের একাধিক বিবাহে বাধা নাই। সংসারিক অশান্তি ও ব্যয়বৃদ্ধির ভয়ই এরূপ বিবাহের অন্তরায়। সুনীলাকে আমি যেরূপ শিক্ষাদান করিয়াছি, তাহাতে তাহার দ্বারা তোমার সাংসারিক সুখশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবেই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমার যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা সমস্তই কন্যাজামাতাকে অর্পণ করিব, জীবনে তাহাদের কখনও অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

অন্তরতমপ্রদেশে আমি অনুভব করিতেছি, তোমার স্ত্রীরও এ বিবাহে আপত্তি হইবে না। এখন ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই তোমার পত্রোত্তরের আশায় রহিলাম।

তোমাদের সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা করিয়া অন্যকার মত বিদায়গ্রহণ করিতেছি। আমার আশীর্ব্বাদ ও সুনীলার প্রণাম গ্রহণ করিও।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া লীলা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে একবার স্বামীর চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।
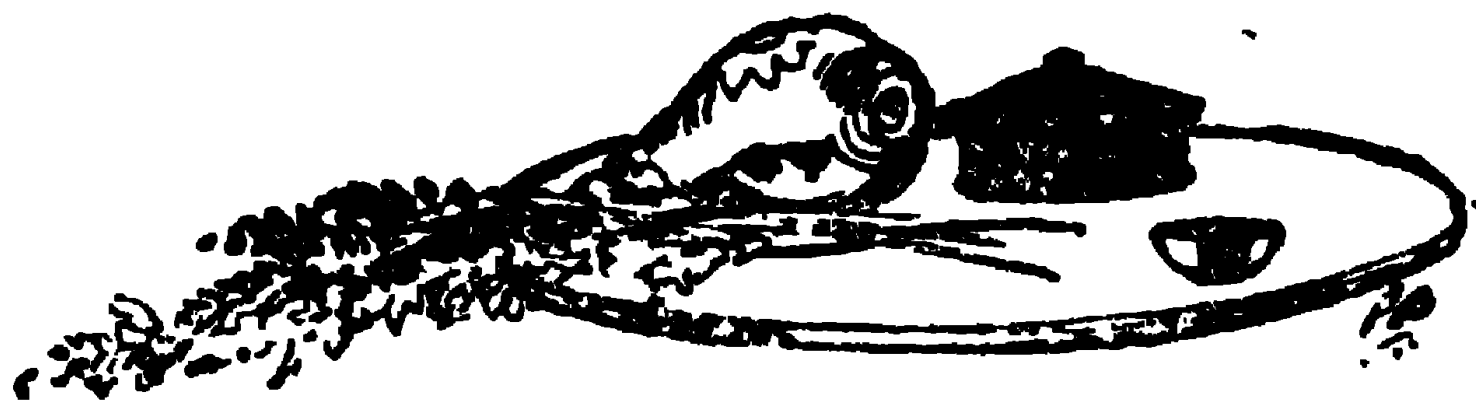
ন্যাশনাল-টনিক

ম্যালেরিয়াই বাঙালীর শারীরিক দৌর্ব্বল্যের কারণ একথা আজকাল বাঙালী মাত্রেই জানেন কিন্তু এই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের ফলে যে মানসিক দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া জাতিটাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতেছে তাহার উপায় কি ? আগে ওকালতীর দিকে বাঙালীর দৃষ্টি ছিল প্রখর, এখন সেটা ডাক্তারীর উপর ও বিজ্ঞানের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ফলে এখন বহুবিধ 'সুধা' ও টনিকে বঙ্গদেশ প্লাবিত। উহাদের দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণ কত দূর সফল হইতেছে তাহা মৃত্যু

সেবনের পূর্ব্বের অবস্থা

সংখ্যার পরিমাণ দেখিলে ঠিক বুঝা যাইবে—তবে একথা নিশ্চয় যে, ডাক্তার বা ঐরূপ পদবীধারী প্রতারকগণের অর্থাভাব নিবারণ হইয়াছে প্রচুর কিন্তু এই যে মানসিক দৌর্ব্বল্য, যাহার ফলে একটা জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে তাহার কি উপায় ?

উপায় আছে—হতাশ হইবেন না ইহার উপায় ন্যাশনাল টনিক বা জাতীয়-জীবন-সুধা সেবন। ইহা মুখ দিয়া সেবন করিতে হয় না সুতরাং তিক্ত বা কষায় বোধ হয় না—ইহা নিরাকার

চৈতন্য স্বরূপ সুতরাং ইহা সেবনে কোন অসুবিধা নাই—মাত্র এই একটী ঔষধের জোরে বাঙালী আজ রাজনৈতিক জগতে এখনও টেঁকিয়া আছে—যুঝিতেছে—ধুঁকিতেছে। ইহা বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি, সম্পূর্ণ অভিনব, আদি ও অকৃত্রিম এবং সদ্যফলপ্রদ ; ইহার ডাক নাম **বক্তৃতা**—

ইহা সেবন করিতে করিতে শ্রোতাদের মুখ উৎসাহে দীপ্ত হইবে, হস্ত আপনা হইতে মুষ্টিবদ্ধ হইবে—নেত্র যুগল বিস্ফারিত হইবে নাসারন্ধ্রদ্বয় শ্রম-ক্লান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্রের ন্যায় কাঁপিতে

সেবন কালীন অবস্থা

থাকে তারপর বক্তৃতান্তে বীর পদভরে ধরণী কাঁপাইয়া, বেড়াইবার ছড়িটাকে তরবারির ন্যায় সাবলীল করিয়া জাতির আশা-ভরসারা বাটী ফেরেন।

সেবনের পরের অবস্থা

পরে আহারান্তে শয়ন ও সেই মামুলী অবসাদ আসিলেও এই টনিক সেবনের ফল সংবাদ-পত্রের "পত্রলেখক"দিগের কলমে মাঝে মাঝে বীররসে প্রকটিত হইতে দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ—

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

মণি-কুন্তলা

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

১

বি-এ পরীক্ষায় তৃতীয়বার ফেল হ'য়ে লজ্জায় যেদিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছলুম, সেদিন হাতের এই সোনার 'রিষ্ট্‌ওয়াচ', আঙ্গুলের এই আংটী আর সামান্য কিছু টাকা আমার সম্বল ছিল।

তারপর কেমন করে যে আমার মতো একজন অজ্ঞাত অপরিচিত ছেলে মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্রকন্যাদের গৃহ-শিক্ষক পদে নিযুক্ত হ'ল সে অনেক কথা।

তাঁর বাড়ীতেই আমাকে সারাদিন থাকতে হয়। সেইখানেই দু'বেলা খাই বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ীতে স্থানাভাব বশতঃ রাত্রে থাকার সুবিধা না হওয়ায় আমাকে একটা বাসা ভাড়া করতে হয়েছিল।

বাসাটা আমার ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ী থেকে একটু তফাতে একটা ছোট মাট-কোঠার উপর। উপরে সেই একখানি মাত্রই ঘর। এবং সেটা সবটাই আমি সামান্য কিছু মাসিক ভাড়ায় দখল করেছিলুম।

নীচেয় দু'খানি মাত্র ঘর। বাড়ীওয়ালা ব্রজমিস্ত্রি ছিল তার মালিক। ব্রজমিস্ত্রির পেশা কলকব্জা ও টিন মেরামতির কাজ, কিন্তু জাতে শুনেছিলুম সে ছোট নয়। নীচেকার দু'খানি ঘরের মধ্যে একখানিতে ছিল তার যন্ত্রপাতি ও টিন মেরামতের কারখানা বা আড্ডাঘর, আর একখানি শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার হ'লেও ব্রজ তার সেই কারখানা বা আড্ডা ঘরেই রাত কাটাতো। শোবার ঘরখানি ব্যবহার করতো তার মেয়ে কুন্তলা। ঘরের বাইরে দাওয়ার একপাশে ব্রজর রান্না-বান্নার ব্যবস্থা ছিল।

একজন ভাল কারিগর বলে শহরে ব্রজর যেমনি সুনাম ছিল, নেশাখোর বদ্‌মায়েস বলে তার

তেমনি দুর্নামও ছিল। ইয়ার-বক্‌সি নিয়ে প্রচুর নেশা করে রাতের পর রাত ব্রজ তার সেই কারখানা বা আড্ডাঘরে বসেই কাটিয়ে দিতো; বাড়ীর ভিতর আর শুতে আসবার অবস্থা তার কোনওদিনই থাকতো না।

সংসারে বেজা মিস্ত্রির স্ত্রী ছিল না, পুত্র ছিল না, ছিল ঐ একমাত্র মেয়ে 'কুন্তলা'। কুন্তলাই রেঁধে বেড়ে বাপকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতো। অর্থাভাবে বেজা তার মেয়ের এখনও বিয়ে দিতে পারেনি; কুন্তলা প্রায় ষোল সতেরো বছরের হ'য়ে উঠেছিল। দেখলে কিন্তু তাকে টিনমিস্ত্রির মেয়ে বলে চেনাই যায় না—ভদ্রলোকের মেয়েদের মতোই বেশ সুশ্রী—সুগোল সুললিত কান্তি! ··প্রথম প্রথম কুন্তলা আমাকে দেখে ঘরের মধ্যে পালাতো, কিছুতেই আমার সামনে বেরুতো না। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, সে আমাকে একটু একটু করে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

একদিন আমি কুয়োর ধারে আমার খাবার জলের কুঁজোটা নিয়ে জল তুলে আনতে গেছি, সেই সময় কুন্তলা গাছ-কোমর বেঁধে দু'হাতে কুয়োর দড়ী টেনে জল তুলছিল।······যৌবনের সে এক জীবন্ত ছবি! কুন্তলার সুঠাম সুস্থ নিটোল দেহ আমার চোখে যেন অপূর্ব্ব বলে মনে হ'ল! আমার সে লুব্ধ দৃষ্টির সামনে কুন্তলা সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়ল। কুয়োর জলপাত্র দড়ীর টানের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধপথে উঠেই থেমে গেল।

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম—একটু খাবার জলের জন্য এসেছিলুম!

কুন্তলা মুখটি নীচু করেই বললে—কুঁজোটা রেখে যান, আমি দিয়ে আসবো'খন।

'না' বলতে পারলুম না। কুঁজোটা রেখে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এলুম।

খানিকপরে কুন্তলা আমার কুঁজোটি ভরে নিয়ে যখন ঘরে রেখে যেতে এলো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা—তোমার নামই কি 'কুন্তি'?

—না, বাবা কুন্তি বলেন বটে কিন্তু মা আমার নাম রেখেছিলেন মণি-কুন্তলা!

—তোমার মা কতদিন হ'ল স্বর্গে গেছেন?

আমার প্রশ্ন শুনে কুন্তলা ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তখনও তার কক্ষে আমার জলভরা কুঁজোটি বাহুবেষ্টনের মধ্যে চল্‌কে উঠে আনন্দ-উচ্ছ্বলতা জানাচ্ছিল! সেটাকে নামিয়ে রাখবারও অবকাশ দিইনি তাকে।

সে বললে—এই পূজো এলেই পাঁচ বচ্ছর পূর্ণ হবে!

—ও! তুমি তবে তখন সবে দশ বছরের মেয়ে নয়?

—না, আমি তখন বারো উত্তীর্ণ হয়েছি!

—তোমার আর ভাই বোন নেই?

—না।

—আচ্ছা, তুমি কুঁজোটা কোল থেকে নামিয়ে জানলার ধারে ঐ কাঠের পিঁড়িটার উপর বসিয়ে রাখো।

কুন্তলা জলের কুঁজোটা নামিয়ে রাখলে, সেই অবকাশে আমি দেখলুম তার পরণের সাড়ীখানি খুব মলিন না হ'লেও বড়ই জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। অনেক স্থানে সেলাই করা দেখা যাচ্ছে! জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার বাবা কি তোমায় কাপড়-চোপড় কিনে দেন না?

কুন্তলা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললে—মা থাকতে এনে দিতো, এখন আর দেয় না!

—কেন?

—বলে, তুই তো আমার মেয়ে ন'স্ যে তোকে ভাত-কাপড় দিয়ে আমি পুষবো?

—সে কি?

—হ্যাঁ; বলে—তোর মা'কে যখন বামুনপাড়া থেকে ভুলিয়ে বার করে এনেছিলুম তখন তুই সবে এক বছরের মেয়ে। তোকে ফেলে রেখে দিয়ে চলে আসতে বলেছিলুম, কিন্তু মাগীটা কিছুতেই তা পারলে না; অনেক টাকা কড়ি গয়না গাঁটির সঙ্গে তোকেও ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিল।

—বলো কি?—ব্রজ মিস্ত্রি তা'হলে তোমার বাপ নয়!

—তাইতো ও বলে! আমি কিন্তু ছেলে বেলা থেকেই জানতুম ওই আমার বাপ। মা'ও কোন দিন ঘুণাক্ষরে আমাকে এসম্বন্ধে কিছু জানান নি? কিন্তু আমার এখন বিশ্বাস হচ্ছে যে—ও যা বলছে তা সত্যি!

—কেন?

—নইলে বাপ কখনও তার মেয়েকে বলতে পারে—আর কেন, এইবার তো রোজগার করবার মতো বয়েস হয়েছে, নিজের পথ দেখো না!

—এঁ্যা! বলো কি কুন্তলা?—সত্যি?

—কথাগুলো এমন কিছু গৌরবের নয় যে মিথ্যে করে বললে আপনার কাছে আমার মান বাড়বে! রেঁধেবেড়ে দিই, ঘরের কাজ কর্ম্ম করি, তাই এখনও দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেয়, নইলে এতদিন বোধ হয় তাড়িয়ে দিতো!

এমন সময় নীচে টিন মিস্ত্রীর গলা শুনতে পাওয়া গেল, কুন্তলা শশব্যস্ত হ'য়ে বললে—আমি চললুম. এখনি ডাকাডাকি করবে, না পেলে গাল দেবে—ঠেঙাবে—

কুন্তলা চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে বললুম—কাল যখন সময় পাবে একবার উপরে এসো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সিঁড়ি থেকে 'আচ্ছা' বলে সে নেমে গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার সে রাত্রের ঘুমটিও হরণ ক'রে নিয়ে গেল!

শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম—কে এর মা? ব্রাহ্মণ কন্যা হ'য়ে কেন তিনি এই বেজা মিস্ত্রির সঙ্গে কুলত্যাগ করে এসেছিলেন? কাছে যখন অনেক অর্থ ও অলঙ্কার ছিল তখন তিনি যে একজন ধনী-জায়া ছিলেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু বেরিয়ে আসার কারণ কি? স্বামীর অনাদর—অবহেলা—দুশ্চরিত্রতা কি? কে জানে? রহস্য যেন ক্রমেই নিবিড় হ'য়ে আসতে লাগল!

২

পরের দিন সকালে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলুম না, ভয়ানক জ্বর এসেছিল।

ব্রজ রোজ সকালে এক ছিলিম তামাক খাবার জন্য আমার উপরকার ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতো। মুখে ব'লতো বটে—"দা'ঠাকুর, একটু পায়েরধুলো নিতে এলুম! ব্রাহ্মণ আপনি—সাক্ষাৎ দেবতা, যে ক'দিন আছো নারায়ণ দর্শন ক'রে নিই!" কিন্তু তার আসল মতলব তামাকের প্রসাদ পাওয়া!

সেদিন আর আমায় বিছানা ছেড়ে উঠতে না দেখে ব্রজমোহন ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো এবং ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্‌লে—"কী হয়েছে দা-ঠাকুর, অসুখে পড়েছো না কি?"

আমি কুঁতিয়ে 'হ্যাঁ' ব'লে হাত বাড়িয়ে তাকে তক্তাপোষের নীচেয় যেখানে টিনের খালি একটা বিস্কুটের বাক্সতে আমার তামাক টিকে থাকতো, দেখিয়ে দিলুম।

ব্রজ এক ছিলিম তামাক সেজে, হুঁকোটি ফিরিয়ে—কলকেটি ধরিয়ে—ডান হাতের কনুইয়ে বাঁ হাতটি ছুঁইয়ে আমার দিকে এগিয়ে ধরলে। আমি তাকে হাত নেড়ে তামাক খাবার ইচ্ছে নেই জানিয়ে, তাকেই সেবা করবার আজ্ঞা দিলুম। তারপর মাথার বালিসের নীচে থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বলে দিলুম—'বাজার যাবার সময় সে যেন একবার উকীল বাবুদের খবর দিয়ে যায়, যে আমি তাঁর ছেলেদের আজ আর পড়াতে যেতে পারবো না! আর—'

ব্রজ কলকেটাতে দু'চারটে জোর টান দিয়ে ব'ল্‌লে—অবশ্যই সংবাদ দেবো, আর নীলু ডাক্তারকেও একবার আসবার জন্য ব'লে আসবো দা-ঠাকুর! সেকি কথা! এমন অসুখ! আমার আশ্রয়ে রয়েছেন যখন, দেখতে শুনতে হবে বৈ কি!

আমি বল্‌লুম—আর ওই নোটখানা ভাঙিয়ে আমার জন্য কিছু মিছরি, আর আঙুর বেদানা-টেদানা যদি পাও তো চারটি এনো—

'মেঘ ও রৌদ্র'

শ্রীজ্যোতিশ. দাশগু

ব্রজ বললে—ঠাকুর একটু 'দুধ সাগু'র ব্যবস্থা করলে ভাল হ'তো না?

হতাশ ভাবে বললুম—হ্যাঁ হ'তো, কিন্তু ওসব করে কে ব্রজ?

—বিলক্ষণ!

ক'লকেটাতে আরো দু'টো জোরে টান দিয়ে ব্রজ বল্‌লে—আমার স্ত্রীই না হয় নেই, একটা ধেড়ে মেয়ে রয়েছে তো বাড়ীতে, সেই ওসব ব্যবস্থা করবে। আপনি কিছু ভাববেন না! আমি কুন্তিকে দুধসাগুর কথা বলে যাচ্ছি!

ক'লকেটা নিঃশেষ ক'রে দিয়ে ব্রজ চ'লে যাবার একটু পরেই ঝড়ের মতো বেগে কুন্তলা এসে হাজির—

—আপনার নাকি অসুখ করেছে?······বলতে বলতে সে একেবারে আমার মাথার শিয়রে এসে ঝুঁকে পড়ে আমার জ্বর-তপ্ত ললাটে তার ঠাণ্ডা কোমল হাতখানি ছুঁইয়ে শিউরে উঠল!—ইস্!—গা' যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! বাবাকে ডাক্তার ডাকবার কথা বলে দিয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, তোমার বাবা ডাক্তারকে খবর দিতে গেছেন! তোমার ঠাণ্ডা হাতখানি কপালে প'ড়তে ভারি একটা আরাম পেলুম! কাল রাত থেকে বড্ড মাথা ব্যথা ক'রছে,·····একটু যদি রগ দু'টো কেউ—

কুন্তলা তক্তপোষের উপর আমার পাশেই বসে প'ড়ে নিপুণা ধাত্রীর মতো আমার পীড়িত মাথাটি সযত্নে টিপে দিতে দিতে বললে কিন্তু, আমি তো এখন বেশিক্ষণ বসতে পারবো না, আপনার 'সাগু' চড়িয়ে এসেছি যে!—

—থাক্‌গে সাগু! তুমি একটু বোসো!—এই বলে আমি তার ঠাণ্ডা হাতটি দু'হাতের মধ্যে নিয়ে আমার চোখের উপর চেপে ধরলুম। বড় চোখ জ্বালা করছিল—যেন জুড়িয়ে গেল!

কুন্তলা বললে—তাকি হয়, একটু 'দুধসাগু' না খেলে কি চলে? সারাদিন উপোস করে পড়ে থাকলে কাহিল হ'য়ে পড়বেন যে!

ঘরের কোণে একটা ষ্টোভ পড়ে ছিল। কুন্তলা সেটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও ষ্টোভে আপনার কি হয়?

—মাঝে মাঝে চা' তৈরি ক'রে খাই!

—খাবেন কি একটু চা'?—ক'রে দেবো?

—খাবার ইচ্ছে হ'চ্ছে বটে, কিন্তু, না, থাক—তোমার কষ্ট হবে!

কুন্তলা উঠে প'ড়ল, ক্ষিপ্র হস্তে ষ্টোভ জ্বেলে একটা এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে জল গরম করতে চড়িয়ে দিয়ে, ধাঁ করে নীচেয় চলে গেল এবং চক্ষের পলক না ফেলতে বাটী করে একটু দুধ নিয়ে ফিরে এলো; হাসতে হাসতে আমাকে বললে—বড্ড সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম, আর একটু দেরী

হ'লেই সাগুটা পুড়ে যেতো, আর মুখে দিতে পারতেন না!—তারপর, সে ঘরের চারদিকে চা' আর চিনির সন্ধান করতে লাগলো! আমি বুঝতে পেরে আমার জামার পকেট থেকে চাবীর রিংটা তারদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম—ঐ ট্রাঙ্কের ভিতর সব তুলে রেখেছি, চাবি খুলে বার করতে হবে। ইঁদুরের উৎপাতে কিছু বাইরে রাখবার জো নেই!

ট্রাঙ্কের চাবী খুলে চা চিনি বার ক'রতে ক'রতে কুন্তলা বল্‌লে—মা গো, ইঁদুর হবে না! ঘরখানা কি নোংরা করেই রেখেছেন বলুন ত! কাল রাত্রে আমি অত বুঝতে পারি নি, এ যেন একেবারে ভূতের বাসা হ'য়ে রয়েছে! একটু ভাল হ'য়ে উঠুন আগে, তারপর ঘরখানা আমি নিজে একদিন পরিষ্কার ক'রে দেবো!"

আমার কাপ আর প্লেট খানি বেশ করে ধুয়ে মুছে কুন্তলা যখন তাতে গরম চা'য়ের অমৃত পরিবেষণ করে দিলে, কৃতজ্ঞতায় গদগদকণ্ঠ হ'য়ে তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি চা খাওনা কুন্তলা?

—পেলেই খাই!

—তবে কেন তোমার জন্যও একটু তৈরি করলে না?

—হুকুমের অপেক্ষা রাখিনি!—এই ব'লে কুন্তলা সেই এ্যালুমিনিয়মের পাত্রটি আমাকে দেখালে। বললে—ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি, জল একটু বেশী দিয়ে ফেলেছিলুম! তাই, আমারও একটু প্রসাদ হ'ল!

চা' খাবার পর একটু ঘাম হ'য়ে জ্বরটা যেন ছাড়ল' বলে মনে হ'ল! কুন্তলা ইতিমধ্যে ঘরের মেঝেয় ইতস্ততঃ ছড়ানো হরেক রকমের খুচ্‌রো জিনিসগুলোকে ঝেড়ে মুছে তুলে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে ঘরখানিকে প্রায় ভদ্রলোকের বাসোপযোগী করে তুলেছিল। আমার বিছানাটি সাফ ক'রে, চাদরখানি পাল্টে দিয়ে, টাকা-কড়ি মাথার বালিশের নীচেয় রেখেছিলুম বলে আমাকে একটু ব'কে সেগুলি ট্রাঙ্কে তুলে রেখে, আমার রাত্রের বাসি জামাটা বদলে, স্যুট কেসের চাবী খুলে একটা ফরসা জামা বার ক'রে আমাকে পরিয়ে দিয়ে, চাবীর রিং নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে নীচেয় চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অসুস্থ শরীর কখন কোথায় চাবী ফেলবেন্ মনে থাকবে না' শেষ আমাকেই হয়ত' ভুগতে হবে! তার চেয়ে চাবী এখন আমার কাছেই থাক। আজ আর কিছু রাঁধবো না, ভাতে-ভাত একটা চড়িয়ে দিয়েই চলে আসছি, ইতিমধ্যে যদি দরকার হয় ডাকবেন, নীচেয় যাচ্ছি বটে, কিন্তু কাণ রাখবো এদিকে—

কুন্তলা যেতে না যেতেই তাকে ডাকলুম, সেও ছুটে এলো—তার' ডাগর চোখ দু'টি যেন কথা ক'য়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,—"কি গো—কি গো—ডাকলে কেন?—কি চাই?"

বললুম—চা'টা খেয়ে মুখটা কেমন ক'সে রয়েছে! আমার ঐ কোটের পকেটে একটা

জার্ম্মান সিলভারের ‘বই-কৌটোর’ মধ্যে কিছু সুপুরি লবঙ্গ এলাচ আছে, আমাকে দু’টি বার ক’রে দিয়ে যাও না!

কুন্তলা হেসে ফেললে! কি সরল সুন্দর সে হাসি! কিন্তু চোখে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বল্লে—আপনার কি ভুলো মন! কাগজে মোড়া সুপুরি এলাচ মাথার বালিশের নীচেয় রইল বলে গেলুম না? আর’ ডান দিকে সিগারেট কেস্ আর দেশালাইটাও বার করে দিয়ে গেছি!—

—ও-ও-ও! হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ! রোগে মাথার ঠিক নেই কুন্তলা; তোমায় মিছি মিছি কষ্ট দিলুম, কিছু মনে করো না!

চোখের কোণে ভ্রুকুটী তার আরও মধুর, আরও তীক্ষ্ণ হ’য়ে উঠল, অধরপ্রান্তে একটু চাপা দুষ্ট-হাসি দেখা গেল! কুন্তলা বললে—ভয়ানক রাগ করবো কিন্তু, যদি ফিরে এসে দেখি কোনও দরকারে আপনি আমাকে ডাকেন নি!

কুন্তলা আবার নীচে চলে গেল।

স্নিগ্ধ-রবি-করোজ্জ্বল প্রভাতে মেদিনীপুরের মাঠকোঠার এই দো-তলার ঘরখানা একটু আগে আমার কাছে যেন অমরাবতী ব’লেই মনে হচ্ছিল! কিন্তু কুন্তলা নীচেয় চ’লে যেতেই সে স্বপন-পুরীর সমস্ত উৎসব-দীপ আমার চোখে যেন ম্লান হ’য়ে পড়ল!

ডাক্তার নিয়ে ব্রজমোহন এলো। তিনি দেখে বলে গেলেন “কিছু না, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—দু’তিন দিনের মধ্যেই সেরে যাবে!” গেলও তাই! চার দিনের দিন কুন্তলা আমাকে নিজের হাতে গরমজল ও ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে, মাছের ঝোল ভাত রেঁধে খাইয়ে, বারান্দায় আমার বেতের চেয়ারখানা পেতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বলে গেল—রাস্তা দেখো, নয় বই টই কিছু পড়ো—আজ দিনের বেলা খবরদার ঘুমিওনা যেন!

এই ক’টা দিনের দিবারাত্র ঘনিষ্ঠতায় কুন্তলার ‘আপনি’কে আমি জোর ক’রে ‘তুমি’তে ঠেলে এনেছিলুম বটে, কিন্তু সে আমাকে যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ-লোকে ঠেলে এনেছে,—এর মোহ যেন আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে! তার সঙ্গ—তার দৃষ্টি—তার কথা—তার হাসি—তার কণ্ঠস্বর—এ সবই যেন আজ আমার কাছে বাঁচবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে!

৩

আবার নিয়মিত জীবন যাত্রা সুরু হয়েছে, পড়াতে যাই, সেখানেই খাই, রাত্রে বাসায় শুতে আসি!

কুন্তলা শুধু সকালে একবার ব্রজ ওঠবার আগেই চকিতের ন্যায় এসে চা তৈরি করে দিয়ে আমাকে খাইয়ে নিজে একটু প্রসাদ পেয়ে চলে যায়!

তারপর আবার সেই রাত্রে যখন ফিরি তখন সে একবার এসে ঘরের চাবী খুলে দিয়ে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়ে চলে যায়। বিদেশে একলাটি ঘরে শুয়ে থাকি বলে সারারাত আমার ঘরে আলো জ্ব'লে!

আমার অসুখ সেরে যেতেই কুন্তলা আমার চাবির রিং আমাকে ফেরত দিতে এসেছিল, কিন্তু আমি নিই নি! বলেছিলুম—থাক্, ওটা তুমিই রেখে দাও কুন্তলা, ও পকেটের চেয়ে আঁচলেই মানায় ভাল!

রাত্রে আজকাল ব্রজ মিস্ত্রির বৈঠকে একটু যেন বেশী গোলমাল শুন্‌তে পাওয়া যেতো! অনেক রাত পর্য্যন্ত তাদের মদ-ভাঙ আর তাড়ির আসর এবং জুয়া খেলা চ'লতো! মাঝে মাঝে ব্রজ মিস্ত্রির বিকৃত কণ্ঠে 'কুন্তি' 'কুন্তি' হাঁকও শুনতে পেতুম—হয় দু'টো লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়ে যা—নয় দুটো প্যাজ সিদ্ধ দিয়ে যা—ইত্যাদি হুকুম তাকে যে কত রাত্রি পর্য্যন্ত তামিল ক'রতে হতো—কে জানে? কারণ, খানিকটা শুনতে শুনতেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম!

আমার বরাবরই ঘরের দোর জানালা সব খুলে শোওয়া অভ্যেস। একদিন, কত রাত্রে ঠিক মনে নেই, হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে সজোরে দরজা বন্ধ করার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল! আমি ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসতেই মনে হ'ল যেন কুন্তলা আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে সভয়ে জড়িয়ে ধ'রে কম্পিত কণ্ঠে বলছে—আমাকে তুমি বাঁচাও! ওরা আমাকে ধরবার জন্য তাড়া করেছে!

ভাল ক'রে চেয়ে দেখি সত্যইত' কুন্তলা! তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল! আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি? কি হ'য়েছে বলো তো? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নি!

কুন্তলা প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে তাড়াতাড়ি যা বললে, শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম! ব্রজ মিস্ত্রি তার তাড়ির ইয়ার ভোলা ময়রার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ঘুস নিয়ে কুন্তলাকে তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে! ভোলা ময়রা আজ নেশায় চুর-চুরে হ'য়ে তাকে টেনে নিয়ে যেতে এসেছে। ব্রজ আর তার অন্যান্য সঙ্গীরা ভোলাকে এ কাজে সাহায্য করতে লেগেছে!

বাইরে থেকে আমার ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা মেরে ভোলা ময়রা মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—বেরিয়ে আয় বলছি শিগগীর!—কেন অপমান হবি!

আমি ভিতর থেকে তাকে ধমক দিয়ে বললুম—না যাবে না, ভাল চাস্ তো স'রে পড়্ ভোলা, নইলে আমি পুলিশে খবর দেবো!

আমার গলা পেয়ে বাইরে থেকে ব্রজ বলে উঠল—কে দা-ঠাকুর নাকি? বেটীকে বার করে দিন দেবতা! বেটী বড় পাজী, ভোলার সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক করেছি। ভোলা আমাকে পঞ্চাশ টাকা পণ দিয়েছে। কিন্তু বেটী কিছুতেই ভোলার সঙ্গে যেতে রাজি হ'চ্ছে না, বেটীর ভদ্রলোকের ছেলের উপর ঝোঁক্!—ছুঁড়ীটার-স্বভাব চরিত্র মোটেই ভাল নয়!

আমি ব্রজকে উদ্দেশ ক'রে বললুম—আচ্ছা, ভোলাকে তুই আজ যেতে বল্। কাল আমি এর বিচার ক'রে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভোলার সঙ্গে কুন্তির বিয়ে দেওয়াবো বুঝলি!

কুন্তলা আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে বলে উঠল—ও গো—না গো, না, তোমার দু'টি পা'য়ে পড়ি, তুমি আমার এমন সর্ব্বনাশ কোরো না!

আমি কুন্তলার গা' টিপে তাকে ইঙ্গিতে চুপ ক'রতে ইসারা করে আবার ব্রজকে বললুম—আমার কথা শোন্ ব্রজ, তা'হলে সবদিক বজায় থাকবে, নইলে পুলিশে খবর দিয়ে আমি তোদের সব একঝাড়ে বাঁধিয়ে দেবো! আজ বরং এই দুটো টাকা দিচ্ছি নিয়ে মদ-টদ খেয়ে আমোদ ক'রগে যা। কাল আমি কুন্তলাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এর একটা বিহিত করবো!

জানলা গলিয়ে আমি দুটো টাকা বাইরে ফেলে দিলুম। ব্রজ কুড়িয়ে নিয়ে বললে—যে আজ্ঞে দা-ঠাকুর, তাই হবে। আপনার কথা কি আমরা ঠেল্‌তে পারি।

ব্রজ তখনই সেই মাতালের দলকে তাড়িয়ে নিয়ে নীচেয় নেমে গেল।

ভোলা ময়রা যেতে যেতে গজ্‌রাতে লাগল'—কিন্তু, কাল যদি তোর বেটীকে না পাই বেজা, তা'হলে তোকে আমার টাকাটা সব নগদ ফেলে দিতে হবে, এ আমি আগে থাকতে বলে রাখছি!

সবাই চলে যাবার পর কুন্তলা ব্যাকুল ভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কাল কি উপায় হবে?

আমি একটু হেসে বললুম—কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে, আজকের রাতটা তো তুমি রক্ষে পেলে কুন্তলা।

কুন্তলা কিছু না বলে নতমুখে বসে রইল।

আমি অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলুম। মনে হ'ল সে যেন কোন্ অকূল ভাবনা সাগরের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে!

একবার মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করে—আমি তাকে অধীর আগ্রহে আমার বুকের উপর টেনে নিলুম। সে চমকে উঠল! আমি তার ভয়-পাণ্ডুর অধর প্রান্তে বারম্বার মিলনের মধুচিহ্ন এঁকে দিয়ে বললুম—"ভয় কি কুন্তলা, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমাকে এদের হাত থেকে বাঁচাবোই, কিন্তু আমার নিজের হাত থেকে বোধ হয় তোমাকে আর রক্ষে করতে পারবো না!"

কুন্তলা অসাড় নিস্পন্দের মতো নিরবে কিছুক্ষণ আমার বুকের মধ্যে মুখখানি লুকিয়ে পড়ে রইল। তারপর সহসা স্বপ্নোত্থিতার মতো আমার আলিঙ্গন পাশ মুক্ত হ'য়ে উঠে পড়ল, তারপর কি ভেবে গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে, ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

তখন ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বইতে সুরু হয়েছে, এবং পূবের আকাশ আসন্ন তরুণোদয়ে ক্রমশঃ লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে!

* * * *

ভোলা ময়রার পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিয়ে, ব্রজকে বিয়ের খরচ বলে কিছু নগদ ধরে দিয়ে আমিই কাল ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধরে এনে কুন্তলাকে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ করবো, এবং কালকের ট্রেণেই ওকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাবো এই সব ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই, ব্রজর ডাক-হাঁকে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি অনেক বেলা হ'য়ে গেছে! ব্রজ কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে ব'ললে—"দা'ঠাকুর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, এই বার বুঝি হাতে দড়ী পড়ল'। আপনি শিগগীর একবার নীচেয় চলুন, কুন্তি বেটী বোধ হয় বিষ খেয়েছে!"

ঘুমচোখেই পাগলের মত আমি নীচেয় ছুটে এসে দেখলুম—ব্রজ একটুও মিথ্যে বলে নি, কুন্তলার সর্ব্বাঙ্গে বিষের ক্রিয়া সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে!

ব্রজকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের বাড়ী ছুটে যেতে বলে আমি একেবারে হাহাকার করে কুন্তলার পাশে আছ্‌ড়ে পড়লুম!

—কেন, কেন তুমি এ কাজ করলে কুন্তলা? আমি যে আজ তোমাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিলুম!

কুন্তলার মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল! সে বললে—ছি! আমার মায়ের ইতিহাস শোনবার পর আর কি আমি তোমাকে সে কলঙ্কের ভাগী হ'তে দিতে পারি!

পাগলের মতো বললুম—জননীর অপরাধে নির্দ্দোষ সন্তানের দণ্ডবিধান যে মনুষ্যত্বের বিরোধী কুন্তলা! সমাজ যদি তোমাকে গ্রহণ না করতো, আমি তাহ'লে সে হৃদয়হীন সমাজের বাইরে গিয়ে তোমায় নিয়ে বাস করতুম!

প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে কুন্তলা বললে—ওগো! তোমার ঋণ এ জীবনে আর আমার শোধ করবার সুযোগ হ'লনা! আশীর্ব্বাদ করো যেন জন্মান্তরে নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে এসে তোমার সেবার অধিকার পাই!"

* * * * * *

ব্রজ ডাক্তার নিয়ে এলো বটে, কিন্তু কুন্তলা তখন চলে গিয়েছে!

সেইদিনই রাত্রের ট্রেণে আমি বাড়ীমুখে রওনা হলুম।

অবশ্য বাড়ীতে সকলেই তাদের হারানিধি ফিরে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন, কিন্তু আমি যা সেদিন হারিয়ে এসেছিলুম—এ জীবনে আর তা ফিরে পাওয়ার আনন্দ পাই নি।
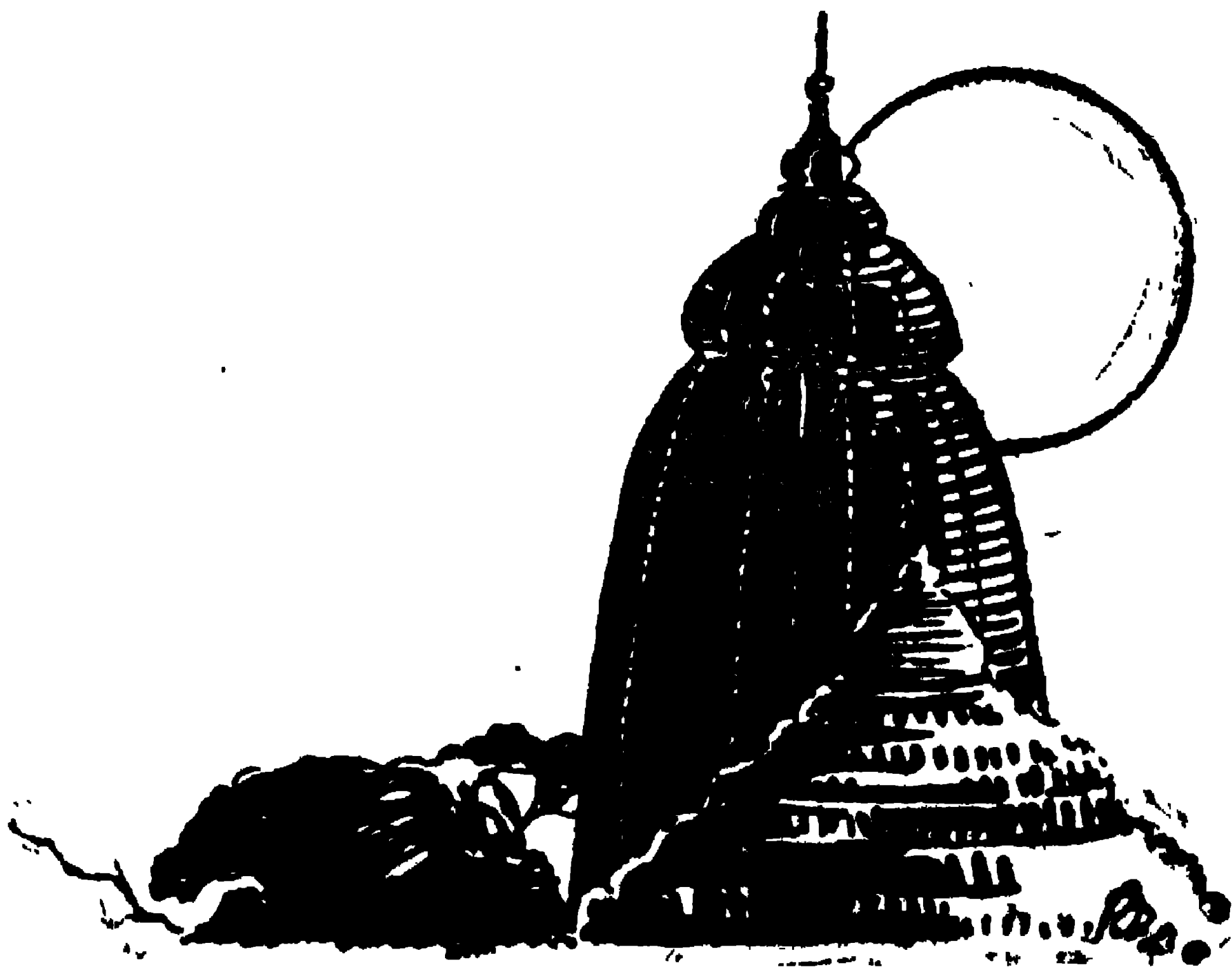
"—হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

শ্রীরাধারাণী দত্ত

বাপ-মায়ে নাম রেখেছিল রাণী। সেই নামেই সারাজীবন কেটে গেল। নাম সার্থক হ'য়ে উঠেছিল কিনা জানা নেই।

ছেলেবেলায় গণৎকার এসে হাত দেখে ব'লতো—এ মেয়ের রাজার ঘরে বিয়ে হবে।—

রাণী হওয়ার পাট্টা তার হাতের তালুর রেখায় বিধাতা নাকি স্পষ্ট করে' গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন!···

মাথার চুল, গায়ের রং, মুখশ্রী থেকে তার হাঁটার ভঙ্গী, চোখের চাউনি, হাসির ধরণ, সবেতেই নাকি রাণী হওয়ার সুলক্ষণ সুস্পষ্ট।—বাড়ীর পুরাণো দাসীরা—আশ্রিতা বিধবার দল থেকে আরম্ভ ক'রে—গদীর ম্যানেজার আমলা, খাজাঞ্চী, পর্য্যন্ত সকলেই এই এক কথা ব'ল্‌তো।

কিন্তু ভাগ্যদেবীর খেয়াল হ'ল অন্য রকম। ব্যবসায়ে প্রচুর লোক্‌সান গেল। বছরখানেকের ঘূর্ণীপাকে সরকার, দ্বারবান, দাসদাসীর দল শুদ্ধ মস্তবড় বাড়ীখানা—আর ম্যানেজার গোমস্তা, নায়েব, খাজাঞ্চী, হিসাবনবিশ, নকলনবিশ প্রভৃতি সমেত কারবারটি কোথায় যে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল তার চিহ্ন মাত্র রইল না!

অবশিষ্ট ঋণের রাশি, বিপুল অপমান ও মনোকষ্টের বোঝা এবং রাণী ও রাণীর মাকে নিয়ে—তার ব্যবসায়ী পিতা নেবুবাগানে একটি সরু গলির ভিতর দু'খানি একতলা ঘর ভাড়া ক'রল।

তখনও রাণী রান্না ঘরের তাতের দিকে যেতে পারে না! মোটা চালের ভাতের রাঙা রাঙা দানাগুলো পাতের উপরে বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়িয়ে রেখে—ভারী মুখে 'ক্ষিধে নেই' বলে ছল্‌ছল্‌ চোখে আঁচাতে উঠে যায়! ··· ··· ··· বয়স সবে দশ বছর!

এমনি করে' আরও একটা বছর কাট্‌ল বটে, কিন্তু রাণীর বাপের এত দুঃখ সইল না।

রাণীর মায়ের সিঁথির সিঁদুর, হাতের রুলি, শাড়ীর পাড়টুকু মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেবুবাগানের ভাড়াকরা একতলা-ঘরের সংসারটুকু, যাবতীয় তৈজসপত্র সহ অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

এবার রাণীকে নিয়ে রাণীর মা এলো এক অতি দূরতম সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী।

বাড়ীটা রাজপ্রাসাদ তুল্য বটে,—কিন্তু রাণীর সিংহাসন মিল্‌ল—রান্নাঘরের হেঁসেলে কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ির উপর। ... ... মা মাইনে নিয়ে রাঁধুনীর কাজে ভর্ত্তি হ'ল।

... ... মায়ের শরীর দিন দিন ভেঙে প'ড়ছে।...মাকে উঠিয়ে দিয়ে রাণী ধোঁয়ার কুণ্ডুলির ভিতরে নিজের হাতে হাতা খুন্তি নিয়ে হেঁসেল-রাজ্য পরিচালনা করে!

রাণীর মা'ও আর সইতে পারলে না। তারও খেয়া নৌকা পার-ঘাটে এসে ভিড়ল।... ... যাবার আগে মা তার মেয়েকে বুকে করে' মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে' নীরবে আশীর্ব্বাদ করে' গেল!... ... ...বোধ হয় রাণী হওয়ারই আশীর্ব্বাদ!...

মাস কতক রাণী অর্দ্ধাহারে অনিদ্রায় আশঙ্কায় উদ্বেগে অশ্রান্ত অশ্রুজলে কাটালে!... .. তারপর কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি'র সিংহাসনে একচ্ছত্র কায়েমী অধিকার পেলে!—রাঁধুনীর কাজে এতদিন সে মায়ের সহকারিণী ছিল মাত্র!... ... ...

কিন্তু সময় তার কাজ ক'রতে অবহেলা করলেনা,—দুঃখী হ'লেও তার দান থেকে তো কেউ বঞ্চিত হয় না। রাণীর সারা অঙ্গে নূতন সৌন্দর্য্য সম্পদ্ বিকশিত হ'য়ে উঠছিল আপনা আপনিই!

বাটনা বেটে রান্না করে' হাত দু'খানি তার স্বাভাবিক কোমলতা অনেকখানি হারালেও, দশ আঙুলের নখ ক্ষয়ে ক্ষয়ে চতুর্থীর চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করলেও চাঁপা'র বরণ গালে কিন্তু তার গোলাপ ফুট্‌তে সুরু করেছিল!...পুষ্পিতা মাধবী লতা'র মত সারা তনু তার শোভন ও সাবলীল হ'য়ে উঠছিল। ডাগর চোখের কালো তারায় নূতনতর আবেশে'র সরস-রঙীণ ছায়া ঘনিয়ে আস্‌ছিল!... ... ...

গৃহকর্ত্রী এই গলায়-পড়া 'মা-বাপ-খেগো' মেয়েটার জন্য উদ্বিগ্না হ'য়ে উঠলেন।

'হা-ঘরে' মেয়ের আবার এত রূপ কেন? রূপ নয়তো যেন জ্বলন্ত অনলশিখা! ও' শুধু নিজে পুড়ে ছারখার হয় না—অন্যকেও ছারখার করে' দেয় যে!... ...

—মেয়ে তো নয় যেন আগুণের ফুল্‌কি!.. অনেক আগে থেকেই তার বেটাছেলেদের পরিবেষণ করা বন্ধ হ'য়েছিল—এখন রাণীকে কড়া হুকুমে সতর্ক করা হ'ল—খবর্দ্দার! বেটা-ছেলেদের ছায়া মাড়াবিনে!—

রাণী রান্না করে, বাটনা বাটে, দরকার হ'লে বাসনও মাজে। তার নাম কিন্তু আগেকার মত এখনও 'রাণী'ই রইল,—তার আশৈশবের রাণী হওয়ার স্বপ্ন— সেটাও আগেকার মত এখনও তার মন-রাজ্য জুড়েই রইল !…

দুপুর বেলা দোতালা'র বড় ঘরে শীতল পাটী'র উপরে নিদ্রিতা গৃহিণীর পাকা চুল তুলতে তুলতে রাণী খোলা জানালা-পথে বাইরে'র পানে তাকিয়ে থাকে !…

শরৎকালে'র রঙীণ রৌদ্র-বিভাসিত স্বপ্ন-ভারাক্রান্ত স্তব্ধ অলস মধ্যাহ্ন। আকাশ স্বচ্ছ, গাঢ়-নীল। উজ্জ্বল শাদা মেঘপুঞ্জ এলো-মেলো বিক্ষিপ্ত ভাবে ভেসে চলেছে !… …চিল'গুলো ক্রমশঃ উঁচু হ'তে আরও উঁচুতে উঠে চলন্ত মেঘের নীচে পাক্ খেতে খেতে কম্পিত করুণ চিৎকারে ক'কিয়ে উঠছে !… …

জানালার বাইরের নিম গাছটির সরু সরু পাতা স্বল্প বাতাসের মৃদু ছোঁয়ায় ঝির্ ঝির্ করে' কাঁপছে। খিড়কীর পুকুরের ওপারে ঘন বাঁশে'র অরণ্যে বাতাস কখনও করুণ সুরে বেণু বাজায়, —কখনও পল্লবে পল্লবে নূপুরের সুমিষ্ট শিঞ্জন তোলে !

… … …পুকুরের স্বচ্ছ থির জলের আধখানি, বনের গাঢ় ছায়ায় কালো,—অপরার্দ্ধ দুপুর রৌদ্রে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে কেবলই চক্ চক্ করতে থাকে—যেন কার প্রতীক্ষায় তার গোপন অন্তরখানি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে !

রাণী চেয়ে চেয়ে ভাবে—কত কীই ভাবে !… … …অতীতকে সে কোনও দিন ভাবতে শেখেনি…বর্ত্তমানকেও সে কখনও ভাবতে পারতোনা……ভবিষ্যৎ যে চিরদিন তাকে রাণীর মুকুট পরিয়ে রেখেছে !‥ শৈশব হ'তে আজ পর্য্যন্ত তার চোখের সামনে, জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎই শুধু—বিচিত্র শোভায় সম্পদে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে রস-পরিপূর্ণ হ'য়ে জেগে আছে ! ‥ ব্যর্থ অতীত—তুচ্ছ বর্ত্তমান—তার দিকে নজর দেবার সময় কোথায় ? আবশ্যকই বা কি ?… … …

ভাবতে ভাবতে পাকাচুল বাছা বন্ধ হ'য়ে যায়,—নিদ্রিতা গৃহিণীর মাথায় হাত খানি রেখে রাণী স্তব্ধ আড়ষ্ট হ'য়ে বসে' থাকে !

রান্না ঘরের-ধোঁয়া জালের আড়ালে, মাছে হলুদ মাখাতে মাখাতে, কিম্বা কোটা তরকারী জলে ধুতে ধুতে চিত্ত তার অকারণে চঞ্চল অধীর হ'য়ে ওঠে !… ‥ মনে হয় কখন্ সে তার নিজের সংসারের সুন্দর আসনখানির উপরে গিয়ে বস্‌তে পাবে !… … এই স্নেহ, প্রেম, করুণাহীন পরের ঘরের নিরস ঘর-করণা—হেয়-দাসীবৃত্তির আর কত বাকী ?‥ …

—হঠাৎ দিন এলো।

মোতির মালা নিয়ে রাজপুত্র নয়,—সন্ধ্যার পর কাপড় কেচে ঘাট হ'তে ফিরবার পথে—

"মরু-কুসুম"

কর্ত্তার খাস্ ভৃত্য মধু খান্‌সামা—হঠাৎ তার চলার পথ রোধ করে' দাঁড়াল'। ফতুয়ার পকেট থেকে একজোড়া পাতলা সোণার পাত মোড়া তামা'র শাঁখা বের করে'—মিনতি-করুণ সপ্রেম কণ্ঠে কি-যেন নিবেদন ক'রল। তার একটা কথাও রাণীর কাণে পৌছালনা। মধু তার হাত ধরবার জন্য হাতখানি বাড়াতেই সে হঠাৎ ভয়বিহ্বল কাতরস্বরে চিৎকার করে' উঠল!

মধু তাড়াতাড়ি রাণীর মুখে হাত চাপা দিতে গেল, কিন্তু অকস্মাৎ পিছন দিক্ থেকে কে যেন মধুর ঘাড়টা সজোরে চেপে ধরে মাটীর দিকে নুইয়ে ধ'র্‌ল!

অতর্কিত আক্রমণে তার হাত হ'তে তামা'র শাঁখা দু'গাছা ছিট্‌কে রাস্তায় পড়ে গেল!... ... পিঠের উপরে সজোরে এক লাথি—আবার একটা লাথি!...

—হারাম জাদা! এত বড় তোমার আস্পর্দ্ধা!!...

—দোহাই মেজ বাবু! ছেড়ে দিন—আপনার পা' ছুঁয়ে বল্‌ছি, আর জীবনে কখনও এমন হবে না! গর্ভধারিণী মায়ের দিব্যি—

মধু ছাড়া পেয়ে দ্রুতপদে ছুটে পালাল।

ভয়বিহ্বলা কিশোরীর সিক্ত বাস-মণ্ডিত কম্পিত তনুলতা—নয়নে শঙ্কা ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত কাতর ছায়া—

মেজ বাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব'ললেন—তুমি বাড়ী চলে' যাও, ভয় নেই। সন্ধ্যা-বেলা আর কখনও ঘাটের পথে একলা এসোনা!

রাণী মাথা হেঁট করে' আস্তে আস্তে বাড়ীর পানে চলে গেল!—শঙ্কা ও ভয় অন্তর্হিত হ'য়ে তখন রাজ্যের বিপুল লজ্জা তার সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল!

কর্ত্রীর এই মেঝ' ছেলে বিশ্বনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ছুটীতে সে বাড়ী এসেছে!

...হঠাৎ একদিন মায়ের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করে' ব'স্‌ল—রাণীকে সে বিয়ে কর্‌বে!

—সে কি রে? রাঁধুনীর মেয়েকে বিয়ে ক'রবি কি?

—কেন? ও' তো চিরকাল রাঁধুনীর মেয়ে ছিল না,—রাঁধুনীর মেয়ে হ'য়ে জন্মায়ওনি,—জন্মেছিল তো বড়লোকের মেয়ে হয়েই—

—তা' বলে তুই নিজের বাড়ীর রাঁধুনীকে বিয়ে ক'রবি? তুই কি ক্ষেপেছিস্ বিশু?

—নিজের স্ত্রী কি নিজের বাড়ী রান্না করে না?

—চুপ কর্, অমন কথা মুখেও আনিস্‌নে—কর্ত্তা শুন্‌লে অনর্থ কর্‌বেন!

রাণীর কানে কথাটা সেইদিনই গিয়ে পৌছেছিল। মেজদাদাবাবু'র প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তার তরুণ হৃদয়টী ভরে' উঠল। সে মনে মনে তাঁর পায়ে নমস্কার জানালে! কিন্তু কর্ত্তাও শুনলেন এবং অনর্থও ঘট্‌ল।

বিশু রাগ করে' কলিকাতায় চলে গেল এবং কর্ত্তাও রাগ করে' পড়ার খরচ পাঠানো বন্ধ করলেন !...

বাড়ীশুদ্ধ লোকের রাগটা গিয়ে পড়ল রাণী'র উপরেই !—রাণীও এ'জন্য নিজেকে অপরাধিনী মনে না করে' থাকতে পারলে না !......তারই জন্যে তো এমন দেবতুল্য মেজদাদাবাবু'র কর্ত্তার সঙ্গে মনোমালিন্য হ'ল !...অনুতাপে ও ধিক্কারে তার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠলো !

মধু খানসামা কর্ত্তার কাছে সঙ্গোপনে বহু গোপন-তথ্য বিজ্ঞাপিত ক'রলে !.. মেজবাবু'র চেয়ে রাণীরই দোষের ভাগ বেশী। কারণ সে'ই যখন-তখন ঘাটের পথে, বাগানে,—এধারে সেধারে—সন্ধ্যার ছায়ায় মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতো !

এবারে মেজবাবু ক'লকাতা থেকে রাণীর জন্যে যে সোনা-বাঁধানো তামার শাঁখা এনে দিয়েছেন—সেটাও কর্ত্তাকে সে চুপি চুপি দেখাতে ভুল্‌ল না।

কর্ত্তা অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ব'ললেন—দাও হারামজাদীকে জুতো মেরে তাড়িয়ে—গিন্নি ব'ললেন—চুপ কর, লোক হাসবে ! ছেলেটা'র কেলেঙ্কারী জানাজানি হ'য়ে যাবে ! নিজেদের জাত—ভদ্র ঘরের মেয়ে—বের করে' দিলে অধর্ম্ম হবে—যেখানে হোক্ দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দাও !—আপদ চুকবে —

রাণীকে গ্রহণ ক'রতে মনিবশ্রেণী হ'তে ভৃত্যশ্রেণী পর্য্যন্ত বাড়ীর সকল পুরুষই মনে মনে রাজী ছিল,--কিন্তু তাদের সঙ্গে জাতে কুলে মিলবে না কিম্বা মর্য্যাদায় মিলবে না ব'লে বিয়ে ক'রতে কেউ অগ্রসর হ'ল না ! সকলেই মনের ভাব গোপন ক'রে—মেজবাবু'র এই নিম্নরুচি ও হীন অসংযত প্রবৃত্তির প্রতি বিপুল-বিস্ময় প্রকাশ ক'রতে লাগল !

রাণী কিন্তু এ'সব শুনে মরমে মরে গেল !

বাড়ীর পুরানো বাজার-সরকার নরহরি আইচ্ ব'ললে—তার একটি ভাইপো আছে ! ক'লকাতায় খিদিরপুরে'র জেঠীতে জাহাজের কাজ করে। মাইনে ছাব্বিশ টাকা,—কিন্তু উপরি মাসে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট্ ! একটা বিয়ে করেছিল, সে বউটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে ! ছেলেপুলে নেই, বয়সও অল্প—

কর্ত্তা গিন্নী সাগ্রহে ব'ললেন—এখুনি—এখুনি—

সেই মাসেরই সামনের লগ্নেই শাঁখ বাজিয়ে রাণীর বিয়ে হ'য়ে গেল !

রাণীর এবার নূতন জীবন সুরু হ'য়েছে !

নরহরির ভাইপো'র নাম ছিল ভূপতি !...দোজবরে' ভূপতির গলায় মালা দিতে রাণী একটুও দুঃখিতা হয়নি, বরং মনে মনে বোধ হয় খুসীই হ'য়েছিল—এইবার সে নিজের ঘরে নিজের সংসার ক'রতে পাবে ভেবে !—

বিয়ের দিন বার বার বাবাকে মাকে মনে প'ড়ে চোখ হু'টি তার কেবলই অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠেছিল! কিন্তু বিয়ের দিনে অশ্রুপাত ক'রলে পাছে স্বামী'র কোনও অশুভ হয় সেই ভয়ে সে গোপন হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা-পুঞ্জ সযত্নে সংবরণ ক'রে নিয়েছিল, ধারাবর্ষণে তাকে উন্মুক্ত করে' দিয়ে নিজে'র বুকের ভার লঘু ক'রতে চায়নি।

ভূপতির চোয়াড়ে চেহারা—ঘাড় চাঁচা! সামনের লম্বা চুলে তৈলসিক্ত-টেরী,—বসা চোখ-মুখের ঔদ্ধত্য পূর্ণ চটুল ভাবটা রাণীকে মুগ্ধ না ক'রলেও বিরাগ-পূর্ণও করেনি। মোটের উপরে এটাকে সে গভীর বিশ্বাসে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলেই মেনে নিয়েছিল! সে যে তার স্বামী…এই চিন্তাই ভূপতির সব অসৌন্দর্য্য সকল রিক্ততা ঢেকে রাণীর চোখে তাকে সহনীয় করে' তুলেছিল।

স্বামীর প্রতি যে বিপুল অনবদ্য প্রেমরাশি তার তরুণ-মর্ম্মপাত্র ছাপিয়ে, দেবতার উদ্দেশে সাজানো পবিত্র অর্ঘ্যেরই মত উন্মুখ হ'য়েছিল…ভূপতির চেহারার দৈন্য তাকে ধূলিসাৎ ক'রতে পারল না বরং সেই যৌবনেই বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত অস্থিচর্ম্ম সার স্বামীর প্রতি তার মায়া ও করুণা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগল!…আহা! ঘরে কেউ যত্ন করবার লোক নেই, তাই এমন রোগা চেহারা!……রাণী নিশ্চিন্ত-বিশ্বাসে মনে মনে ঈষৎ গর্ব্ব অনুভব করলে…আমার হাতের সেবা-শুশ্রূষায় যত্নে ভদ্রারকে এই কোলকুঁজো রোগা-চেহারা আবার অন্য রকম হ'য়ে যাবে!

খিদিরপুরে একটা খোলার ঘরের বস্তিতে, করোগেট্ টিনের একখানি একতলা বাসা বাড়ীতে রাণীর সংসার রাজত্ব সুরু হ'ল!

গণৎকারে'র ভবিষ্যৎবাণী ফললো বোধ হয় শুধু তার ঐ স্বামীর নামটিতে!

রাণীর বিবাহিত জীবনের তখনও একটি বৎসর পূর্ণ হয়নি, ভূপতির রাত্রে বাড়ী ফিরে আসা ক্রমে বন্ধ হ'য়ে এল!……বিবাহের পূর্ব্বেকার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল-জীবন আবার তাকে পেয়ে বসেছে!…

সুন্দরী তরুণী বধূর মোহে প্রথম কয়েকটা মাস তার জীবনের সুর একটু যেন বদলেছিল।… কিন্তু আবার যে-কে-সেই!

সেই ডক্ থেকে শূন্য পকেটে মত্তাবস্থায় শেষরাত্রে ফিরে আসা…বাড়ী ফিরে…চীৎকার মাতলামি,…বমি… হাসি কান্না…অশ্রাব্য গালমন্দ, প্রহার, হৈচৈ…বীভৎস ব্যাপার…

এ'পাড়ায় অবশ্য এ' কিছু নূতন ব্যাপার নয়। বস্তির প্রতি ঘরে-ঘরেই এই দৃশ্যাভিনয় চলেছে।…নূতনের মধ্যে এ' বস্তিতে রাণীর মত মেয়ের আবির্ভাব!…সে ঘর থেকে বেরোয় না,…বস্তির অন্য সব পুরুষদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে না,…প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে তুমুল

ঝগড়া করে না! বস্তি'র স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ একটী লোকের সঙ্গেও সে আজ পর্য্যন্ত কথা কয়নি!

এমন সু-চেহারার এবং এমন ভদ্র ধরণ-ধারণের মেয়েরা, এ' রকম বস্তিতে থাকার উপযুক্ত নয়, এটা তারা সকলেই জানতো!

আশ্চর্য্য হ'য়ে সকলেই ভাবত…ভূপতিটা এমন একটা খাসা-মেয়ে কি করে' কোথা থেকে বাগিয়ে আন্‌লে!

শনিবার রবিবার ভূপতি ডকে'তেই রাত্রি কাটায়,…মাইনে পেলে আর দু'তিন দিনই বাড়ী ফেরে না!

রাণী প্রতিবাদ করে।

প্রতিবাদের ফলে সর্ব্বত্র যা' ঘটে, এখানেও তাইই হয়!

মার-ধোর্, লাথি·· চুলের মুঠি·· গালিগালাজ, কুকথা……

ভূপতির উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলেছে; ফলে অর্থাভাব…ধারকর্জ্জ…ঘটি বাটী বাঁধা…রাণীর অর্দ্ধাহার…অনাহার…প্রহার…উপবাস·· দুঃখ দৈন্য ও কষ্টের যেন সীমা নেই!…দিন যেন আর চলে না!

ক্রমে রাণীর ঘরের জানালার ধারে প্রেমের গান শোনা যেতে লাগল! ঘরের ভিতরে চিঠি …মিঠাপানে'র দোনা…ঠোঙাভরা মিষ্টি…আরও কত কি এসে পড়ে!……রাণী শঙ্কিত মনে একলাটী রাত কাটায়…সারাদিন সভয়ে থাকে!

ক্রমে চিঠির সঙ্গে টাকা কড়িও আসতে লাগল!…একদিন একছড়া রূপোর ঝক্‌ঝকে কোমরের ভারী গোট্‌ এলো,…রাণী কেঁদে ভূপতিকে দেখিয়ে…এ' পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে বাসা ক'রতে অনুরোধ ক'রলে।

ভূপতি কতকগুলো কদর্য্য কুৎসিত কথা বলে' রাণীকে সেই গোট্‌ছড়া দিয়েই বেদম প্রহার ক'রল!……

যাবার সময় বলে গেল…তোর মত নষ্ট মেয়েমানুষদের রীতি আমার ঢের জানা আছে! এ' পাড়ায় আর মনের মানুষ মিলছে না বলে' এখন অন্য পাড়ায় উঠে যাবার মৎলব!…বিপনে-শালা'র সঙ্গে আর বনছে না বুঝি?……

এমন ধারা মার নূতন নয়, অশ্রাব্য গালিও নূতন নয়,…কিন্তু শেষের কথা ক'টা রাণীর বুকে শেলের মত গিয়ে বিঁধল!…

প্রহৃতা রাণী স্তম্ভিত মুখে চুপ করে' বসে রইল!…তিনদিন পেট ভরে' খাওয়া হয় নি, ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রাণ তার টা' টা' করছিল,…তার উপরে এই লাঞ্ছনা!

……খোলা দরজার সামনে বিপিন এসে দাঁড়াল। নয়নে অপরিসীম সহানুভূতি, গলার স্বরে গভীর করুণা ঢেলে বললে—এমনি করে' নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন বলো তো? কী ছিলে—দিন দিন কী হ'য়ে যাচ্ছ? নিজের আত্মা পুরুষকে কষ্ট দিলে ভগবান রুষ্ট হ'ন!… …আমি যে তোমার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি!…ওর কি? ও'তো এখান থেকে বেরিয়ে ডকে'র কুলী মাগীদের নিয়ে দিব্যি ফুর্ত্তি ক'রতে ক'রতে মহিম সা'র দোকানে গিয়ে ঢুকল।—

রাণী জলন্ত চোখে বিপিনের দিকে চেয়ে ব'ললে—আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যাও বলছি,—

—যাচ্ছি। কিন্তু আমার দশ ভরি'র রূপোর গোট ছড়াটা তুমি দয়া করে' পোরো—আমার মাথা খাও। আমি তোমার নাম করেই গড়িয়ে এনেছি—

গোট্ ছড়াটা তখনি ফিরিয়ে দেবার জন্য রাণী চেয়ে দেখলে গোট্ ছড়া ঘরে নেই, ভূপতি নিয়ে চলে গেছে! কিন্তু রাণীর মুখে পিঠে বাহুতে গোটের প্রহার-চিহ্ন তখন লাল হ'য়ে দড়ির মত সব ফুলে উঠেছিল!—

সেইদিকে সহানুভূতিপূর্ণ করুণ নেত্রে তাকিয়ে বিপিন ব'লল—ইস্! একেবারে আধমরা করে' ফেলেছে যে!…বুঝিছি, হতভাগা তোমায় মেরে সেই গোট্ নিয়েই গোকুল মিস্ত্রীর ছোট মেয়েটার কাছে গেছে!…ওটা শয়তান।

কিছুক্ষণ সস্নেহ-নেত্রে রাণীর নিশ্চল মূর্ত্তির পানে তাকিয়ে থেকে বিপিন বলল—আচ্ছা, তোমার মনে এখন কষ্ট হয়েছে,—এখন আমি চললুম। ভাল করে' ভেবে দে'খো,—একটু পরে আর একবার আসবো। আমি তোমারই ভালর জন্য ব'লছি! আমি তোমাকে সত্যিই খুব ভালবাসি—তাই সুখে রাখতে চাই। ভূ'পোটা তোমায় যা' কষ্ট দেয়—তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো; আমি গাড়ী আনছি—

বিপিন চলে গেল। রাণী পাথরের পুতুলের মত নিথর হ'য়ে বসে'—সম্ভব অসম্ভব নানা ভাবনা রাশির তলে তলিয়ে গেল!…

কতক্ষণ কেটে গেছে রাণী টের পায়নি!……সন্ধ্যা উৎরে এলো……রাত ঘনিয়ে আসছে—

… সর্ব্বাঙ্গ প্রহারের টাটানি, অসহ্য ব্যথা, ক্ষুৎপিপাসায় শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে, রাণী উঠে হাঁড়িকুড়ি নেড়ে দেখলে—এক মুষ্টি ক্ষুদও আজ আর অবশিষ্ট নেই—বুকের ভেতরটা উন্মথিত করে' একটা চাপা কান্না ফুটে উঠলো—আর যে সহ্য হয়না ভগবান!

বিপিন আবার গাড়ী নিয়ে ফিরে এসে ব'ললে—আমি ছোটলোক নই। তোমাকে বস্তির আর পাঁচটা মেয়ের মতো মনে করে' তোমার সঙ্গে যে বেয়াদপী করছি, সে জন্য মাফ চাচ্ছি!

তুমি যদি না আসতে চাও—এসোনা—কিন্তু এমন করে' না খেয়ে মরবে, সে আমি দেখতে পারবো না! আমি কিছু খাবার কিনে এনেছি! এই নাও, কি খাবে বলো?……আমার সঙ্গে যে এলেনা—নইলে তোমাকে কি এতো দুঃখ সইতে হ'তো?—রাণী'র মতো থাকতে!—

রাণী চম্‌কে উঠে বিপিনের দিকে বিস্ময় বিমূঢ়ার মতো অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে রইল। ……তারপর কি ভেবে ধীরে ধীরে তার দুর্ব্বল দেহ খানিকে টেনে নিয়ে শিথিলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে নির্ব্বাক অবস্থায় এসে বিপিনের গাড়ীতে উঠে ব'স্‌ল!……

"জীবে দয়া"

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

ফুলের কাঁটা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

তার রূপ ছিল অসামান্য -শরৎকালের ঝরা শিউলীর মতোই স্নিগ্ধতায় ভরপুর। সেকেলে ধরণে কোন পরীর সঙ্গে সেই রূপের উপমা দিতে গেলে কথাটা কেবল যে হেঁয়ালীর মতোই অস্পষ্ট ঠেকে এমন নয়, নব্য সাহিত্যিক যুগে এরূপ মজ্জাগত কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়াটাও বেয়াদবী বলে বিবেচিত হয়—কাজেই হাল ফ্যাসানে কোন শিল্পীর আঁকা সতেরো বছরের তন্বীর নিটোল রূপটিই ছিল তাঁর যোগ্য উপমাস্থল—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাল্যকালে তাঁর সৌন্দর্য্যের অনুরূপ একটা নামকরণ সহজেই হ'তে পারতো, কিন্তু নিরুপমা, অনুপমা, যুঁই, বেলা, হেনা, রমলা প্রভৃতি দেশী-বিদেশী নামগুলি আজকালকার বাজারে মুড়ি মুড়কির মতোই এমন একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে যে তড়িৎপ্রকাশবাবু নিতান্ত ফ্যাসাদে ঠেকেই নিজের মেয়েকে খুকী নামের পরিবর্ত্তে 'বেবী' বলে ডাকতে সুরু করলেন। তারপর মেয়েটি যখন ক্রমে বড় হ'য়ে উঠলো তখন বাপ-মা ও আত্মীয় স্বজনের মনে নামের সমস্যাটিও তেম্নি গুরুতর হ'য়ে দাঁড়ালো। শেষটায় সকলে বাংলা, ইংরাজী, উর্দ্দু, ফার্সি অভিধান কেতাব ঘেঁটে মেয়ের নাম রাখলেন—রেবেকা। কাজেই ছেলেবেলার বেবী নামটিও ক্রমে রেবীতে এসে পরিণত হোল। বয়স একটু বেশী হ'লে রেবেকার পরিচিত বন্ধু মহলে তাঁর নামের একটু-আধটু পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

সেদিন রেবেকার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে চায়ের টেবিলে অচিন্ত্য বলে ফেল্লে,—দেখুন, আপনাকে রেবা নামটি আরো চমৎকার মানায়।

কুমুদ একটু রহস্যের সুরে উত্তর করলো,—তা' হ'লে আপনার কবিতা মিলের আয়াসটা বোধ হয় অনেকখানি লঘু হয়—কি বলেন?

অচিন্ত্য ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠলো—তা' কেন। এই রেবা নামের ভিতর কেমন একটা স্বচ্ছতা ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ভাব মাখানো আছে। রেবা নামটি উচ্চারণ করতেই উজ্জয়িনীর একটি স্বচ্ছ সুকুমারী নদী এবং সেই বিগত বিস্মৃত কালটির সুদূর সৌন্দর্য্যে আমাদের চিত্ত বিমুগ্ধ হয়। কি বলেন দ্বিজেন বাবু?

দ্বিজেন বাবু কলিকাতার একজন বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক, বিশেষতঃ চক্ষুর অস্ত্রোপচারে তিনি একেবারে অদ্বিতীয়। কাব্যকলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বড় একটা নেই, কিন্তু সৌন্দর্য্য উপলব্ধির কোন ছোট খাটো তর্ক উপস্থিত হ'লেই তার বিশ্লেষণে নিজের অসামান্যতার পরিচয় দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না।

দ্বিজেন বাবু একটু গম্ভীর মেজাজে জবাব দিলেন,—প্রাচীনকালের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না থাকাটাই আমি গর্ব্বের বিষয় বলে মনে করি। প্রাচীনকালে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বা শিল্প সৌষ্ঠবের কোন নিদর্শন ছিল বলিয়াই আমি মনে করি না। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কালের সৌন্দর্য্যও ঠিক এ কালোপযোগী নয়—এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমান কালটিকেই সহজভাবে একমাত্র বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির কাল বলা চলে। প্রাচীনের কোন বিষয়েই আমরা মোটেই পক্ষপাতী নই। কেন না, বর্ত্তমান নিয়েই জগৎ,—বর্ত্তমানে অন্ধ হোলে প্রাচীন নিয়ে তো কাজ চলে না,—চল্‌তে গেলেও পদে পদে তাঁকে ধাক্কা সাম্‌লেই চল্‌তে হয়। দু'হাজার বছরের আগেকার মরচে ধরা জিনিষ পত্রগুলি যেমন অকেজো, তার সৌন্দর্য্য বোধটাও তেমি হেঁয়ালী বলেই মনে করি। এই যে আজকাল জনকতক শিক্ষাভিমানী লোক মিলে প্রত্নতত্ত্বের পঞ্জী তৈরী করবার ষড়যন্ত্র খাড়া করেছেন, তার ভিতরে কতটা ঝুটো কতটা যে তাঁদের নিছক মন গড়া কল্পনা সেটা বুঝিয়ে বল্‌তে গেলে তাঁদের গালাগালির বহর আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষগুলিকেও ছাড়িয়ে যাবে নিশ্চয়। ঘুণ নামক ক্ষুদ্র প্রাণীটি কেবল যে দ্রব্য সামগ্রীর উপর স্বীয় তীক্ষ্ণতার পরীক্ষা করে এমন নয়, আজকাল অনেক প্রত্নতত্ত্ব পর্য্যালোচকের মগজেও যে তা পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাখাল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বল্লে,—দ্বিজেন বাবুর এ সব উক্তি আমি শিষ্টাচার সঙ্গত বলে মনে করি না।

রেবেকা উত্তর করলো,—দ্বিজেন বাবু, প্রাচীন বা নবীনের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিয়ে অচিন্ত্য বাবু তো কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তিনি প্রাচীন কালের সৌন্দর্য্য বিষয়ে একটা উপমামাত্র এস্থলে প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিজেন বাবু উত্তর করলেন,—তা' হোলেও প্রাচীনের সঙ্গে বর্ত্তমানের তফাৎটা এত বেশী যে উভয়ের মধ্যে উপমাও কোন মতে চলা সম্ভব নয়। যিনি বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করে প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন ক্ষমার্হ হোলেও তিনি যে সকলের কৃপাপাত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। বর্ত্তমান জীবনের প্রতি উপেক্ষা, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ, প্রাচীন-পন্থীদের একটা মজ্জাগত দোষ।

রেবেকা উত্তর করলো,—বিজ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব অচিন্ত্যবাবুর কোনকালেই নাই। তবে একথা সহস্রবার মেনে নিতে হবে, যে তাঁর অন্তরে কবিতার একটা সজীব উৎস রয়েছে, তাঁর প্রত্যেক কবিতায় সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে এটাও ঠিক, প্রাচীনকালের অনেক বিষয়ই আমরা ততখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে সেগুলির সম্ভ্রম হয়তো অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক বীরত্বের দিক দিয়ে সেগুলির অসামান্যতাও যে অনেকখানি একথা না মেনে পারি না। ধরুন সেকালে রাজকুমারীরা স্বয়ম্বরা হোতেন এবং বীরত্বের একটা কঠিন পণের নিষ্ক্রয় স্বরূপ নিজের স্বামী বরণ করে নিতে গৌরব বোধ করতেন—বীরত্বের এই আদর্শটি তো নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়,—তার মর্য্যাদা এবং গৌরব উভয়ই জাতীয় মহত্বের একটা অক্ষুণ্ণ নিদর্শন—একথা আপনাকেও মান্‌তে হবে।

কুমুদ উত্তর করলো,—দ্বিজেনবাবু কেবল লোকের খুঁৎ ধরেই বেড়ান—কবির খেউড় আজকাল সভ্যসমাজেও অচল। তর্ক করা এক কথা, আর সৌন্দর্য্য উপলব্ধির ক্ষমতা সেটা হোল একেবারে স্বতন্ত্র জিনিষ। অচিন্ত্যবাবুর কবিতায় সৌন্দর্য্য উপলব্ধির দিকটা খুবই পরিস্ফুট সেটা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। এই সাহিত্য এবং কবিতাই হোল একপক্ষে জাতীয় সভ্যতার মাপকাঠি, কেননা এই দু'টির ভিতর দিয়াই তার সৌন্দর্য্য অনুভূতির ভাবধারা প্রকটিত হয়। বিজ্ঞান কেবলমাত্র আমাদের লৌকিক ও পার্থিব সুখ সুবিধার সহচর মাত্র—তাকে সভ্যতার নিখুঁত আদর্শ বলে কিছুতেই ধরা চলে না। কেননা বিজ্ঞানবলে কোন জাতি পৃথিবীর বাকি লোক-গুলিকে দু'দিনের ভিতর সাবাড় করে দিতে পারে, সেটা আমরা সভ্যতার আদর্শ বলে কিছুতেই ধরে নিবনা।

"যস্মিন পক্ষে জনার্দ্দন"—এই নীতিশাস্ত্র বলে স্বয়ং রেবেকা যে পক্ষে ওকালতী করতে সুরু করেছে জয়লাভটা সে পক্ষেই যে অবশ্যম্ভাবী তা বলাই বাহুল্য। কাজেই অচিন্ত্যবাবুর কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে অবশিষ্ট সকলের মুখেই যে উচ্চ প্রশংসা ধ্বনিত হবে তার আর বিচিত্র কি!

পরিশিষ্ট আকারে রেবেকা বল্ল,—বাস্তবিক অচিন্ত্যবাবুর কবিতায় সত্যিকার দরদ বলে একটা জিনিষ আছে যা সচরাচর অন্য কবিতায় দুর্লভ। কবিতার প্রাণবস্তুটি ষোল আনাই এতে বজায় আছে। বিশেষতঃ তাঁর মানসী কবিতাটি একটি উচ্চ অঙ্গের জিনিষ— ভাব ও সৌন্দর্য্যে প্রায় রবিবাবুর উর্ব্বশীরই কাছাকাছি।

এই মানসী কবিতার অন্তঃস্থলে যে একটি বাস্তব রূপের ছবি শব্দালঙ্কারে মুদ্রিত ছিল, কবিতার হেঁয়ালীতে তা' কতকটা অস্পষ্ট হোলেও উপস্থিত বন্ধুবর্গ সকলেই তা' সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিল'—তা' একমাত্র রেবেকার ব্যাখ্যান।

উপস্থিত সকলেরই অচিন্ত্যবাবুর কবিতা শোন্‌বার জন্য যথেষ্ট ব্যগ্রতা দেখা দিল।

কুমুদ বলে উঠলো,—অচিন্ত্যবাবু, দয়া করে একবার আপনার কবিতাটি আমাদের শোনাবেন কি ?

সকলেই সমস্বরে সায় দিয়ে বল্ল,—বেশ কথা। এমন কবিতা শোনাও কতকটা ভাগ্য বটে।

অচিন্ত্য এম্নি সময় রেবেকার ইঙ্গিত পেয়ে কবিতার খাতাখানি আস্তে আস্তে পকেট থেকে বের করলো, তারপর স্বরটি যথাসাধ্য মোলায়েম করে একটি কবিতা অনর্গল পড়ে যেতে লাগলো।

কবিতা পড়া শেষ হ'তেই অচিন্ত্যের প্রশংসায় ঘর ভরে উঠলো।

কুমুদ ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—এমন কবিতা আজকালকার দিনে বড় একটা পাওয়া যায় না। অচিন্ত্যবাবু, আপনি এটা কোন মাসিক কি সাপ্তাহিক কাগজে বের করে ফেলুন। আজকাল যত কিছু কবিতা মাসিকে বের হয় তার অধিকাংশই 'রাবিশ'।

রাখাল এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার বলে উঠলো,—সেই ভয়েই তিনি কবিতা আজকাল কোন মাসিকে পাঠান না, কেননা বের হোলেই সেগুলি; 'রাবিশ' বলে গণ্য হবে

কুমুদ চটে জবাব দিল,—আমি কি অচিন্ত্যবাবুর কবিতা সম্বন্ধে সেকথা বলেছি। আজকাল ভাল কবিতা বড় মেলে না। সেই জন্যই তো বিশেষ করে ওর কবিতা ছেপে বের করা উচিত।

রেবেকা স্মিতহাস্যে অচিন্ত্যের দিকে তাকিয়ে বল্ল,—আমিও সেকথা তাঁকে ঢের বলেছি। এই কবিতাগুলি ছেপে বের হওয়াই উচিত।

অচিন্ত্য বিনয় প্রকাশ করে বল্ল,—না, এ ছেপে আর কি হবে। আজকাল তেমন ভাল পত্রিকাও বড় একটা নেই,—তা' হ'লে বরং দিতুম।

ইতিপূর্ব্বে পাঁচ সাতটি কাগজে বার বার কবিতা পাঠিয়েও যখন সেগুলি মুদ্রিত হোলনা, তখন সম্পাদক শ্রেণীর প্রতি অচিন্ত্যের একটা বিশেষ ক্রোধ ছিল।

এইবার অনিমেষ বল্ল,—খবরের কাগজে কবিতা ছাপিয়ে লোকের কাছে নাম জাহির করবার ইচ্ছে অচিন্ত্য বাবুর মোটেই নেই। বাস্তবিক আজকালকার দিনে এমন নিরভিমান লোক কচিৎ মিলে।

কুমুদ বল্ল,—নিজের জয় ঢাক ঘাড়ে করে বেড়ানোটা আজকালকার সাহিত্যিক মহলে একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাই। তা' ব্যতীত সহযোগী সাহিত্যিকের দল 'পারস্পরিক সহযোগ সমিতির মারফতে নিজেদের প্রশংসা দেশময় ছড়িয়ে দিতে নানারূপ উদ্যোগ করছেন। অচিন্ত্য বাবুর সে সব আদবেই নেই। এমন অমায়িক লোক আজকাল লাখকরা একজন মিলে না।

অচিন্ত্যের প্রশংসায় ঘর ভরে উঠলো। এই চায়ের মজলিসে অচিন্ত্য বাবুর সহসা এই প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে অনেকেই মনে মনে ভাব্‌লো আজ যদি হঠাৎ কোন কারণে কবি হ'য়ে উঠবার সৌভাগ্য কারু হয়, তবে সে রাতারাতি এমন একটি আশ্চর্য্য কবিতা রচনা করে ফেলে যাতে অচিন্ত্য বাবুর কবিতার প্রত্যেক আঁখরটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা ঘটে।

প্রত্যেকের প্রদত্ত স্ব স্ব মূল্যবান উপহার দ্রব্যগুলির চেয়ে অচিন্ত্য বাবুর কবিতার প্রতিপত্তি রেবেকার নিকট অধিকতর বিবেচিত হওয়ায় সকলেই মনে মনে ভারি ক্ষুণ্ণ হোল।

বিশেষতঃ দ্বিজেন ডাক্তারের প্রদত্ত মূল্যবান হীরক ব্রোচটির ঔজ্জ্বল্য যে সামান্য একটি কবিতার নিকট এত সহজে হ্রাস প্রাপ্ত হবে, তা' যে কোন উপহারদাতার পক্ষেই অসহ্য। এই মর্ম্মান্তিক অভদ্রতাটি যে কবিতা লেখকের নির্লজ্জ জিগীষারই পরিচয় মাত্র এ বিষয়েও ডাক্তারের কণামাত্র সন্দেহ ছিল না।

* * *

এই চায়ের মজলিস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে সকলেই স্ব স্ব লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের উপায় চিন্তা করতে লাগলো। কেন না, রেবেকার এই বন্ধুবান্ধবের ভিতর প্রত্যেকেই তাঁর প্রণয়

ব্যাপারটীকে পরিণয়ে পাবিয়ে তুল্‌বার চেষ্টায় বহুদিন থেকে উমেদারী কচ্ছিল। হঠাৎ এই কবিতার বাজ আকস্মিকভাবে এই ঘটনার মাঝখানে নিপতিত হওয়ায় সকলেই অতিমাত্রায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

খ

সে দিনের একটা দুর্ঘটনায় কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় অচিন্ত্যের প্রতিপত্তি ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত হ'তে লাগলো। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি এইরূপ।

সেদিন বালিগঞ্জের পার্কের ধার দিয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী বেশ বেগে ছুটে চলছিল; কোচবাক্সে বসে গাড়োয়ান যেন একটু অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত কচ্ছিল। হঠাৎ গাড়ীর ওয়েলার ঘোড়া কি একটা বিশেষ কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে এমন বেগে ছুটিতে সুরু করলো যেনএক দুর্ঘটনা ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

গাড়োয়ান চাবুকটা শূন্যে তুলে ধরে হাত-পা ছুঁড়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার সুরু করলো। গাড়ীর ভিতর একটি তরুণী প্রায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হ'য়ে সাহায্যের জন্য বারবার বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত কচ্ছিল। হঠাৎ পার্কের পাশের এক গলি থেকে দ্বিজেন বাবু ছুটে বের হ'য়ে এলেন এবং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলতেই ঘোড়া বেচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে সুরু করলো।

ঘোড়ার লাগামটা সহিসের হাতে এগিয়ে দিতেই সে ধরে একটু মুচ্‌কি হেসে নিল। গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই সেই তরুণী দ্বিজেনবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

দ্বিজেনবাবু ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো,—আপনার লাগেনি তো?

এই আকস্মিক বিপদে রেবেকার মুখ চোখ শাদা হ'য়ে গেছিল; কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে তাঁর কোন কথাই ফুটে বেরুলো না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার একটা স্নিগ্ধ আভা চোখ দুটিতে জড়িয়ে ছিল।

রেবেকার এই অভিভূত অবস্থা দেখে দ্বিজেন বাবুর মনে কি যেন একটা ধাক্কা এসে লাগ্‌লো যদিও বেচারা ঘোড়া বেশ নিস্তব্ধ ভাবেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু রেবেকা কিছুতেই পুনরায় সেই গাড়ীতে বাড়ী ফিরে যেতে রাজী হোল না।

রেবেকা দ্বিজেন বাবুর কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটেই বাড়ীর দিকে রওনা হোল।

সেই সুকোমল স্পর্শে দ্বিজেন বাবুর মনের নির্জ্জীব ভাবটি মুহূর্ত্তেই বিদূরিত হোল।

দ্বিজেন বাবুর এই বীরত্বের খ্যাতি রেবেকার মুখে মুখে তার আত্মীয় ও পরিচিতবর্গের মধ্যে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে সাধারণের নিকটও তিনি একজন খ্যাতিমান সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি বলেই পরিচিত হোলেন। তখন অনেকেই মনে মনে ভাবতে লাগলো, দৈবাৎ সেদিন যদি সেখানে উপস্থিত থাক্‌বার সৌভাগ্য তাদের ঘটতো তবে নিশ্চয়ই দ্বিজেন বাবুর চেয়ে অধিকতর বীরত্ব সহকারে তিনি এই সৌভাগ্যটুকু অর্জ্জনে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হতেন না।

বাস্তবিক এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে কুমুদের মনে ভগবানের পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে কোনই সন্দেহ রইলো না। এ জন্য সে মনে মনে যতই দৈন্যতা উপলব্ধি করতে লাগলো ততই এ বিষয়টা তার মনের ভিতর বেশী তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। গভীর অন্ধকারে একটী আলোক রশ্মি দেখ্‌তে পেলে যেমন লোকের মনে আনন্দ জন্মে, কুমুদের মুখখানি তেমনি হঠাৎ সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তখনি সে একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট পকেটে গুঁজে রহিম মিঞার আড্ডার খোঁজে চল্ল।

* * *

কয়েকদিন পরে আর একটি ঘটনায় ভগবান যেন কুমুদের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ষ্টোর রোডের ধার দিয়ে এসে মাঠ পার হয়ে রেবেকা কোন আত্মীয়ার বাড়ী যাচ্ছিল; তাঁর সঙ্গের চাকরটির হাতে কিছু সামান্য জিনিসপত্র ছিল। যখন তাঁরা প্রায় রাস্তার কাছাকাছি এসেচেন, তখন পাশের গলি থেকে ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের ৫।৬ জন লোক হঠাৎ ছুটে এসে চাকরের হাতের জিনিষ পত্রগুলি ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। ধাক্কা খেয়ে খানায় পড়ে গিয়ে উড়ে চাকরটির দৌড়াবার সামর্থ্য যদিও লোপ পেয়েছিল তবু বিপদের সময় প্রাচীন সংস্কার বশে পায়ের বদলে হাত দুটির উপর নির্ভর করেই এই বিপদের চতুঃসীমানা থেকে সে দূরে সরে পড়লো। তখন লোকগুলি চারিদিক থেকে রেবেকাকে আক্রমণের উদ্যোগ করলো। রেবেকা এই ব্যাপারে কতকটা হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিল। কাজেই গুণ্ডারা যখন তাঁর গায়ের মূল্যবান অলঙ্কারগুলি ছিনিয়ে নেবার উদ্যোগ করলো তখন সে সহজভাবেই সেগুলি তাদের হাতে সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলো।

কুমুদ হঠাৎ সেখানে দৌড়িয়ে এসে সেই ৫।৭ জন গুণ্ডার সঙ্গে একাকী ভীষণ মুষ্টি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোল, গুণ্ডাদের আক্রমণ বার বার প্রতিরোধ করে কুমুদ যখন প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় স্বীয়

অসামান্য শক্তির পরিচয় দিতেছিল তখন রেবেকা রাস্তার একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই অসমান দ্বন্দ্বযুদ্ধের জয়পরাজয়টা নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছিল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিপক্ষীয়েরা সংখ্যায় ঢের বেশী হোলেও কুমুদের অপর্য্যাপ্ত মুষ্টিবর্ষণের কৌশলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গুণ্ডারা গুরুতরভাবে জখম হ'য়ে পলায়ন করলো।

কুমুদ যখন সত্যসত্যই বিজয়ী হ'য়ে রেবেকার কাছে খবর জিজ্ঞাসা করতে এলো তখন এই অসমসাহসী উদ্ধারকর্ত্তাকে রেবেকা কৃতজ্ঞতার আবেগে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—উঃ! আপনার জন্যই আজ বেঁচে গেলুম। আপনার কোথাও লাগেনি তো?

কুমুদ নিতান্ত উপেক্ষার সুরে বল্লে,—ওরকম কত হ'য়েছে। আপনার কোন অনিষ্ট না হ'লেই হোল। যে নিজের বিপদ এমনভাবে উপেক্ষা কোরে পরের জন্য এমন অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করে, সেই বীরত্বের সঙ্গে যে কতখানি মহত্ব জড়িত থাকে তা' অনুমান করা কিছুমাত্র কষ্টকর নয়। কাজেই কুমুদের বন্ধুত্বটা রেবেকার অনেকখানি গর্ব্বের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো।

কুমুদের এই বীরত্বের ইতিহাসটা এমনভাবে লোকের কাছে ছড়িয়ে পড়লো যে তাঁর এই অসামান্য বীরত্বের বিষয়টা কিছুদিন পর্য্যন্ত লোকের নিকট একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে রইলো।

তখন সকলেই একবাক্যে বলতে লাগলো, পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার এমন কিইবা বাহাদুরী। বরং ১৫।২০ জন গুণ্ডার সঙ্গে খালিহাতে সাম্‌নাসাম্‌নি মুষ্টিযুদ্ধে হারিয়ে দেওয়াটা একটা সত্যিকার বীরত্ব বলা যায়। অবশ্য গুণ্ডাদের সংখ্যাটাও লোকের মুখে ক্রমে চতুর্গুণ হয়ে
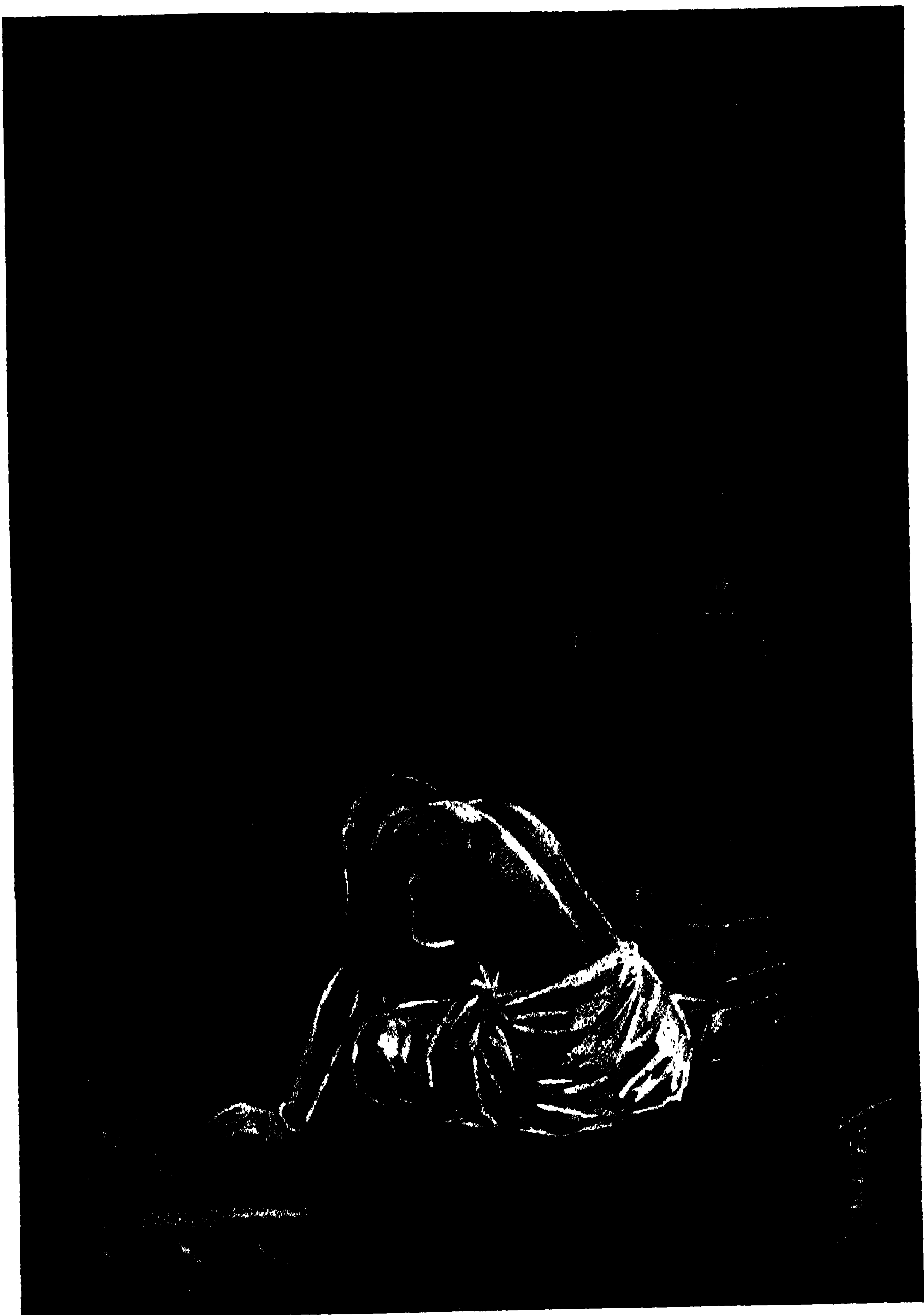
শেষ প্রশ্ন ?

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

দাঁড়িয়েছিল। এরূপ বীরত্বের সম্মান প্রদর্শনটাও প্রত্যেকেরই একটা কর্ত্তব্য, সেটা মনে করেই রেবেকা একাই তা পূরণ করতে চেষ্টা কচ্ছিল; ফলে স্বয়ং রেবেকা প্রত্যহ কুমুদকে নিমন্ত্রণ আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করতে লাগলো।

চায়ের মজলিসে কুমুদের গৌরব পূর্ব্বের চেয়ে যে অনেকখানি বেড়ে গেল, তা' বলাই বাহুল্য। এমন কি রেবেকার আত্মীয়পরিজনের মধ্যেও কুমুদের নিমন্ত্রণলাভটা সুলভ হ'য়ে উঠলো।

এই গৌরব অর্জ্জনে কুমুদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণটাও নিতান্ত অল্প ছিল না।

প

এই সকল ব্যাপারে অচিন্ত্য কিম্বা দ্বিজেনবাবুর পূর্ব্ব গৌরব যে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে শেষটায় মাটিচাপা গোছের হ'য়ে রইলো। এই বিষয়গুলি যেন আর কারো নজরেই পড়ে না—এম্নি অবস্থায় দাঁড়ালো। তখন উভয়েই নিজেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার মানসে নূতন উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হ'লো।

রেবেকা উপর্য্যুপরি আকস্মিক এইরূপ দু'টি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে একটু বিব্রত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল। বিপদসঙ্কুল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রেমিকার উদ্ধার লাভের রোমাঞ্চকর কাহিনী সে এতকাল নানা উপন্যাসে পাঠ করে এসেছে; এবং উক্ত ঘটনাসমূহে প্রেমের যথার্থতা এমন সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, কল্পনায় নিজেকে উক্ত ঘটনাসমূহের নায়িকা মনে করেও সে গর্ব্ব অনুভব করেছে; কিন্তু যখন নিজের জীবনে এরূপ ঘটনার পরীক্ষা চল্‌তে লাগলো তখন, পূর্ব্বের ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন সরল জীবনযাত্রাই তার নিকট অধিক বাঞ্ছনীয় মনে হোল।

ইতিমধ্যে আর একটি দুর্ঘটনায় রেবেকার জীবন এমন বিপদাপন্ন হোল যে খবরের কাগজের সম্পাদকবর্গ এরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনার যথাযথ খবর প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো। যথাসময়ে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত খবরের কাগজে তার বিবরণ প্রকাশিত হোল।

অচিন্ত্যবাবুর অদ্ভুত বীরত্ব

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে মহিলার উদ্ধার

সেদিন শেষরাত্রে—নম্বর বাড়ীতে ভীষণভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বাড়ীর ভিতর সকলের ভীষণ চীৎকার ও আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই ভীষণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর কেউ ভয়ে প্রবেশ করতে সাহসী হয় নাই। একমাত্র অচিন্ত্যবাবু অসম সাহসে স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ করে সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে মহিলাদিগকে উদ্ধার করে দেশবাসী মাত্রেরই ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। অচিন্ত্যবাবুর এই পরোপকার ব্রত ও সাহসের জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অচিন্ত্যবাবুর এই খ্যাতি খবরের কাগজের মারফৎ অনেকদূর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অসম-সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ নানাভাবে কৃতজ্ঞতা পত্র নানা স্থান থেকে আস্‌তে সুরু করলো। ইতিমধ্যে স্বদেশহিতৈষী কবি বলেও তাঁর নাম দেশব্যাপী হ'য়ে পড়লো।

এমন কি স্থানীয় স্কুলের ছাত্রবৃন্দ একদিন মিটিং করে অচিন্ত্যবাবুর গলায় একটি বিচিত্র ফুলের মালা পড়িয়ে এবং সেই প্রসঙ্গে অনেক গুণগান করে একটা হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়েছিল।

এ সমস্ত খবর রেবেকা যে না রাখতো এমন নয়, রেবেকার কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ দেশবাসী যে অচিন্ত্যবাবুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন কচ্ছে তাতে রেবেকা নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করলো।

সেদিন 'মিটিং' ফেরৎ কালে অচিন্ত্য সেই ফুলের মালাটি রেবেকাকে উপহার দিয়ে বল্ল,—দেখুন না দেশশুদ্ধ লোক আমায় সং সাজিয়ে জ্বালাতন করে মারলে।

রেবেকা কৃতজ্ঞতা সহকারে বল্লে,—এ আপনার ভারি অন্যায় অচিন্ত্যবাবু!—একি সং হোল? আপনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, দেশবাসী তার কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছে। আপনি যে দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন, সেটাই আমি নিজের গৌরবের বিষয় বলে মনে করি।

অচিন্ত্য ঈষৎ হাসির রেখা মুখে এনে বল্লে,—দেখুন, এ সব ভক্তিশ্রদ্ধা আমি একটুও পছন্দ করি না। কেবল যাকে হৃদয়ের একান্ত আসনে বসিয়েছি, তার একটুখানি স্নেহ, লক্ষগুণ অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করি।

রেবেকা উত্তর করলো,—তা' বলে দেশ যা কচ্ছে, তাতো আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না,—পারেন?

অচিন্ত্য উত্তর করলো,—তাতো পারিই না—সেজন্যই তো এই সব সভাসমিতিতে যেতে হয়। দেখুন না, এক একদিন পাঁচ সাত জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পাই—কাকেই অসন্তুষ্ট করি, এই সব ফ্যাঁসাদে পড়তে হয়। অচিন্ত্য সেদিন বিজয়গর্ব্বে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে ভাবলো,—এইবার বিবাহটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভাল।

ঘ

অচিন্ত্য বাবুর এই দেশব্যাপী গৌরবে রেবেকার বন্ধুবর্গ সকলেই উপস্থিত ক্ষেত্রে বেশ খুসীই ছিল মনে হয়। কিন্তু রেবেকার সম্পর্কে নানারূপ কাণাঘুসা একটু ছড়িয়ে পড়তেই সকলে বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে একদিন শিবপুরের বাগানে চড়িভাতি খাবার উদ্যোগ হোল। সকলেই এই নিমন্ত্রণে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। রেবেকা মাত্র দু'একটি লোক নিয়ে নৌকায় গিয়ে সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হবে—অন্যান্য জিনিসপত্র পূর্ব্বেই সেখানে পাঠান হবে—এইরূপ

বন্দোবস্ত ঠিক হোল। একখানা নৌকাও ভাড়া হোল। পরদিন দুপুরে রেবেকার রওনা হবার কথা।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা কুমুদ সেই নৌকার মাঝির কাছে উপস্থিত হ'য়ে নৌকা ডুবিয়ে দেবার প্রস্তাব উথাপন করতেই সে ভয়ে আঁৎকে উঠে বল্লে,—না বাবু, সে আমি কিছুতেই পারবো না।

অনেক বলে কয়ে ব্যাপারটা যখন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া গেল নৌকা ডুবিয়ে লোকগুলিকে প্রাণে মারবার ইচ্ছা তার মোটেই নাই, কেবলমাত্র নৌকায় যে মেয়েটি থাকবে কেবলমাত্র তাঁকে উদ্ধার করবার বাহাদুরীটা নেবার জন্য প্রথমেই সে ৫০৲ টাকা পুরস্কার নিজমুখে কবুল করলো।

অনেক সাধ্য সাধনার পর ১০০৲ টাকা রফায় মাঝি এই কার্য্যটি সম্পন্ন করতে রাজী হোল এবং এ বিষযে সে কিরূপ হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজটি সম্পন্ন করবে সে বিষয়ে একটা প্রস্তাবনাও তখুনি করে দেখালো।

কুমুদের উঠে আসবার একটু পরেই দ্বিজেন ডাক্তার সেখানে উপস্থিত হ'য়ে নৌকার মাঝির নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উথাপন করতেই সে দু'এক কথায় রাজী হোল; এবারও সে ১০০৲ টাকায়ই চুক্তি করে অর্দ্ধেক টাকাটা পূর্ব্বের মত টেঁকে গুজলো। মাঝি মনে মনে ভাবলো, না জানি আজ কার মুখ দেখে ভোরে উঠেছি, প্রথমেই ১০০ টাকা তার বরাতে এল; সে উভয়ের প্রতিশ্রুতিই ঠিক মত সম্পন্ন করবে—বাকি ফলাফল যা ঘটে, সেজন্য সে মোটেই দায়ী নয়।

পরদিন রেবেকা নৌকা করে বাগানে চড়ি-ভাতির নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য রওনা হোল।

বাগানের প্রায় কাছাকাছি এসে বাঁকের মোড়ে নৌকা খানির তলা ফুটো হয়ে সবেগে জল ঢুকতে লাগলো। মাঝি চীৎকার করে জলে লাফিয়ে পড়তেই নৌকা খানি হঠাৎ একদিকে কাৎ হ'য়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সকল আরোহীরাই জলে পড়ে হাবুডাবু খেতে লাগলো।

বাঁকের মুখের দুইদিক থেকে কুমুদ ও দ্বিজেনবাবু হঠাৎ ছুটে এসে জলে ঝাপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে রেবেকার উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হলো। দু'জনেই রেবেকার দুই হাত ধরে উদ্ধারের জন্য পরস্পরে টানাটানি করতে লাগলো।

দ্বিজেনবাবু ক্রোধকম্পিত স্বরে বল্লে,—কুমুদ সরে যাও বলছি।

কুমুদও ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিল,—আপনি হাত ছেড়ে দিন।

দ্বিজেনবাবু ঘুসি বাগিয়ে বল্লে,—এখনো বলছি সরে পড়। রেবেকাকে আমিই উদ্ধার করবো।

কুমুদ উত্তর করলো,—চুপ রও বেয়াদব, ভাল চাও তো সরে পড়—আমি রেবেকাকে উদ্ধার করবো।

রেবেকা দুজনের টানাটানিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে,—ঝগড়া পরে করবেন, আগে আমায় বাঁচান।

ইতিমধ্যে দ্বিজেনবাবু রেবেকার হাত ছেড়ে দিয়ে প্রতিপক্ষ কুমুদের নাকে জোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বল্লে,—"রাস্কেল একটু আক্কেল নেই তোমার।" ঘুসির চোটটা কুমুদের নাকের উপর বিষম জোরেই লেগেছিল কাজেই সেই ধাক্কা সামলাতে রেবেকার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের নাক জোরে চেপে ধরতে হোল। ইতিমধ্যে দ্বিজেনবাবু রেবেকার হাত ধরে পারের দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। ধাক্কা সামলে নিয়ে কুমুদ জোরে সাঁতরিয়ে এসে দ্বিজেনবাবুর মাথায় জোরে বিরাশীসিক্কা ওজনের এক ঘুসি বসিয়ে দিতেই জলের ভিতর উভয়পক্ষে জল তোলপাড় করে প্রবল মারামারি সূত্রপাত হোল। দ্বিজেনবাবু রেবেকার হাত ছেড়ে দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুমুদের সম্মুখীন হোল। জলের ভিতর পরস্পরের এই লড়ায়ের দৃশ্য দেখে পাড়ের উপর চারিদিক হতে লোক জড় হোল। মনে হোল জলের ভিতর থেকে দুটি রাঘব বোয়াল যেন জল তোলপাড় করে যুদ্ধ কচ্ছে।

দু'টি স্থলচর জীব যখন জলের ভিতর এইরূপ লড়াইয়ে ব্যস্ত তখন পাড়ের লোকজন একটী মেয়েকে জলে ডুবতে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে এল। রেবেকার সঙ্গীরা পূর্ব্বেই জল থেকে তীরে উঠে পড়েছিল।

রেবেকার পেটে অতি সামান্যই জল ঢুকেছিল, কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হেলো।

নদীর পাড়ের লোকগুলি তখন প্রতিপক্ষীয় দুই মুষ্টিযোদ্ধাকে উৎসাহিত করতে বারবার বাহবা দিচ্ছিল এবং জলের ভিতর স্থলচর জীবেদের এবম্বিধ পরাক্রম দর্শনে দর্শকবর্গ হাততালি দিতে লাগল।

প্রতিপক্ষীয়ের গুরুতর আক্রমণ একটু নিবৃত্ত হতেই উভয়ে দেখলো রেবেকা জল থেকে তীরে উঠে পড়েছে, তখন দু'জনেই নিতান্ত ভিজে বেড়ালের মত গা ঢাকা দিয়ে সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে জল থেকে উঠে পড়লো এবং রেবেকা উভয়ের হাত থেকে চিরকালের জন্য ফস্কে গেছে মনে করে দু'জনেই বেশ ভাল ছেলের মত পরস্পরের হাত ধরে দুঃখ প্রকাশ করলো এবং একখানি নৌকো ভাড়া করে দু'জনে এক সঙ্গেই বাড়ী ফিরে এল।

*　　　*　　　*

রেবেকা নিজের ও আত্মীয় পরিজনের জীবন নিরাপদ করবার জন্য এই অনুরাগ পর্ব্বের পালা অল্প দিনের মধ্যেই সাঙ্গ করে আর একজনকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল্ল।

গুরুদেব

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

তিনি ছিলেন সাউথ সেক্‌সানের গুরুদেব। দেখিতাম, ছেলে, যুবা, বুড়ো সকলেই তাঁহাকে গুরুদেব বলে। বাপ বলে গুরুদেব, ছেলে বলে গুরুদেব। বড় ভায়ের গুরুদেব; আবার ছোট ভায়েরও গুরুদেব।

১০-৮ মিনিটে যে ট্রেণটি আমাদের ষ্টেশন ছাড়ে সেই ট্রেণে গুরুদেব আসিতেন। শুনিয়াছি এই রকম বহুকাল আসিতেছেন। কেহ বলে বিশ বছর, কেহ বলে পঁচিশ। কাহারও বিশ্বাস, ঠিক অতোদিন না হইলেও, অনেক দিন বটে। আবার অনেকে এমন কথাও বলিয়া থাকেন যে যতদিন সাউথ-সেকসান্‌টি খোলা হইয়াছে, গুরুদেব ঐ গাড়ীতে, ঐ পোষাকে, ঐ রূপে, ঐ অঙ্গ-সজ্জা লইয়া 'আসিয়া' আসিতেছেন। তা যদি হয়—তবে ত্রিশবৎসরের উপর বটে।

গুরুদেব সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার। তাঁহার বেশভূষাটি যেমন বিচিত্র, রূপটি তেমনই অদ্ভুত। তিনি গায়ে গরদের পাঞ্জাবী পরেন, তার উপরে নামাবলী চাপান, পায়ে চক্‌চকে ব্রাউন সু; কপালটি তিলকছাপের প্রাচুর্য্যে স্বাভাবিক বর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। মস্তকের সুবিস্তীর্ণ টাকে চন্দন প্ল্যাষ্টার-সংযুক্ত কয়েকটি তুলসীপত্র রৌদ্র ও বায়ুর উৎপাতে খড়মড়ে হইয়া গেলেও স্থানচ্যুত হইত না। অনেকেরই নিকট ইহা আশ্চর্য্য ঠেকিত। গুরুদেব বলিতেন—বাপুহে, স্বস্থানচ্যুত হইতে কে চাহে বল! সকলেই স্বীকার করিত—তা সত্যি! কোন কোন দিন গুরুদেবের অঙ্গরাগের শোভা অতুলন হইয়া উঠিত। সে দিনগুলি, গুরুদেবের দিকে চাহিয়া গুরুদেবের অতিবড় ভক্তেরাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। জনান্তিকে কহিতেন—আজ গুরুদেবকে কি রকম দেখাচ্ছে জান? আহা, ঠিক যেন তুলসীবনের চিতে বাঘ!

ইহাতে সকলেরই ওষ্ঠে চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিত। গুরুদেব বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন—মা! মা!

দেখিলাম, সকলেই গুরুদেব বলে। আমিও নিজেকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিলাম, না। একদিন ঠিক পাশটীতে বসিয়া ডাকিলাম—গুরুদেব!

গুরুদেব একেবারে আমার মুখে, চোখে, কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া সাদরে কহিলেন—বেশ, বাবা, বেশ! বলিয়াই দক্ষিণ করতলটি লইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দুই তিন মিনিট এপিঠ ওপিঠ এগিঁট ওগিঁট পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—মা ভাল করবেন, মা ভাল করবেন।

আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। সত্য কথাটা এই যে হাত দেখার মধ্যে কতখানি বিজ্ঞান ও কতখানি বুজরুকি বর্তমান তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই—আমার বুদ্ধিতে।

সহযাত্রিরা জিজ্ঞাসিলেন—কি দেখলেন গুরুদেব? ভাল না মন্দ?

গুরুদেব কথা বলিলেন না।

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরুদেব যে উত্তর দিলেন, তাহাতে কাহারও কৌতূহল নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। আমারও মনটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

গুরুদেব বলিলেন—মা ভাল করবেন, মা ভাল করবেন!

সহযাত্রিরা হয় ত ভাবিলেন, গুরুদেব কর-রেখায় কিছু অমঙ্গলজনক ব্যাপার দেখিয়াছেন, তাই প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, একবার আমার মুখের পানে ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অন্যমনস্ক হইলেন।

আমি নাকি এই জ্যোতিষ-বস্তুটির উপর একেবারেই আস্থাবান ছিলাম না, গুরুদেবকে অনিচ্ছুক দেখিয়াও জিদ করিয়া বলিলাম—কি দেখলেন গুরুদেব?

মা……

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—মা ভাল ত করবেনই। কিন্তু কি দেখ্‌লেন?

দেখলুম, ভাল।

ওরকম 'ভাল' আমি শুনতে চাই নে। কি রকম ভাল, তাই বলুন।

গুরুদেব বলিলেন—খুব ভাল। কিন্তু তিন বছর পরে একটা বিপদ আছে।

যত লোকে আমার এবং দুনিয়ার আর সকলের হাত দেখিয়াছে ঐ রকম বিপদের বার্তা অতি অবশ্যই দিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা পরীক্ষিত সত্য। একটু হাসিয়া হাতটী সরাইয়া লইয়া, সিগারেট ধরাইলাম। গুরুদেবের সামনে সিগারেট খাইতে কাহারও বাধা ছিল না।

জনৈক সহযাত্রী সহাস্যে জিজ্ঞাসিলেন—গুরুদেব ফাঁড়া কাটবে কি করে?

এরূপ প্রশ্নের যে-উত্তর সর্বদা ও সর্বথা আমিও শুনিয়াছি, অপর সকলেও শুনিয়াছেন, গুরুদেব কিন্তু সে উত্তর দিলেন না। তিনি বলিলেন—মা কাটিয়ে দেবেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—মা'কে ডেকো, মা বিপদে উদ্ধার করবেন।

সহযাত্রিদের মনের ভাব কি হইল বলিতে পারি না, আমার মন কিন্তু শ্রদ্ধা সঞ্চয় না করিয়া পারিল না।

আমার একজন সহযাত্রী বন্ধু আমাকে বলিলেন—কৈ হে মৃগেন, গুরুদক্ষিণা দিলে না যে বড় !

আমি সপ্রতিভভাবে ব্যাগ খুলিয়া একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া গুরুদেবের জুতার কাছে রাখিতে গেলাম, গুরুদেব আমার বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে বলিলেন—মা রক্ষে করবেন, মা রক্ষে করবেন ।

তারপর নোটখানি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।

আমি বলিলাম—এ যে গুরুদক্ষিণা।

গুরুদেব বলিলেন—দশটাকা খরচ করলে গায়ে লাগবে না ?

মনে হইল, তা লাগিবে বোধ হয়। আবার ভাবলাম, কতদিকে কতটাকা ত খরচ করি—কি আর গায়ে লাগিবে ? বলিলাম—না।

তবুও লইলেন না, গুরুদেব বলিলেন নোট্ থাক, মা'র নাম করে একটি টাকা দাও। মা ভাল করবেন।

আমি আরও একবার অনুরোধ করিলাম। গুরুদেব বলিলেন—একটি টাকা দাও, তা'তেই কাল মা'র ভোগ হ'বে

অগত্যা একটি টাকাই দিলাম। ট্রেণ শিয়ালদহে পৌঁছাইল। সকলেই নামিয়া গেল। নলিন আমার সঙ্গে এক আফিসে কার্য্য করে, আমাদের আফিসে হাজিরা কেতাবে লাল কসির কড়াকড়ি নাই, তাই আমরা দুইজনে ধীরে সুস্থে গাড়ীর পাখা বন্ধ করিয়া, অবশেষে নামিলাম।

নলিন বলিল, একটা টাকাই জলে গেল আজ !

আমি সাড়া দিলাম না। সে আবার বলিল, একটার উপর দিয়ে গেছে সেই ঢের ! তুমি ত একেবারে দশটাকাই খয়রাত করে ফেলছিলে হে ! খুব বেঁচে গেছে। যদিও না নেবার কারণটা বুঝতে পারা গেল না। পরে আরও ভাল করে গাঁথবে বলে বোধ করি চার খাইয়ে রাখলে !

আমি বলিলাম, না হে না গাঁথা ফাতা নয়…

নলিন একটু যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল—তুমি ত সব জান ! বেটা মস্ত humbug হামব্যগ ! ঐ করে লক্ষ লক্ষ টাকা করেছে !

বল কি !

বলিই ত! কল্যাণপুরে তোমার গুরুদেবের আশ্রমটি দেখে এসো না, বুঝতে পারবে

দেশের এমন বড় লোক নেই, যার মাথায় না হাত বুলিয়ে বেড়ান। এই যে রোজ অফিসারের মত ভকণাদি করে ঠিক দশটায় গাড়ীতে বের হ'ন, কোথায় যান্ বলে মনে হয় ?

কোথায় ?

বড় লোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে পদধূলি বিতরণ, কর্ত্তারা আফিস আদালতে, অতএব গৃহিণী ঠাকুরাণীগণকে আশীর্ব্বাদ করণ ও কিঞ্চিৎ ট্যাকস্থ করতঃ প্রত্যাগমনং ! এই ক'রে···

লোকে রোজ রোজ দেয় ?

এক লোকে দেয় না অবশ্যি কিন্তু এত বড় কলকাতায় বড় লোকের অভাবও ত নেই। আজ আশ্রম করব, কাল আশ্রমে অনাথ-সেবা হবে, পরশু অনাথদের বস্ত্রদান করতে হ'বে—বায়নাক্কা লেগেই আছে।

আশ্রমটি কি ?

নলিন একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, আশ্রম তা'তে সন্দেহ নেই। তবে আশ্রমে থাকতে নিজে, স্ত্রী, পুত্র কন্যা পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদি ছাড়া আর কেউ না।

অনাথ-টনাথ ?

নিজে অনাথ, স্ত্রী অনাথিনী আর সকলে টনাথ। আগে শুনিছি পোষ্টাফিসে কর্ম্ম করতেন। কি একটা সৎকার্য্য করে কিছুদিন রাজ-অতিথিও হয়েছিলেন। বোধ হয় বছর তিনেক সরকারের অন্ন-সত্রে বাসও হয়েছিল। তারপর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং 'মা' 'ভাল করবেন।'

আমি নীরব রহিলাম। নলিন বলিতে লাগিল—বাঙলাদেশে যদি কোন ব্যবসা নির্বিঘ্নে, নিরাপদে ও প্রচুর লাভের সঙ্গে চলে, তবে ঐ ব্যবসা !

কোন্ ব্যবসা ?

ঐ—মা ভাল করবেন ব'লে মাথায় পা তুলে আশীর্বাদ ! আপনাদের ঐ গুরুদেবটিকে নিজের স্বার্থ ছাড়া একটি পা'ও চলতে দেখবেন না। যাক্, বেশী কথা বলবার দরকার নেই, শিষ্য যখন হয়েছে, তখন একদিন না একদিন মালখানিকে নিজেই চিনতে পারবে, আমাকে আর কষ্ট করতে হ'বে না।

লোকটির সঙ্গে আমার বেশীদিনের আলাপ নয়। তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার সুযোগ সুবিধা কিছুই হয় নাই। তবু লোকটির প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা, এতখানি প্রীতি যে আমার নিজেরই জন্মিয়া গিয়াছিল তাহা আমিই জানিতে পারি নাই। নলিনের কথাগুলি আমার হৃদয়কে এতই আঘাত করিয়াছিল যে সারাদিন কাজে কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও বুকের কোন একটা স্থানে এমনই খচ খচ করিতেছিল যে সেইদিনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কোন লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রীতি জন্মিবার বিশেষ কোন কারণ বা সময়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকিতে পারে না।

অপরাহ্নে নলিনের সঙ্গে দেখা হইল। পাছে আরও কতকগুলা অপ্রিয় বাক্য শুনিতে হয়, তাহাকে এড়াইয়া গেলাম। এবং সত্য কথা বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি-না সারাদিনের মত সারারাত্রি বুকের সে বেদনাটি জাগিয়া থাকিয়া সচকিত করিয়া রাখিল।

নলিন যে সমস্ত কথা বলিয়াছে, তাহা বলিবার অধিকার তাহার হয়ত আছে—সে হয়ত সব জানে-শোনে কিন্তু বেদনা বহন করিবার কোন কারণই আমার নাই। আমার দীক্ষাদাতা গুরু নহেন, আমার কুলপুরোহিত নহেন, গ্রামবাসী নহেন, এমন কি বেশীদিনের পরিচিতও নহেন—তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইবার কোন কারণই বিদ্যমান নাই। কিন্তু হায়! মন ত যুক্তি মানে না, কারণ অনুসন্ধান করে না, আমরাই তাহার অনুবর্ত্তন করি। আরও আশ্চর্য্য যে ক্ষোভের হেতু কাহার কাছে বিবৃত করিতেও ইচ্ছা হয় না, লজ্জা করে। স্ত্রী বিমর্ষতার কারণ জানিতে চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সেই যে পাশ ফিরিলেন, সারারাত্রি তাঁহার সাড়াশব্দ মিলিল না।

পরদিন দশটা-আটের ট্রেণে উঠিতেই দেখি, একটা যেন খণ্ড প্রলয় বাঁধিয়া গিয়াছে। গুরুদেব একা, বিপক্ষে গাড়ীশুদ্ধ সবাই।

অন্যদিনের মত গুরুদেব প্রসন্নহাস্যের সহিত আমাকে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

গণেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা এই মৃগেনবাবুকে সালিশী মানা যাক্! বলুন ত মশায়—গোড়েতে চারজন "without ticket (বিনা-টিকিটে ভ্রমণকারী) কে চেকাররা ধরে। তারা বলে যে, গার্ডকে জানিয়ে উঠেছিল, গার্ড বলে, মিথ্যা কথা। চেকাররা Excess চার্জ করে কিন্তু কোন ব্যাটার কাছে…

সত্যেনবাবু একটু নীতিবাগীশ, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—গাল দেবার দরকার কি! অমনই বলুন-না!

গণেশবাবু বলিলেন—জোচ্চোরকে ব্যাটা বলেছি এমন দোষই বা কি হয়েছে মশাই! হ্যাঁ শুনুন মৃগেনবাবু, ব্যাটাদের ট্যাক Calcutta maidan (গড়ের মাঠ) চেকাররা পুলিশে Handover (জিম্মা) করে দিচ্ছে এমন সময় গুরুদেব এইখেন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে, চেকারদের ডেকে ভুজুং ভাজং দিয়ে ব্যাটাদের ছাড়িয়ে দিলেন। আচ্ছা, কাজটা অন্যায় হয়েছে কিনা—তাই বলুন!

আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, নলিন মাঝখান হইতে প্রশ্ন করিয়া বলিল—তারা বুঝি গুরুদেবের শিষ্যসামন্ত?—বলা বাহুল্য তাহার স্বর ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞাসূচক।

গুরুদেব উত্তর দিলেন না; দিলেন কালীবাবু। বলিলেন—আরে দূর দূর, শিষ্য কেন হ'তে যাবে, তারা সব সাঁওতাল বাউরী! কুলী টুলী হবে।

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—বড় গরীব, মা'র ছেলে!

গণেশবাবু বলিলেন—মা'র ছেলে ত জানি। চুরি করলে জেলে যেতে হয়, এ'ও মা'র বিধান।

গুরুদেব হাস্য করিলেন।

আমি বলিলাম—চেকাররা ছেড়ে দিলে?

গণেশবাবু বলিলেন—তা দেবে না কেন। উনি অনুরোধ করলে সাউথ-সেকসানে মানবে না এমন লোক কে আছে! কিন্তু ওঁর কি অন্যায় নয়? জোচ্চোরকে সাজা থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া মানে তাকে জুচ্চুরিতে সহায়তা করা।

গুরুদেব গণেশবাবুর মাথাটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—ওরে পাগলা, দু'দিন জেল হ'লেই বা কি হোত বল্! বরং দু'দিন খেটে এসে ওদের ধারণা জন্মাত যে দু'টো দিন রাজার খরচে পেট পুরে খেয়ে আসা গেল। পরে আর জেলের ভয় থাকতো না। এ তবু ভয় থাকবে যে সব-বারে কেউ তাদের ছাড়াতে আসবে না।

ন্যায়, সত্য, সুনীতি প্রভৃতি ভাল-ভাল শব্দগুলি গণেশবাবু বাল্যকাল হইতে ভালরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, গুরুদেবের যুক্তি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল না, তিনি প্রতিবাদ করিবার উদ্যোগ করিতেই গুরুদেব বলিলেন—ওরে বাপু, গবর্ণমেণ্টও আজকাল একথা মানছে। অজ্ঞান, প্রথম-অপরাধীদের জন্যে নদের মহারাজার বোরাষ্টল স্কুল পাশ হয়ে গেছে—শুনিস্ নি? মহারাজারও এই মত যে তাদের জেল টেল না দিয়ে চরিত্র সংশোধনের জন্য স্কুলে পাঠালে তাদের ভাল হবে; চোর-ডাকাতের সংখ্যাও কমবে।

ট্রেণ শিয়ালদহে থামিল। গুরুদেব বহুপ্রস্থ আশীর্বাদ ব্যয়িত করিয়া প্রস্থান করিলেন। সে দৃশ্য দেখিলে না হাসিয়া কেহ থাকিতে পারে না। 'তেড়ীবান' বাবুরা কাহাকেও মাথায় হাত-দিতে দিতে নারাজ; গুরুদেবেরও বদভ্যাস, মাথায় হাত না দিলে যেন 'মা ভাল করবেন' না।

পথে নলিন আমাকে ধৃত করিয়া বলিল—কিহে কি বুঝলে?

আমি সংক্ষেপে কহিলাম—কিছু না।

নলিন বলিল—বুজরুক! দিলে এক চাল চেলে!

কথায় কথা বাড়ে। একপক্ষ নীরব থাকিলে অপর পক্ষের উৎসাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমি তাই চুপ করিয়া রহিলাম। বকিয়া-বকিয়া নলিন শ্রান্ত হইয়া থামিল।

২

এদিন আর নলিনের কথায় ব্যথা পাই নাই। কারণে ও অকারণে মানুষকে খাটো করিবার একটা দুষ্প্রবৃত্তি যেমন অনেকের থাকে, নলিনের তাহাই আছে জানিয়া আমি সুস্থ হইয়াছি।

ইহাদের স্বভাবই এই, কাহাকেও ভাল বলিতে হইলে বুকে যেন ঢেঁকীর মুষল পড়ে। লোকের ছিদ্র ধরিতে না পারিলে ইহাদের ইনসমনিয়া হয়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ইহারা যে সেই সুযোগে অপরকে ছোট করিয়া নিজেদের বড় করিয়া প্রচার করে, তা'ও নয়। এবং অন্য কোনও উদ্দেশ্যও থাকে না। হিংসার কার্য্যই যেমন হিংসা করা—মানুষকে ছোট করাই তেমনই ইহাদের সৌখীন, সখের ও নিত্যকার ব্যবসা।

আমাদের ষ্টেশন হইতে কলিকাতা ট্রেণে মাত্র ষোলমিনিটের পথ। রবিবার ও ছুটিছাটার দিন ছাড়া রোজই ঐ ষোলমিনিট সময় আমরা গুরুদেবকে দেখিতে পাইতাম। বিকালে তাঁহার ফিরিবার স্থিরতা ছিল না, কচিৎ কোনদিন তিনি আমাদের সঙ্গে ফিরিতেন। কাজেই তাঁহাকে জানিবার, চিনিবার, বুঝিবার অবসর ঐ ষোলটি মিনিট! তাহার বেশী সময়ও মিলিত না, আমার দরকারও ছিল না।

প্রচারকার্য্য কিছুদিন বিধিমত উপায়ে চালাইয়াও নলিন যখন এ-তরফ হইতে একবিন্দু সমর্থনও পাইল না, তখন হতাশ হইয়া, আমার ভাল-মন্দের ভার আমারই হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। আমিও বাঁচিয়া গেলাম। গুরুদেব—গুরুদেবই রহিয়া গেলেন।

৩

চাকরীকে তালপত্রের ছায়া বলা হইয়া থাকে। কখন্ আছে, কখন্ নাই! কর-কোষ্ঠির নির্দেশেই কি-না জানি না, তিন বৎসরের কাছাকাছি সময়েই আমার ভাল চাকরীটাও অকস্মাৎ অকারণে খসিয়া গেল। বিলাতে মাদার ইণ্ডিয়া না-কি নামে একখানা ইংরেজী বহি বাহির হইয়াছে, বহিখানা পড়ি নাই, তবে বহিখানার সম্বন্ধে আমাদের ইংরাজী বাঙলা খবরের কাগজগুলিতে যে মতামত বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছিলাম এবং বহি ও তাহার লেখিকার উপর মনের ভাব সুপ্রসন্ন ছিল না। তাহাতে নাকি আমাদের হিন্দুনারীকে কুকুর-বিড়াল ও কাক-চড়ায়ের মত করিয়া আঁকা হইয়াছে।

আমার পাশের টেবিলে একটা এঁটো ফিরিঙ্গি বসিত। পান-চুরুট-চা, এগুলা সে নিত্য নিয়মিতভাবে আফিসশুদ্ধ বাঙালীবাবুদের ঘাড় ভাঙিয়া আদায় করিত। কেহই সন্তুষ্ট ছিল না কিন্তু মুষ্টিভিক্ষার প্রত্যাশীকে দ্বারপ্রান্ত হইতে বিদায় করিতে যেমন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয় না, এই নিতান্ত নির্লজ্জ ভিক্ষুকটা হাত পাতিলে তেমনই তাহাকে কেহই বিমুখ করিত না। একদিন একখানা ফিরিঙ্গি কাগজে সেই বহিখানার মস্ত লম্বা চওড়া সুখ্যাতি বাহির হইয়াছে, ট্রেণেও আমাদের মধ্যে সে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আফিসে আসিয়া বসিয়াছি মাত্র, এঁটো ফিরিঙ্গিটা ছ্যাতলাধরা দাঁতগুলা বাহির করিয়া বলিল—ওহে বোস, আজকের "ভারত-সুহৃৎ" পড়েছ? মাদার ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে—

পড়িনি, শুনিছি।

চমৎকার লিখেছে।

হঠাৎ আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অত্যুগ্রকণ্ঠে কহিলাম—আমাদের মা'র জাতকে গাল দিয়েছে, তাই বুঝি তোমার চমৎকার লেগেছে! তা ত লাগবেই। যে জাতের ছেলের মা আজ মিসেস্ পল, কাল মিসেস স্মিথ, পরশু মিসেস্ জোন্স, যে জাতের বিয়ে হ'তে দেরী ঘটলেও মা হ'তে দেরী হয় না—সে জাতের লেখা ওর চেয়ে আর কত ভাল হবে। তার সমঝদারও……

ফিরিঙ্গিটা ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—shut up! চুপ!

একটা উৎকট গালি উদ্গীরণ করিয়া আমি নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোন মানুষ সে গালি সহ্য করিতে পারে না—করাও উচিৎ নহে। কিন্তু যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন নিজের ঝোঁকেই আগাইয়া যাইতেছি, বলিলাম—যে বেটাদের না আছে বাপের ঠিক না আছে ঠাকুর্দার ঠিক, তারা আবার বাঙালীর মেয়েদের নিন্দে করতে আসে! তুই-ই ত নিজে স্বীকার করেছিলি, তোর মা'—মিসেস্ পলের বিয়ের তিনমাস পরেই তুই জন্মেছিলি!

What of that! তাতে কি!

তোর গুষ্টির মাথা আর কি! বাঙালীর মেয়ের বিয়ের তিনমাস পরেই ছেলে হ'লে সে মা'র কি হোত জানিস? কাশীর নীচে যে গঙ্গা আছে, তা'কে তাইতে শুয়ে চিরনিদ্রা ঘুমুতে হোত!

গোলমাল শুনিয়া আফিসের আরও দশপনেরোটি বাবু আমাদিগের পাশে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন—বলুন না মৃগেনবাবু, War Baby (যুদ্ধ-শিশু)-দের কথাটা বলুন-না।

আর একজন বলিলেন—Unmarried mothers অবিবাহিতা জননীদের কথাও আমরা জানি!

বাস্তবিক পক্ষে গণ্ডগোলটা খুবই পাকাইয়া উঠিল। পল একা, এবং যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া তখনকার মত সে নিরস্ত হইল এবং এই জাতীয় জীবের যাহা ব্রহ্মাস্ত্র তাহারই সন্ধান করিতে লাগিল। সময়ে এবং অসময়ে দোষে এবং বিনা দোষে আমার বিরুদ্ধে সাহেবদের কাণ ভারী করিয়া তুলিতেছিল। বড় সাহেবদের ব্যবহারে তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। এবং একদিন বড় সাহেব সামান্য একটা ভুলের ছুতা ধরিয়া আমাকে 'আমার নিজের রাস্তা' দেখিতে বলিল। সার্টিফিকেট একখানা—তাহাও দিল না। মনটা খুবই দমিয়া গেল বটে; তবে এ সান্ত্বনাও যে ছিল না, তাহা বলিতে পারি না যে আমার মাতৃ জাতির যাহারা গ্লানি করে, তাহাদের কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসিতে পারিয়াছি। বি-এ পাশ করিয়াছি, ইয়োরো-পীয়ান চার্টার্ড একাউন্টেন্টের অফিসের শিক্ষা আছে—সুপারিশ আছে—কাজ একটা জুটাইয়া

লইতে পারিব, তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। না হয় কিছু বিলম্ব হইবে, না হয় একটু কষ্ট হইবে। তা হোক্।

কিন্তু দিন কাল যে কি পড়িয়াছে তাহা আমার জানা ছিল না। আফিস কোয়াটারে আলাপী যত লোক ছিল, সকলের সঙ্গে একে একে দেখা করিয়া বেড়াইলাম কিন্তু কোথাও এতটুকু আশা ভরসা পাইলাম না। উপরন্তু যে কারণে আমি চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহা শুনিয়া অনেকেই অল্প বিস্তর হাস্য করিল। নিজের দুঃখ যত বড়, যত বেশী হোক্, আমাদের জাত ভায়েদের অধঃপতিত মনোভাব বুঝিয়া মনের মধ্যে যেন পাষাণ চাপিয়া বসিল।

আলাপী লোক ছাড়িয়া, বড় বড় আফিসে ঘুরিতে লাগিলাম। অধিকাংশ স্থলেই শুনিলাম—রিডাকসনের পালা জোর চলিয়াছে। বড় বাবু হইতে ক্ষুদে বেয়ারাটা পর্য্যন্ত সদা শঙ্কিত অবস্থায় কাল কাটাইতেছে, কখন কি হয়! কখন কি হয়! অনেক অফিসের দ্বারদেশেই কাষ্ঠফলক দোদুল্যমান No Vacancy (কর্ম খালি নাই) তবুও ভিতরে ঢুকিয়া দেখা করিতে ছাড়িলাম না।

একদিন একটা আফিসে একজন সরকারী হিসাব রক্ষকের পদ খালি আছে খবর পাইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। সাহেব সার্টিফিকেট দেখিতে চাইল। সার্টিফিকেট নাই শুনিয়া, বিরক্ত হইয়া অন্য কাজে মন দিল। আমি বলিতে গেলাম, সাহেব তুমি আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পার······

সাহেব বিরক্ত ভাবে বলিল—না, না, আমাদের অনেক কাজ জমিয়া আছে, পরীক্ষা করিবার সময় নাই।

আফিসের বাবুদের সঙ্গে দেখা করিতে, তাঁহারা বলিলেন—পুরানো আফিসে যান না মশাই, সাহেবকে ধরে টরে পড়লে—সার্টিফিকেট খানা দিয়ে দিলেও পারে।

সে সম্ভাবনা নাই জানাইয়া কহিলাম—অন্য কোন উপায় থাকে ত' বলুন, চেষ্টা করি।

একজন বৃদ্ধ গোছের বাবু বলিলেন—আর একটা উপায় আছে কিন্তু শক্ত। রায় বাহাদুর মণীন্দ্রলাল দে আমাদের অফিসের ডাইরেক্টার, তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি আন্‌তে পারেন যদি—একেবারে অকাট্য!

পুরাণো আফিসের সার্টিফিকেট ও এই আফিসের ডাইরেক্টারের চিঠি—আমার কাছে দুই-ই দুষ্প্রাপ্য বটে! কোন আশা নাই বলিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া, পথে পড়িতেই মনে হইল বিশ্বজগৎ ঘুরিতেছে। ভূগোলের পঠিত অথচ অ-দৃষ্ট সত্য আজ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আমার হাত পা'ও অবশ হইয়া আসিল। আমার সে দিনের অবস্থা মনে করিতেও সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! গৃহে একটি কপর্দক নাই, ভাঁড়ারে এককণা তণ্ডুল নাই, স্ত্রীর অঙ্গে অলঙ্কার-

নাম শূন্য। জগদীশ্বরের কি ইচ্ছা জানি না, আমার মনে হইল কিঞ্চিৎ আফিম অথবা বিষ সংগ্রহ করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য!

ষ্টেশনে গণেশ বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সব কথা শুনিয়া বলিলেন—রায় বাহাদুর আমার ভাগ্নের শালার শ্বশুর কিন্তু তাতে ত' কাজ হ'বে না ভাই!......বলিয়া তিনি চিন্তিত মুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, আমার থার্ড ক্লাসের মানথলি, এ মাসেও কোন রকমে জুটিয়াছে, আসছে মাসে তাহাও জুটিবে না। তবে তৎপূর্বে যদি সকল যন্ত্রণার অবসান করিতে পারি, তার আর দরকারও হইবে না।

নলিন পুরানো আফিসেই কর্ম করিতেছে, সে'ও এই ট্রেণে ফিরে। পিঠের উপর হাত পড়িতেই দেখি, নলিন। বলিলাম, ওহে তোমাদের ত' সব বড় লোকের সঙ্গে আত্ম-কুটুম্বিতে —রায় বাহাদুর মণীন্দ্র দের কাছ থেকে একটা সুপারিশ চিঠি আনতে পার?

কি হ'বে?

প্রয়োজন বলিলাম। নলিন বলিল—আমাদের সঙ্গে জানাশুনো নেই ত'!

হায়রে! এই নলিনই, হেন বড় লোক কলিকাতায় নাই—যাহাকে না সে ভগ্নীপতি বলিয়া গর্ব করিত, গল্প করিত।

নলিন আবার বলিল—তোমার গুরুদেবের প্রধান শিষ্য ঐ রায় বাহাদুর মণীন্দ্র দে! আরে, ঐ যে নাম করতেই তোমার গুরুদেব।

আমার মনে হইল, নাম করিতেই যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, তখন বুঝি অদৃষ্টের দুঃখের শেষ হইয়াছে। আশায় আনন্দে বুকের ভিতরের বুকখানা নাচিয়া উঠিল। গুরুদেব সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন—হ্যাঁ বাবা কিছু জোটাতে পার নি? আমি ঘাড় নাড়িলাম।

গুরুদেব বলিলেন—মা ভাল করবেন, বাবা, মা ভাল করবেন। হিন্দীতে একটা কথা আছে——

"ছোড়িও না হিম্মৎ"

অর্থাৎ কি না চেষ্টা ছেড় না। ভাল হবেই বাবা, ভাল হ'বেই; মা তোমার ভাল করবেনই।

আমি বলিলাম—গুরুদেব, রায় বাহাদুর মণীন্দ্রলাল দে আপনার শিষ্য!

বড় ভাল শিষ্য—মা ভাল করেছেন, বড় ভাল।

গুরুদেব, একটা কাজের খবর পেইছি, তাঁর একখানা চিঠি আন্‌তে পারলেই হয়। গুরুদেব এই চিঠিখানি আপনি এনে দিন—নইলে গরীব মারা যাবে—না খেতে পেয়ে......

গুরুদেব মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—ছি বাবা, ও কথা কি বলতে আছে! মা ভাল করবেন।

আশান্বিত হৃদয়ে বলিলাম—চিঠিখানা……

গুরুদেব, বড় আশা করিয়া যাঁহার পানে চাহিয়াছিলাম, বড় ভরসা হইয়াছিল যে এ বিপদে তাঁহার সাহায্য পাইবই—মাথা নাড়িয়া বলিলেন—সে তেমন লোকই নয়—চিঠি দেবে না।

হায়রে জগৎ!

নলিন বলিল—আপনি তার গুরুদেব। আপনি চাইলে……

ওরে, ওবিষয়ে ওরা বাপের কুপুত্তুর। ও আর রাজেন মুখুজ্যে। দশটা টাকা চাইবা মাত্র দেবে, কিন্তু অজানা লোককে চিঠি—কিছুতে দেবে না।—গুরুদেব চলিয়া গেলেন।

নলিন বলিল—বেটা নিজের স্বার্থ ছাড়া এক কড়ার উপকার করে না আমি চিরকাল জানি!

অবস্থাবৈগুণ্যে মন ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। আজ নলিনের 'চিরকেলে সত্যটা' গ্রহণ করিতে আমারও দ্বিধা রইল না।

নলিন গাড়ীর মধ্যেই ব্যাপারটা পাকাইয়া তুলিয়াছিল বুঝিলাম, কারণ গণেশবাবু, কালীবাবু, প্রমথবাবু পথে ঐ কথাটাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে বেটা মস্ত বড় বুজরুক। নিজের স্বার্থের জন্য জালজুয়াচুরী ফন্দিবাজী কিছুই আটকায় না কিন্তু পরের উপকার করা নন্দমুখুজ্জের কোষ্ঠীবিরুদ্ধ।

গুরুদেবের আসল নাম, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

৪

বাঙালীর একটি আশা, একটি ভরসা, একটি আনন্দ, একটি সান্ত্বনা—তাহার স্ত্রী। বিধাতা তাহাকে অনেক সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় এই সুখটা ভারে ভারে দিতে কার্পণ্য করেন নাই। এতো ত' দুঃখের সংসার, দুইবেলা পেট পুরিয়া অন্ন জুটিতেছে না, মৃত্যুই একমাত্র রক্ষার পথ, তবুও চারু বলিল—ছি, ছি, আজ তোমার মনে ও পাপ কথা উঠলো কেন বল ত! আজ একটা জায়গায় বিফল হয়ে এসেছ বলেই কি চিরদিন তাই হবে? তা কি হয়? যেখানে হোক্, জুটবেই। ভগবানই জুটিয়ে দেবেন। তুমি অত হতাশ হয়ো না। এক মাসের সংসারের ব্যবস্থা আমি করেছি তুমি কাজের চেষ্টা করো—এই মাসের মধ্যে একটা না একটা জুটে যাবেই।

সংসারের ব্যবস্থাটা কি-রকম করেছ শুনি?

নাই বা শুন্‌লে?

না, শুনি!

দে-মশাইরা সবাই কাল দিল্লী যাচ্ছেন, তাঁর মা থাক্‌ছেন। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে, আমি তাঁকে দেখব শুনব, রেঁধে বেড়ে দেব, আমরা দু'জন ঐখানেই খাব।

অর্থাৎ রাঁধুনিগিরি!

হ্যাগা, তা'তে দোষ কি! আর ঠিক রাঁধুনিগিরিও নয়। তাঁকে ত চিরকাল মা বলি, স্বজাতি, বয়সে বড়, পূজনীয় লোক, আর মাইনেও ত নিচ্ছি না।

তর্ক করিলাম না। কেনই বা করিব? এ যে একটা মস্ত পরিত্রাণ তাহা ত নিজেই জানি! তবে দুঃখ হয়! কেন হয়—তাহা কি আর বলিতে হইবে!

একমাসের চাই-কি দিল্লীতে তাঁহাদের দুইমাসও হইতে পারে—দুইমাসের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া যথারীতি কাজ-কর্মের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বলা ভাল, কোন-কোন আফিসে ভিজিটার্স রুমে বসিয়া সাহেবসুবার জন্য প্রতীক্ষা করিবার কালে দুই-চারিখানা খবরের কাগজ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতাম—সময় কাটাইবার জন্য। "মাদার ইণ্ডিয়ার" ব্যাপার এই ছয়মাসে আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। "ভারত সুহৃৎ" পত্র বহিটার সুখ্যাতিতে আজও পঞ্চমুখ, বাঙালী-পরিচালিত পত্রিকাগুলি আজও সমানে তাহাকে গালিগালাজ করিয়া চলিয়াছে কিন্তু এতবড় বাঙলাদেশে এত কোটী পুরুষ থাকিতেও যাহারা নিত্য তাহার মাতৃজাতির গায়ে কলঙ্ক-কালি লেপন করিতেছে, কেহ তাহার টুঁটিটা টিপিয়া ধরিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য! আমার মনের ভাব এই থাকিলেও আজ আর আমি বিচলিত হইলাম না। আজ যে আমার অন্নচিন্তা চমৎকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লালদীঘির পাড়ে পাম্‌-কুঞ্জের নীচে বিশ্রাম করিতেছি, ঘাসের উপর বসিয়া দুইটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান-ক্লাসের লোক নিজের মনে কথা কহিতেছিল, তাহারই কতকাংশ শুনিয়া খাড়া হইয়া বসিলাম। তাহাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম এইরূপ:—তাহাদের একাউন্টেণ্টটি বড় বদ্‌লোক ছিল, আজ সকালে সে মারা পড়িয়াছে, তাই সাহেব আজ আফিস ছুটি দিয়াছে। লোকটা মরায়, আফিসশুদ্ধ লোকের বড়ই আনন্দ হইয়াছে।

বেঞ্চ ছাড়িয়া আমিও ঘাসের উপর তাহাদের কাছে আসিয়া বসিয়া মিষ্ট কথায় আফিসের নাম, বড় সাহেবের নাম, ঠিকানা সব সংগ্রহ করিয়া লইলাম। এবং পরদিন ঠিক এগারটার সময় বড় সাহেবের চাপরাশীর হাতে নিজ নাম ও উদ্দেশ্য-সম্বলিত চিরকুট পাঠাইয়া দিলাম।

সাহেব অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কহিল—বাবু, হাজার টাকা জমা রাখিতে হইবে। যদি প্রস্তুত থাক, কাল আসিও, আমি তোমাকেই লইব।

এক কলস দুগ্ধ যেমন একফোঁটা গোময়-স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যায়, সাহেবের কথাতেও আমার সব আশা ও ভরসা শেষ হইয়া গেল।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিল—আজ মেল-ডে বাবু, আমি ব্যস্ত আছি, তুমি কাল আসিও।

আর আসিতে হইবে না, মনে মনে এই কথা বলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সিঁড়িতে নামিতেছি, আমি তাঁহাকে দেখি নাই, গুরুদেব আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—এখানে কেন বাবা। কোন কর্ম টর্ম আছে নাকি?

বলিলাম—আছেও বটে, নাইও বটে!—আমি নামিতে উদ্যত হইতেছিলাম, গুরুদেব বলিলেন—এস না বাবা উপরে—শুনি কি ব্যাপার! মা ভাল করবেন।

অনর্থক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে আর ইচ্ছা ছিল না কারণ মা ভাল করিবেন না আমি জানিতাম! কিন্তু বৃদ্ধ ছাড়িলেন না; হাত ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন—অগত্যা আমিও উঠিলাম।

আফিসের দ্বারবানগণ—যাহারা আমাদের মত তুচ্ছলোককে চোখে দেখিয়াও দেখে না, তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কেহ নমস্কার, কেহ সেলাম, কেহ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুদেবের মুখে সেই এক কথা, মা ভাল করবেন!

গুরুদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া ভিজিটার্সরুমে আসিয়া বসিলেন। দ্বারবান ছুটিয়া আসিয়া পাখা খুলিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কর্ম খালি আছে বল ত বাবা!—তাঁহার স্বরে আর যাহাই থাক্-কৃত্রিমতা ছিল না।

সমস্ত কথা বলিলাম। শুনিয়া বলিলেন—হাজার টাকা জমা না দিলে হ'বে না? বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছ? মিষ্টার ফিপ্‌সন?

হ্যাঁ—তিনিই বল্লেন।

আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে।

আবার আমাকে একরকম টানিয়াই তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বড়সাহেবের ঘরে ঢুকিতেই বড়সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—হেল্লো, গুরুদেব, বাল আছেন?

মা ভাল করবেন। বস, সাহেব বস!

সাহেব এতক্ষণে আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—তুমি কি চাহ বাবু?

গুরুদেব বলিলেন—আমার শিষ্য! বড় ভাল শিষ্য! এইমাত্র তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছে। যে কর্মটি খালি আছে।

সাহেব বলিলেন—I see! কিন্তু ও ত আপনার নাম করে না।

না। কর্মটি উহাকে দিতে হইবে মাষ্টার ফিপস্‌ন!

অবশ্যই দিব।

হাজার টাকা জমা দিতে হইবে ত?

হ্যাঁ—নিয়ম তাই। যে বাবুটি মারা গেল তাহারও জমা ছিল। তবে গুরুদেব বলিলে—

না, না, নিয়মভঙ্গ করিতে গুরুদেব বলে না। মা ভাল করবেন। আমি জমা রাখিতেছি মাষ্টার ফিপসন!

বলিয়া গুরুদেব ফস্ করিয়া কোঁচার খুঁট খুলিয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে একখানা চেক্ বহি বাহির করিলেন। সাহেব নিজহস্তের ফাউণ্টেন-পেনটি অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন—কিন্তু গুরুদেব, আপনার লোক, আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন ইহা বলিয়া দিলেই আমি বাবুটিকে লইতে পারি।

গুরুদেব চেকে তারিখ বসাইতে বসাইতে বলিলেন—না হে মাষ্টার ফিপসন, আইন সকলের জন্যই একরকম হয়! আইনে গুরুও নাই; শিষ্যও নাই। চেক্ তোমার নামেই দিই?

তা দিতে পারেন।

আমি জাগ্রত, অথবা নিদ্রিত জানি-না, সাহেবের সম্বোধনে চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, চাপকান পরিহিত একটি বাবু আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাহেব আমার উদ্দেশে কহিলেন—বাবু, তোমাকে একশত টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করা হইল। বছরের শেষে খাতাপত্র মিলাইতে পারিলে পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দিব। আশা করি তুমি ভালভাবেই কাজ করিতে পারিবে।

গুরুদেব বলিলেন—তা পারবে, বড় ভাল ছেলে, মা ভাল করবেন!

সাহেব বলিলেন—তুমি বড়বাবুর সঙ্গে যাও, আজই চার্জ লওগে!

নিশ্চয় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম—সাহেবকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া হইল না; গুরুদেবকেও প্রণাম করা হইল না। "আসুন" শুনিয়া বড়বাবুর সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

চার্জ বুঝিয়া লইয়া বসিতে, প্রকৃত অবস্থাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই একরকম উর্দ্ধশ্বাসে গুরুদেবের সন্ধানে বড়সাহেবের কামরা পানে ছুটিলাম। শুনিলাম, সাহেব টিফিনে গিয়াছে। দরওয়ান বদল হইয়া গিয়াছিল, গুরুদেবের খবর কেহ দিতে পারিল না।

মানথলি থার্ডক্লাস টিকিট থাকিতেও সেদিন একখানা সেকেণ্ডক্লাস টিকিট কিনিয়া পুরাতন বন্ধুদিগের সঙ্গে সেকেণ্ডক্লাসেই উঠিয়া, সর্ব্বপ্রথমে নলিনকে খবরটা দিলাম। নলিন অপ্রসন্নমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একসময়ে দু'হাজার বের করে—ছাড়বে।

গণেশবাবু প্রভৃতিও ব্যাপারটা শুনিলেন কিন্তু কেহ কিছুই বলিলেন না।

ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে, ছুটিতে ছুটিতে গুরুদেব আসিয়া উঠিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া পায়ের ধূলা লইতে, গুরুদেব মাথায় হাত রাখিয়া কি-যেন কি বলিলেন। বুঝিলাম না, তবে অনুমান এই হইল যে, মা ভাল করিবেন, এখনও ইহাই তাঁহার একমাত্র বক্তব্য!

চারু বলিল—দীক্ষা নাও। ভগবান যখন হিতৈষী গুরু জুটিয়ে দিয়েছেন, আর অগুরু থেকে কাজ নেই চল, দীক্ষা নিয়ে আসি।

তথাস্তু।

একদিন জোড়ে আশ্রমে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। জানি-না কেন, জানিতেও চাহি-না কেন, হৃদয়-মনে পুলক সঞ্চারিত হইল।

নলিন প্রভৃতি খবরটা শুনিয়াছিল, জিজ্ঞাসিল—গুরুদক্ষিণা কত লাগল হে!

বলিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে গুরুনিন্দা শুনিতে হয়, কহিলাম—আমার মত গরীব, কত দিতে পারে ভাই! একটি টাকা মাত্র!

নলিন আফিসের দেরী হইতেছে ভাবিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

নর্ত্তকী
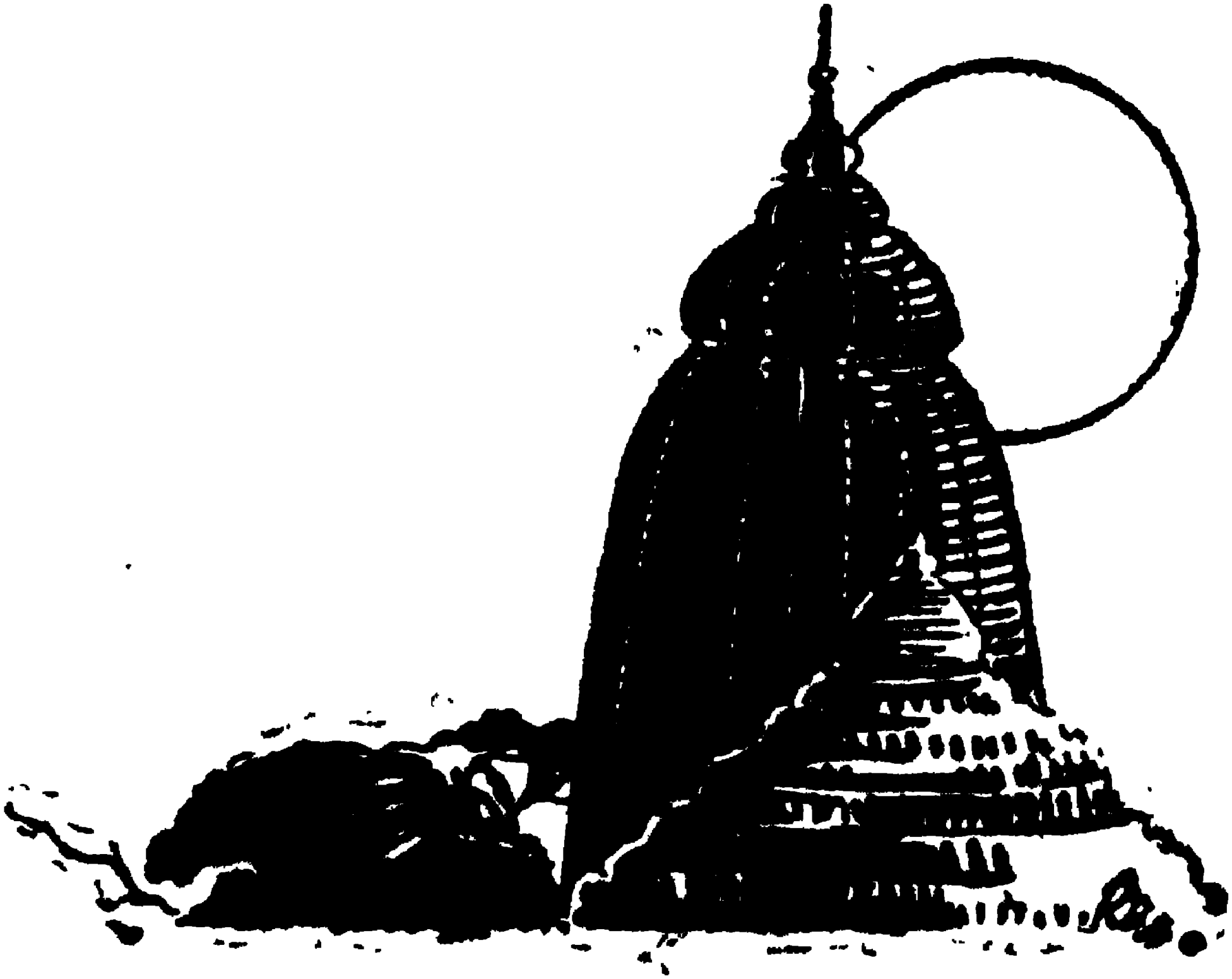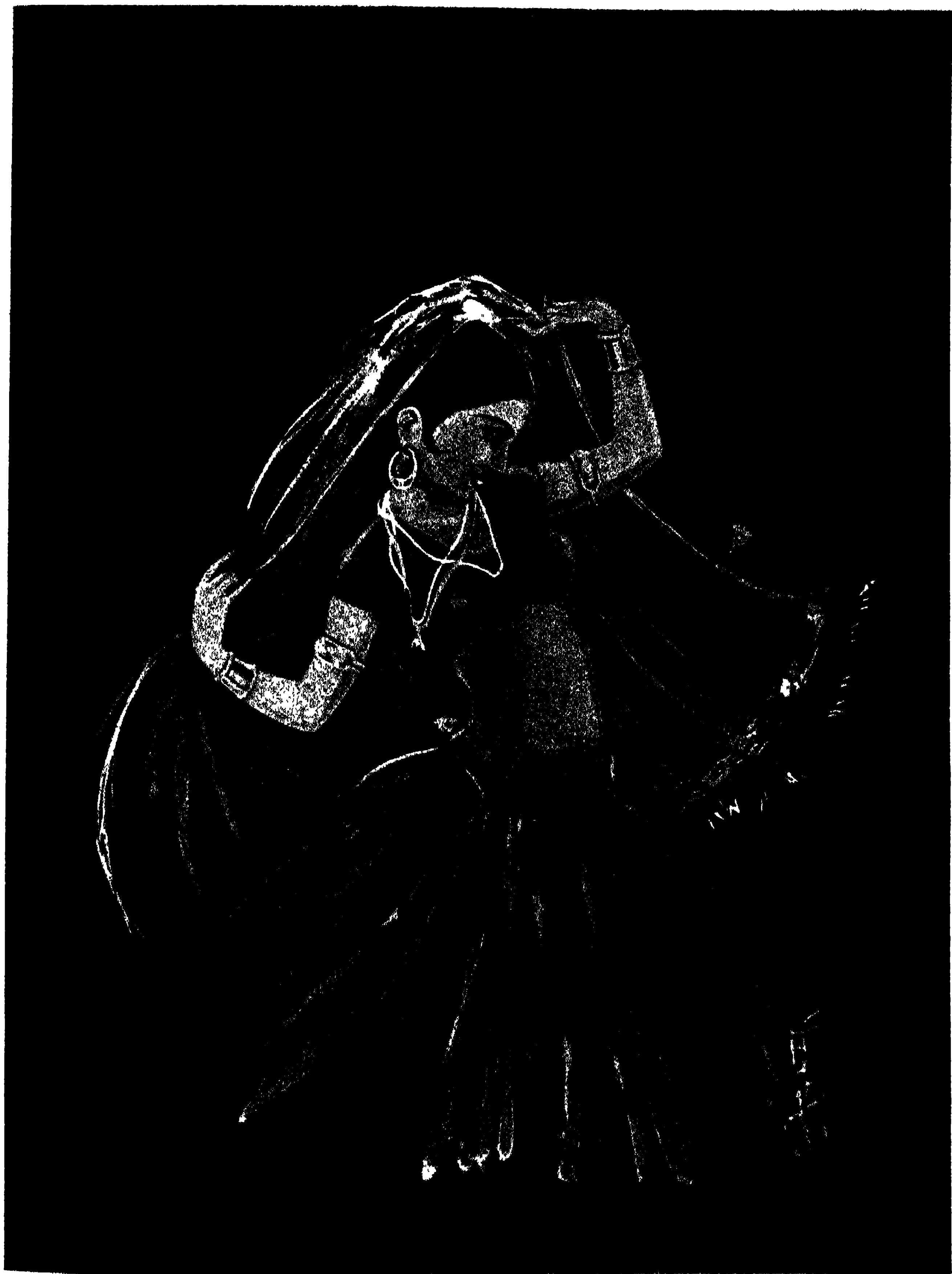
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

Himani Press, Calcutta

হানাবাড়ী

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

এক

একে মেটে খোড়ো বাড়ী, তায় আবার 'হানা' কাজেই আমার এই ভাঙ্গাচোরা অশোভন বিশ্রী চেহারাখানা দেখে তোমরা যে আজ অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, আমার ভয়াবহ নামটী মাত্র শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি ?

আমার প্রাণের কথা তোমরা তো জাননা! জাননা যে শুধু বিভীষিকাই নয়, আমার এই ভগ্নজীর্ণ বুকখানার মধ্যে কতখানি অব্যক্ত নিথর বেদনা, কি গভীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, যা তোমাদের অকরুণ বিমুখ চিত্তগুলিকে একনিমেষে করুণায় বিগলিত করে শুষ্ক নয়ন-কোণে দুফোঁটা সমবেদনার শুভ্র নির্ম্মল অশ্রু ফুটিয়ে তুলতে পারে।

অসহায়া বিধবা রেণুর মা মেয়ের বিয়ের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যেদিন নিতান্তই অনাথিনীর মত এসে আমার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন সে যে কতদিনের কথা, তা বলতে পারি না, তবে বোধ হয় সে অনেক—অনেক দিনের কথা।

আমি যাদের সম্পত্তি, সেই মুখুয্যেরা বাস করতেন ঠিক আমার পাশের ঐ পাকা দোতলা বাড়ীখানিতে। মুখুয্যেদের গিন্নী রেণুর-মাকে বড়ই স্নেহ করতেন, তিনিই দয়া করে সেই স্বামী বা অন্য অভিভাবকবিহীনা অনাথাকে নানামতে সাহায্য করতেন; নিরাশ্রয়ার এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়-টুকু লাভ, শুধু তাঁহারই অনুগ্রহে।

কিন্তু রেণুর মা অকৃতজ্ঞ নয়, নিজের শরীর ও সামর্থ্য দিয়ে তিনিও সাধ্যমত উপকারীর প্রত্যুপকার করতে প্রয়াস পেতেন। মুখুজ্যে বাড়ীর কাজকর্ম্ম সেরে নিজের জীবনধারণের দুটী হবিষ্যান্ন ফুটিয়ে বাকি সময়টুকু রেণুর মা পূজার্চ্চনা, আর আমার সেবাতেই কাটিয়ে দিতেন। সেই কর্ম্ম-কুশলা, পরম নিষ্ঠাবতী বিধবার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে তখন আমার এই কুদর্শন মাটীর দেহ-খানি এমন এক পবিত্র কমনীয় শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠ্‌ত, যা দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো।

তা আনন্দবৈচিত্র্য নাই থাকুক, তবু সেই শান্ত, শুদ্ধ সংযত-স্বভাবা রেণুর মা'র সাহায্যে আমার একঘেয়ে দিনগুলি বেশ নিরুদ্বেগে শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিল।

শুধু দিনান্তের আলোটুকু নিঃশেষে নিভে গেলে রেণুর মা যখন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসা সাঁঝের অন্ধকারে, তুলসীমূলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে, সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি মাটির ওপর লুটিয়ে দিয়ে ছল ছল চক্ষে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতর, করুণস্বরে বলতেন "ঠাকুর! ঠাকুর! তুমি দয়াময়, দয়া কর, বাছাকে আমার সব দুঃখ, সমস্ত অমঙ্গল হতে দূরে রেখো! সে ছাড়া এই সর্ব্বহারা দুঃখিনীর আর যে কেউ নেই প্রভু!"

তখন সেই শঙ্কিত স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের উৎসারিত কল্যাণ-কামনা, সেই ব্যথা-ভরা ব্যাকুলতা আমকেও যেন কেমন উদাস ব্যথিত করে তুলত!

তবু তখনও আমি জানিতাম না, যে বিধাতা জননীর কোমল অন্তরে কতখানি স্নেহমমতা অযাচিতে ঢেলে দিয়েছেন, আর সে প্রাণ কেমন অন্তর্য্যামী! তার পর কতদিন পরে একটী অচেনা নূতন প্রাণীর আবির্ভাবে আমার সেই একটানা দিনগুলির ধারা সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

সে অনাথিনী মায়ের একমাত্র অঞ্চলের নিধি, আদরের ধন রেণু। দীর্ঘকাল পরে মেয়েকে কোলের কাছে পেয়ে মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কিন্তু রেণুর প্রায় নিরাভরণ কৃশ-ভঙ্গুর দেহ, আর ভোরের শুকতারার সম নিষ্প্রভ পাণ্ডুর মুখখানি দেখে জননীর সেই দুকূল প্লাবী হর্ষোচ্ছ্বাস হঠাৎ বাধা পেয়ে মাঝপথেই থেমে গেল।

মেয়েকে বুকে টেনে অশ্রুমুখী মা কাতর ব্যাকুল হয়ে বল্লেন—"আহা গো! তোর একি দশা হয়েছে মা? একেবারে কঙ্কালসার মূর্ত্তি, দেখে যে চেনাই যায় না! তাইতো! এমন হয়ে গেলি কেন রেণু?"

রেণু তার জলভরা চক্ষু দুটী নামিয়ে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। গরীবের ঘরের অনবদ্য দুর্ল্লভ শ্রীসম্পদটুকু ধনীগৃহে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সে যে আজ এসেছে তার দুঃখিনী মায়ের জীর্ণ কুটীরে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে! সেই দারুণ লজ্জা ও বেদনা বুঝি তাকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করে তুলছিল!

মৌন রেণুর কুণ্ঠানত ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে মা সংশয়াকুলচিত্তে দ্বিগুণ আগ্রহে বল্লেন "তোর হয়েছে কি তা বল্ না মা? আমার যে ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে! সেখানে তোকে কেউ যত্ন করত না বুঝি?"

মায়ের সাগ্রহ প্রশ্নে রেণু তার ছাপিয়ে-পড়া চোখের জল কষ্টে সম্বরণ করে করুণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বল্লে "আমার যে বড্ড অসুখ করেছিল মা! অনেকদিন ভুগেছি, তাই আজও ভাল সারতে পারিনি।—

মা চমকে উঠে শঙ্কিত, ত্রস্তভাবে বলে উঠলেন "আহা! তাই নাকি! ও মাগো! আমি

তো সে কথা কিছুই জানতাম না। একবারটী খবরও কি দিতে নেই মা?" "খবর দিয়ে কি হ'ত মা?—মিছে তুমি ভেবে সারা হতে—"

রেণুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মা আদর করে বল্লেন "তাই বুঝি তোর শাশুড়ী এদ্দিন পরে আপনা হতেই পাঠিয়ে দিলেন? হাঁরে! সেখানে তোর অসুখের সময় দেখাশোনা করত কে? সবাই বেশ যত্ন আত্তি করত তো? ওকি অমন করে হাসলি যে? কেউ দেখত না? আ মরে যাই বাছারে! সেখানে না জানি কত কষ্টই পেয়েছিস!"

রেণু মায়ের সস্নেহ সহানুভূতিতে ছল ছল চক্ষে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে একটা সুগভীর কাতর-নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলতে লাগ্‌ল, শাশুড়ী পাঠিয়েছেন কি সাধে মা? যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, প্রাণপণে বাড়ীশুদ্ধর মন যুগিয়ে চল্‌তে পেরেছি, ততদিন গরীবের মেয়ে হওয়ার অপরাধটুকু তাঁরা ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, তার পর রোগে অনিয়মে শরীর যখন একেবারে ভগ্ন অপটু হয়ে পড়ল, তখন সকলেরই আপদ বালাই হয়ে উঠলুম আর কি!—শাশুড়ী ব্যাজার হয়ে বল্লেন "নিত্যি রোগা দেখে কে? এই বুড়ো বয়সে আমি তো বাপু পারি না আর রোগের কর্ণা করতে, তার চেয়ে মায়ের কাছে দিনকতক গিয়ে সেরে সুরে এসগে" কিন্তু পোড়া অসুখ কিছুতে সারে না মা,—তা আমি আর কি করব বল?

"কিন্তু জামাই, তিনি কি বল্লেন?

"কি আর বলবেন? মায়ের কথার উপর তিনি তো 'না বলতে পারেন না?" কন্যার দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে মা যেন পাথরের মত কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লেন। হায়রে! তা'র কত দুঃখের, কত সাধনার ধন এই রেণু, বিধবার নিরবলম্ব জীবনের একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি, এই মেয়েটীকে সুখী করতে তিনি যে আজ সর্ব্বহারা হ'য়ে পড়েছেন, সেই রেণুর এত কষ্ট!

মায়ের বজ্রাহতের মত শুম্ভিত ভাব দেখে রেণু ভীত ত্রস্ত হ'য়ে তাঁর বুকে মুখ রেখে আস্তে আস্তে ডাক্‌ল "মা!" মা চমক ভাঙ্গা হ'য়ে উত্তর দিলেন "কি মা?"

"তুমি আমার জন্যে কিছু ভেবনা মা, আমি তোমার কাছে আসতে পেয়েছি, এখন নিশ্চয় সেরে উঠব—" মা মেয়েকে আদর করে স্নেহ-মথিত কোমলকণ্ঠে বল্লেন "তা সারবে বই কি মা, অবিশ্যি সারবে। তবে আমি কি ভাবছি জানিস রেণু? বেয়ান সেই তো তোকে পাঠালেন দুটাদিন এগিয়ে পাঠালে আর তোর এই দশা হ'তে পেত না। এখন শরীরে যে আর কিছু পদার্থ নেই মা! হ্যাঁরে! আসবার সময় শাশুড়ী কি বলে দিলেন? কদ্দিনের জন্যে পাঠিয়ে-ছেন?"

রেণু মেঘ-ভাঙ্গা চাঁদের আলোর মত একটু খানি চকিত ম্লান হাসি হেসে মৃদু স্বরে বল্লে "তা জানি না, তবে বোধ হয় চিরদিনের জন্যেই—" "আহা ষাট্! ষাট্! একি অলক্ষুণে কথা বলিস মা?" মেয়ের অন্তরের গোপন ব্যথাটুকু ঠিক ধরতে না পেরে মা পরম স্নেহভরে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন

"আমি যেমন করে পারি তোমাকে সারিয়ে তুলব মা তারপর সেই খানেই তো যাবে, সেই ঘরই যে জন্ম জন্ম করতে হবে লক্ষ্মী আমার! দুটো দিন মা'র কোলে থাক্লিই বা।"

মায়ের স্নেহাদরে ও সান্ত্বনায় রেণুর মনের বেদনা ও গ্লানি অনেকটা লঘু হ'য়ে গেল। তখন অনেকদিন পরে সে মনের রুদ্ধ কপাট মুক্ত করে দিয়ে মা'র কাছে গল্প করতে লাগল, তার শ্বশুর-গৃহের কথা, সেখাকার লোকগুলির স্নেহহীন নিষ্করুণ ব্যবহার, যা তার কোমল প্রাণটীকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জ্জরিত করে তুলেছিল।

অসুখের সময় যখন রেণু একলাটী ঘরের কোণে পড়ে রোগের দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করত তখন একবারটী মায়ের কোলে আসবার জন্যে মা'র এই স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শটুকু পাবার জন্যে তার অশান্ত মনটি কি রকম আকুলী বিকুলী করতে থাকত, শুনতে শুনতে মায়ের চক্ষুদু'টীতে শ্রাবণের ধারা নেমে আসত! হায়! রেণু যে তার কত দুঃখের ধন!

২

জননীর প্রাণঢালা সেবা ও যত্ন পেয়ে রেণুর রুগ্ন ভগ্নশরীর প্রথমটা একটু সামলে গেল বটে, কিন্তু পোড়া মনের রোগের তো প্রতিকার হ'ল না, সে যে মায়ের অসাধ্য!

তাই বহুদিন পরে মায়ের স্নেহভরা নিরাপদ কোলটীতে ফিরে এসে রেণুর মলিন মুখে যে একটুখানি প্রসন্নতার নির্ম্মল দীপ্তি দু'দিনের তরে ফুটে উঠেছিল, আকাশের রামধনুর রংয়ের মত সেটুকু ক্ষণিকে মিলিয়ে গিয়ে বিষণ্ণতার অন্ধকার আরও ঘোরাল হ'য়ে উঠল!

আষাঢ়ান্তের অফুরন্ত দীর্ঘ বেলা, সমস্তক্ষণ মেঘের পর মেঘ নেমে আকাশ খানিকে একেবারে আচ্ছন্ন থম্‌থমে করে তুলেছে; সেই নিবিড় কালো অন্ধকারে মেঘ সাগরের মাঝখান দিয়ে, তড়িতের জলন্ত শিখা যেন চক্ চকে পালিশ করা স্বর্ণ সর্পিণীর মত এক একবার ঝক্ ঝক্ করে দৌড়ে খেলে যাচ্ছিল। ম্রিয়মাণা স্তব্ধ বর্ষা প্রকৃতিকে চমকিত করে বাদ্‌লা বেলার পাগল হাওয়া থেকে থেকে হা-হা করে ছুটে আসছিল।

চারিদিকের সেই নিরানন্দ বিষণ্ণ ভাবটীকে আরও ফুটিয়ে তুলে আমার বিষাদ প্রতিমা রেণু নির্জ্জন ঘরে জান্‌লার ধারে একাকিনী বসে তখন কি জানি কি ভাবছিল।

আকাশের মেঘের মত তার ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত এলো চুলের রাশি পিঠ ঝাঁপিয়ে ধুলোয় পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। বরষার অধীর উতলা বাতাসের মত এক একটি উচ্ছ্বসিত আকুল দীর্ঘ শ্বাস তার ছোট্ট বুকখানিকে থেকে থেকে কাঁপিয়ে তুলছিল। রেণু তার দীর্ঘায়ত সজল আঁখি দু'টী মেলে আন্‌মনে চেয়েছিল সেই মেঘ-মেদুর মলিন দিগন্তের পানে, তার ব্যথিত তৃষিত ব্যাকুল চিত্তখানিও বুঝি আজ ঐ রকম অন্ধকারের নিবিড়তায় ও গুরু বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল।

রেণুর আপনহারা উদাস মনখানি সেই আকাশভরা সীমাহারা মেঘের ওপর দিয়ে কি জানি তখন কোন্ সুদূরে উধাও হ'য়ে গিয়েছিল!

সেই সময় রেণুর মা আলু থালু বেশে যেন পাগলিনীর মত ঘরে ঢুকেই ভাঙ্গা গলায় আর্ত্তস্বরে বলে উঠলেন "রেণু! ওরে রেণুরে আমার!" রেণু চমকিত হ'য়ে আস্তে ব্যস্তে মায়ের কাছে এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি, জিজ্ঞাসা করলে "কি হয়েছে মা? তুমি অমন করছ কেন মা?" "ওরে অভাগীর ধন! তোর কপালে শেষে এত দুঃখও ছিলরে। সংশয় বিস্ময়ে ব্যাকুল হ'য়ে রেণু ব্যগ্র মিনতির ভাবে বল্লে "বল না মা, কি হয়েছে? আমার যে বড় ভয় করছে! সেখানে সবাই ভাল"—ভয় নেই রে ভয় নেই,—সেখানে তারা সব ভাল আছে সুখে আছে আবার নতুন বিয়ের আমোদে মেতে—"

সরলা রেণু বাধা দিয়ে মা'র উত্তেজিত মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে "কার বিয়ে মা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—"

"কার বিয়ে বলব?—কিন্তু বলতে যে বুক ফেটে যায় মা। শুনলাম জামাই নাকি মাতৃআজ্ঞা পালন করতে আবার—" সেই অতি নিষ্ঠুর বাক্যটা উচ্চারণ করতে যেন তাঁর মুখে বেধে গেল। রেণুর চক্ষের আলো নিভে গিয়ে যেন বিশ্বের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। পায়ের তলায় মাটী কেঁপে দুলে উঠল। কোনও মতে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে সে কম্পিত কণ্ঠে বল্লে "খবরটাও তো মিথ্যে হতেও পারে মা—"

"না মা, মিথ্যে নয়, একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি! মুখুয্যেদের সতীশ যে নিজের চক্ষে সমস্ত দেখে এসেছে, তবে অবিশ্বাস করি কেমন করে মা? ওঃ! তাই বুঝি মায়ে-পোয়ে ষড় করে তোকে শরীর সারবার ছুতো করে সেখান থেকে সরিয়ে দিলে? কিন্তু কি পাষণ্ড, কি নিষ্ঠুর তারা!—এই নির্দ্দোষী নিষ্পাপ কচি মেয়েটার গলায় এমন করে ছুরী বসাতে তাদের পাষাণ প্রাণে এতটুকু মমতাও কি হ'ল না রে!—হা ভগবান! আমার কোন্ পাপে এ শাস্তি?"

রেণুর মুখে আর কথাটি নেই, দেহে বুঝি প্রাণও নেই! নিশ্চল নিস্পন্দ স্থাণুর মত হ'য়ে সে তখন ভাবছিল তার দুরদৃষ্টের দারুণ বিড়ম্বনার কথা। এই কাঁচা বয়সে, তরুণী জীবনে সে এত কি মহাপাতক করেছিল, যার ফলে এরি মধ্যে তা'কে নারীজীবনের সকল সুখ সাধে জলাঞ্জলি দিতে হ'ল?

মেয়ের সেই বিপন্ন অসহায় মূর্ত্তিখানি দেখে মায়ের মুখের ভাবও কঠিন হ'য়ে উঠল। অন্তর্ভেদী তীব্র বেদনায় চক্ষের জল নিঃশেষে শুকিয়ে গেল। আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জে উঠে, আগুনের ফিন্‌কির মত জলন্ত দৃষ্টিতে আকাশপানে তাকিয়ে তিনি হাত দু'খানি জোড় করে অকম্পিত দৃপ্তকণ্ঠে আপনা আপনি বলতে লাগলেন "জানি না, তুমি আছ কিনা!—কিন্তু ওগো! আমার অন্তর্যামী! কোনও দিন যদি তোমাকে অসংশয়ে সত্যিকার ডাক ডেকে থাকি,—যদি এই

মাটীর দেহে কোনও দিন একবিন্দু পাপ স্পর্শ না করে থাকে, তাহলে—তা'হলে এই অনাথিনী অভাগীর ভাঙ্গাবুকে বাজ হেনে যারা তার দুধের বাছার এত বড় সর্ব্বনাশটা করলে—তারা,—তারা যেন—"

রেণুর আপাদ মস্তক যেন শিউরে উঠল। সম্বিৎ পেয়ে শশব্যস্তে মা'র মুখখানি চেপে ধরে সে আকুল আর্ত্তস্বরে বলে উঠল "মা!—মাগো! কাকে অভিসম্পাত করছ মা? তারা যা খুসী তাই করুক না—তোমার দুঃখিনী মেয়ে তোমার কোলে একটুখানি ঠাঁই পাবে না কি?"

বলতে বলতে তার শিথিল কম্পিত দেহখানি যেন আতপ-তাপ-তপ্ত কোমল লতার মত মায়ের কোলে নেতিয়ে পড়ল। "তাই থাক্ মাণিক আমার!—মা'র বাছা মা'র কোলেই থাক্—" মেয়েকে বুকে জড়িয়ে দুঃখিনী মা হা-হা করে কেঁদে উঠলেন—দুটী ভাগ্যবিড়ম্বিতা ব্যথিতা নারীর দুঃখতপ্ত বেদনার অশ্রুজল গঙ্গা-যমুনার ধারার মত একত্র মিশে গেল।

সেই মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে যেন বাহিরের আকাশ বজ্রনিনাদে ডেকে উঠল—কড় কড় কড়!

সঙ্গে সঙ্গে দয়াল দেবতাদের চোখের জল আকাশ বেয়ে নেমে এল ঝম্ ঝম্ ঝম্!

৩

রেণুর কুসুম কোমল প্রাণে অতর্কিত আঘাতটা বড় গুরুতর লেগেছিল, কাজেই সে ধাক্কাটা রেণু কিছুতেই সামলে উঠতে পারলে না।

দীর্ঘদিনের চাপা জীর্ণ ব্যাধি হঠাৎ প্রকাশ পেয়ে তার দুর্ব্বল ক্ষীণ তনুখানিকে আরও ক্ষীণতর করে অল্পদিনের মধ্যেই শয্যাশায়িনী করে ফেল্লে। জননীর প্রাণান্ত চেষ্টা ও আগ্রহ সমস্তই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

রোগশয্যায় পড়ে রেণু সর্ব্বক্ষণ যেন কার আশায়, কার প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হ'য়ে থাকৃত। এতটুকু শব্দ শুনলেই চমকে উঠে বলত "কে বুঝি এল!—দেখ তো মা!" কিন্তু হারে অভাগিনী! মিছে-মিছে তোর এই আশাপথ চাওয়া!

দিনে দিনে হতাশ্বাস হ'য়ে শেষে আর থাকৃতে না পেরে রেণু একদিন লজ্জাসরম ত্যাগ করে মাকে বল্লে "কই, আজও তো কেউ এল না মা,—চিঠি কি তাঁরা পান নি?"

মেয়ের ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখে মা'র বুকখানা যেন শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। হায় হতভাগিনী! সে যে তার এই জীবনের আসন্ন সময় জীবনদেবতাকে একটীবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে অধীর উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে, অপরিতৃপ্ত ব্যর্থ জীবনের এই শেষ সাধটুকুও কি অপূর্ণই থেকে যাবে!

অসম্বরণীয় চিন্তাবেগ কষ্টে দমন করে রেণুর রক্তলেশহীন পাংশু মুখখানি আদরে চুম্বন করে মা ব্যথিত কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বললেন "আসবে বই কি মা, তোমার এতবড় অসুখের কথা শুনে না এসে কি থাক্‌তে পারবে? যত বড়ই পাষাণ হক। আজ মনে করছি গিন্নিমাকে বলে সতীশকে না হয় একবারটী কল্‌কেতায় পাঠিয়ে দেই, সে নিজে সঙ্গে করে জামাইকে নিয়ে আসুক,—কেমন?"

রেণু বালিসের তলায় মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ রোধ করে কান্না-ভাঙ্গা গলায় বল্লে "তবে তাই কর মা, মরণকালে যদি—যদিই একবার শেষ দেখা দেখতে পাই!"

পরদিন সারারাত বুকের বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করে ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে রেণু একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছে। অনিদ্রারক্ত নয়নে মা তখনও কাছে বসে আঁচল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে থেকে সতীশের পদশব্দ পেয়ে রেণুর ঘুম ভাঙ্গবার ভয়ে মা সন্তর্পণে উঠে এসে বল্লেন "কে সতীশ। এলে বাবা?" সতীশ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে "রেণু কেমন আছে মাসিমা?" "রেণু ভাল নেই বাবা, সারারাত যা ক'রে কেটেছে—হ্যাঁ বাবা! যার জন্যে গিয়েছিলে তার কি হ'ল? জামাইকে আন্‌তে পারলে না বুঝি?—হা ভগবান! মেয়েটা যে এদিকে এলনা এলনা করেই প্রাণ দিতে বসেছে!"

সতীশ রাগে দুঃখে মুখ কালো করে বল্লে "উঃ! মাসিমা, কি কসাইদের হাতেই মেয়ে দিয়েছিলে তুমি! এর চেয়ে রেণুটাকে হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেই তো আপদ চুকে যেত!

বাপরে বাপ! শাশুড়ী তো নয় যেন রায়বাঘিনী! ছেলেকে নিয়ে যাবার কথা বলতেই মাগী যেন তেড়ে কাম্‌ড়াতে এল। বলে কিনা বেয়ান কি কচি খুকী নাকি?—এই সময় জামাইকে নিতে পাঠালে কোন্ আক্কেলে? তা'র নিজেরটাতো যেতে বসেছে, তাই বলে আমার বাছাকে সেই সর্ব্বনেশে ছোঁয়াচে রোগের মুখে পাঠিয়ে দিই কোন্ প্রাণে বাপু? মাগীর আবদারও তো কম নয়!" এমনিধারা কত অকথা কুকথা শুনিয়ে দিলে যে মাসিমা, তা বলবার নয়। কি করি নেহাত মেয়েমানুষ বলে ছেড়ে দিলুম, নইলে সেই দণ্ডে জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দিলে মাগীর উপযুক্ত শাস্তি হ'ত।"

মা স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হ'য়ে রইলেন, তারপর ব্যগ্রতার সহিত আবার জিজ্ঞাসা করলেন "আর জামাই, তাঁর সঙ্গে দেখা—" সতীশ মাথা নেড়ে, সদুঃখে বল্লে "হয়েছিল বই কি? কিন্তু তার কথা জিজ্ঞাসা করো না, সেটা অতি অপদার্থ! আর তা না হবেই বা কেন বল! বড় লোকের ঘরের অকাল কুষ্মাণ্ড তো! মায়ের সামনে বাছাধনের মুখই ফুটলো না, আড়ালে এসে বাবু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন—"মার কথায় কিছু মনে করবেন না। আর তাদের বলে দেবেন যে আমি একটু সুবিধে পেলেই একবার গিয়ে দেখে আসব।"

অসহনীয় দুঃখে ক্ষোভে রেণুর মা কপালে করাঘাত করে বল্লেন "এ সব আমারই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বাবা, আমারই বুদ্ধির দোষে আজ এই বিপত্তি। আমি যদি নিজের অবস্থা বুঝে বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে একটা যেমন তেমন দীন দুঃখীর ঘরে দিতুম, তা'হলে আজ তো আমার সোণার রেণু এমন করে দগ্ধে দগ্ধে আপসে মরত না!"

মা না বল্লেও রেণু ভিতর থেকে সমস্তই শুনেছিল। তাই তার ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ জীবনী শক্তি, যেটুকু তৈলহীন দীপশিখার মত ক্রমেই নিস্তেজ নিষ্প্রভ হ'য়ে আসছিল, নৈরাশ্যের বিষম ফুৎকারে সেটুকু অচিরেই নিভে এল।

৪

আজ অবস্থা বড় মন্দ। সমস্তক্ষণ রেণুর থেকে থেকে কেমন আচ্ছন্ন ভাব এসে পড়ছিল। একটু জ্ঞান হ'লেই সেই একই কথা বলে "এখনো এলো না; আর বুঝি দেখা হ'ল না।"

জননীর ক্লান্তিহীন সতর্ক নির্নিমেষ দৃষ্টি সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রীটীকে সর্ব্বক্ষণ যক্ষের মতন আগলে রেখেছে, কিন্তু আর বুঝি ধরে রাখা যায় না।

আমার সুন্দর রেণুর শেষ বিদায় মুহূর্ত্তটুকুও কি সুন্দরতম, কি করুণ হ'য়ে ফুঠে উঠেছিল!

সেদিন কি তিথি জানি না, বর্ষায় ধোয়া নির্ম্মল নীল নিথর আকাশ আলো করে মস্ত বড় ঝক্ ঝকে চাঁদ উঠেছিল। রাশি রাশি মল্লিকা ফুলের মত শাদা ধবধবে জ্যোৎস্না, যেন দিশেহারা হ'য়ে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই জ্যোৎস্না-মুগ্ধ স্তব্ধ গগনতল মধুমাখা করুণ সুরে প্লাবিত করে দিয়ে মাঝে মাঝে বিরহিণী পাপিয়ার আবেগভরা আকুল তানটুকু যেন তার নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়ার উদ্দেশে দিকে দিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল। পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!"

চন্দ্রকরোদ্ভাসিত নির্জ্জন পথবীথি মুখরিত করে কে একজন নিশীথ রাতের পথিক মধুর সুকণ্ঠে গেয়ে গেল—

"পহিলা বয়স মোর না পূরল সাধে
পরিহরি গেলা পিয়া কোন্ অপরাধে!"

সেই যে কোন্ উপেক্ষিতার অপরিতৃপ্ত ব্যথিত প্রাণের করুণ আক্ষেপ ভরা গানের ক্ষুদ্র চরণ দু'টী মোহাবিষ্টা রেণুর অবসন্ন দীর্ণ বক্ষপঞ্জর মথিত করে তার জ্যোতিহীন ঝাপসা চোখ দু'টীতে শ্রাবণের ধারা নামিয়ে দিয়ে গেল। অশ্রুঅন্ধ চক্ষে, আকুল বিহ্বল হ'য়ে রেণু সেই দুঃখের গান শুনতে শুনতে অস্পষ্ট জড়িত স্বরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল "কোন্ অপরাধে,—ওগো নিষ্ঠুর দেবতা আমার!—কোন্ অপরাধে তোমার আশ্রিতা, চিরানুগতাকে চিরদিনের তরে পায়ে ঠেলেছ! একটীবার শেষ দেখা দিতেও এলে না!"
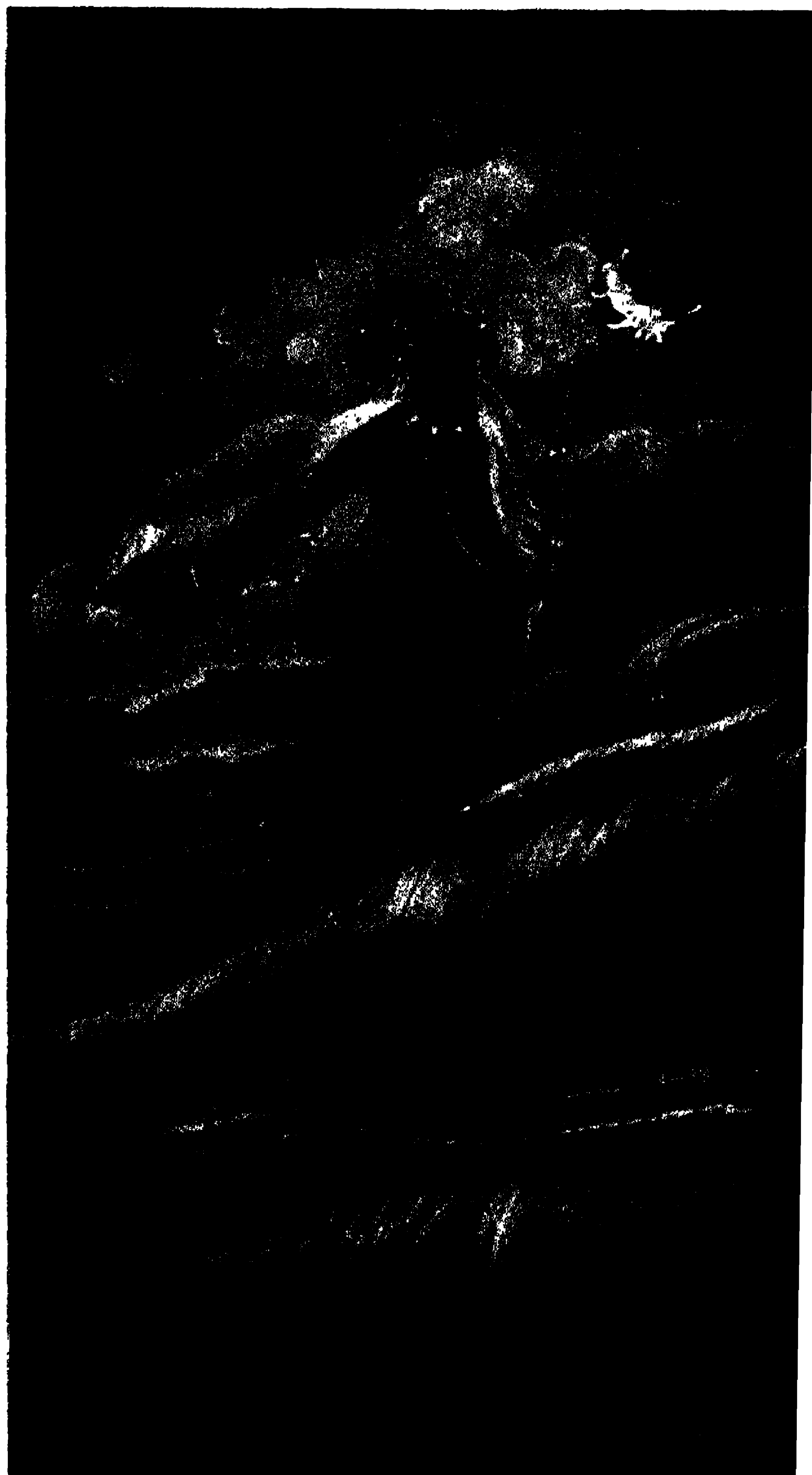
মা চমকে উঠে মেয়ের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন "রেণু! কি বল্‌ছ মা!" রেণু অনেক কষ্টে থেমে থেমে অশ্রুসজল করুণকণ্ঠে বল্লে "মা!" "কি মা!" "কই সে তো এল না,—আর যে দেখা হল না মা!" বল্‌তে বল্‌তে রেণুর চোখদুটী আবার যেন ঘুমের ঘোরে বুজে এল, মাথাটী ধীরে ধীরে মার কোল থেকে ঢলে পড়ল, কি জানি কিসের মোহে!

বাহিরে, মাধবী যামিনীর প্রাণ খোলা নির্লজ্জ হাসি তখনও তেমনি বাধাহীন, তেমনি অফুরন্ত! খানিকটা চাঁদের আলো জানালার ফাঁক দিয়ে বাঁকা হ'য়ে এসে রেণুর নিস্পন্দ দেহ-খানির উপর লুটিয়ে পড়েছিল, যেন সেই ব্যথা-হতা অভাগিনীকে এই দুঃখময় পাপের জগৎ থেকে তুলে নিতে কোনও করুণ-হৃদয়া দেববালা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন!

স্তব্ধ নিশীথিনীর নীরব অবিচ্ছিন্ন শান্তিটুকু ভেঙ্গে দিয়ে, আমার নির্জীব শরীর দেহ কণ্টকিত করে মুহূর্ত্তে নিনাদিত হ'য়ে উঠল শোকে বিহ্বলা মুহ্যমানা জননীর মর্ম্মভেদী আর্ত্ত হাহাকারে "ওমা রেণু! মাণিকরে আমার! তোকে রাজরাণী করতে তোর মা যে পথের কাঙালিনী হয়েছে রে! সে অভাগীর মুখের পানে একবার ফিরে চাইলি না রে মা!"

* * * *

রেণু আর নেই। দু'দিনের তরুণ অতিথি আমার দু'টী দিনের কোমল স্নেহ স্পর্শটুকু আমার কঠিন অঙ্গে চিহ্নিত করে, দুটী দিনের বিষাদ মাখা সকরুণ স্মৃতিটুকু দিয়ে, শুধু বুক-ভরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে চলে গেছে কি জানি কোন্ অদৃশ্য অজানার দেশে, আর তো সে ফিরবে না!

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এইখানেই নিষ্কৃতি দেয় নি। পরদিন গভীর রাতে আমার নির্জ্জন নিভৃত কোণে আবার—আবার এক নৃশংস নিষ্ঠুর দৃশ্য অভিনীত হ'য়ে গেল। সে দৃশ্য যেমন মর্ম্মান্তিক, তেমনি বীভৎস!

হতভাগিনী রেণুর মা একমাত্র সন্তান শোকে পাগলিনী হ'য়ে সারা দিন রাত এক বিন্দু জলও স্পর্শ করেন নি, তাই ও বাড়ীর গিন্নি সকাল সকাল তাঁর জন্মে খাবার নিয়ে এসে দেখেন না—সর্ব্বনাশ!

অসহ্য শোকের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অভাগিনী মা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে সকল দুঃখ ভুলেছেন, সব যন্ত্রণা জুড়িয়েছেন!

আমার ক্ষুদ্র আঙ্গিনার একটী পাশে নিমগাছের উচ্চ শাখায় রেণুর মা'র স্পন্দনহীন নির্জ্জীব দেহখানি শুষ্ক কাঠের মত শক্ত অসাড় হ'য়ে ঝুলছিল,—উঃ! সে মূর্ত্তি কি ভীষণ!

নিদারুণ মৃত্যু যন্ত্রণায় মৃতার সুগৌর মুখখানি একেবারে কালো ঝুল হ'য়ে গিয়েছে, চক্ষের ঊর্দ্ধমুখী তারা দু'টী, সুদূর দিগন্তে ঠিকরে গিয়ে যেন ঊর্দ্ধের সেই ন্যায়বান বিচার পতির চরণে

তা'র দুঃখ তাপক্লিষ্ট ব্যথিত প্রাণের অভিযোগ জ্ঞাপন করছিল। অনশন-ক্লিষ্ট পিপাসা-শুষ্ক, আড়ষ্ট রসনা যেন ক্রমাগত অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করতে করতে শিথিল অবশ হ'য়ে বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে সে মুখে হাত চাপা দিয়ে নিবারণ করতে আজ আর কেউ নেই!

আমার কাহিনী এবার শেষ হ'য়ে এল। সেই অবধি আমি নিঃসঙ্গ,—একা,—একেবারে নিছক একা।

কিন্তু তোমরা বল্লে বিশ্বাস করবে না, এখন রাত্রির পর রাত্রি আমার জনমানব শূন্য স্তব্ধ বুকের পরে সেই অতীতের শোকাবহ ঘটনাগুলির ব্যথা ভরা করুণ অভিনয় নিত্যই চলছে, তা'র আর বিরাম নেই, শেষ নেই!

নিস্তব্ধ নিঝুম নিশুতি রাতে, ক্লান্ত ধরণী যখন গভীর ঘুমের ঘোরে এলিয়ে পড়ে, আমার দিনের নিভৃত নীরবতাকে আরও জমাট করে তোলে, তখন সেই নিবিড় স্তব্ধতাকে স্পন্দিত, সজাগ করে দিয়ে বদ্ধ ঘরের তপ্ত বাতাসে গভীর হতাশার আর্ত্ত আকুল নিশ্বাস ঢেলে দিয়ে একখানি প্রতীক্ষমান করুণ প্রাণ যেন বুক ভাঙ্গা বেদনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে থেকে থেকে সারা দিয়ে ওঠে।

"সে তো এখনো এল না,—ওগো! আর যে দেখা হ'ল না!"

আবার কখনও বা আমার মৃন্ময় জড় দেহ ত্রাসে কম্পিত কণ্টকিত করে আমার নিশীথের সাথী পেচকের সুগম্ভীর বিকট কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে,—সেই দুঃখিনী অপত্যহারা শোকার্ত্ত মাতৃহৃদয়ের বুকফাটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ—

হু! হু! হু!

তিন পুরুষের কাহিনী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

মানুষের খেয়ালের অন্ত নাই। নহিলে অকস্মাৎ জুটমিল দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া যে একদিন ট্রেণে চড়িয়া বসিব, একথা কে ভাবিয়াছিল!

ছিলাম প্রায় চার-পাঁচ জন। উঠিলাম এক বন্ধুর গৃহে। বন্ধুটি মিলেরই একজন উঁচুদরের কর্ম্মচারী। তিনি মিলের সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন, আহার্য্য দিলেন, পানীয় দিলেন, ত্রুটি কোথাও রাখিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ।

হ্যাঁ, মিল বটে। প্রায় মাইল দুয়েক জায়গা জুড়িয়া যেন একটা নগর বসাইয়া দিয়াছে। বাবুদের বাসা, কুলিদের বাসা, রাস্তা, ঘাট, কলের জল, ইলেক্‌ট্রিক আলো কিছুই বাদ যায় নাই। একদিকে কয়েকটা বড় বড় হাতাওয়ালা বাংলো; সেগুলা শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের জন্য,—যেন একদল ব্রাহ্মণ নিজেদের শুচিতা বাঁচাইয়া দূরে ফলাহারে বসিয়াছে।

লোকেরও সংখ্যা নাই। ওখানে কয়েকটা বাঙ্গালীবাবু ছিন্ন মলিন বস্ত্রে টেবিলে বসিয়া হিসাব কষিতেছে, আর কয়েকটা কাণে পেন্‌সিল গুঁজিয়া কন্যাকর্ত্তার মতো ছুটাছুটি করিতেছে। সেখানে কয়েকজন মাথা গুঁজিয়া গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে চটের উপর নম্বর দিতেছে; দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ইহারা বুঝিবা একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। একদল মাদ্রাজী কুলি-রমণী দল পাকাইয়া সেদিক হইতে এদিকে আসিতেছে। সাহেব-বাবু-কুলী, স্ত্রী-পুরুষ, যেন একটা মেলা বসাইয়া দিয়াছে।

এই মিল! যেন একটা দৈত্যের বিরাট প্রাণস্পন্দনের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতেছে…

যেন একটা স্যাম্‌সন্ দগ্ধ চোখ দুইটা বুজিয়া শক্তির অহঙ্কারে শিকল বাজাইতেছে…

যেন একটা সমুদ্র অধীর গর্জ্জনে পৃথিবীর শিরায়-শিরায় নিজের প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিতেছে…

স্যাম্‌সনই বটে;—যেন একগাছি চুলের মধ্যে সমস্ত শক্তি লুকাইয়া রাখিয়া মহামানবকে দাঁত বাহির করিয়া ভেঙাইতেছে; বলিলাম,—বাঃ! এই বটে,—প্রাণস্পন্দনের গোমুখী!

বন্ধু হাসিলেন,—যেমন হাসে ভোরের বেলার পাণ্ডুর তারা—বলিলেন,—এই নয়, আরও আছে,—হাঃ, হাঃ, প্রাণস্পন্দনের গোমুখী!

সত্য। আরও আছে।

মিলের বাঁশী বাজিল,—বাঁশী তো নয়, যেন একটা ক্ষুধার্ত্ত শকুনের আর্ত্তনাদ!

ব্যাস্।

দৈত্যের প্রাণস্পন্দন থামিল…

স্যাম্‌সনের শিকলের ঝঞ্ঝনী বন্ধ হইল…

যেন ম্যাজিক!

খোলা গেট দিয়া হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ বাহির হইয়া আসিল। কা সর্ব্বনাশ! একটা মস্ত পিঁজরাপোলের দ্বার খোলা পাইয়া দলে দলে মুমূর্ষু জানোয়ার পৃথিবীর বুকের উপর শোভা-যাত্রা বাহির করিল না কি?

যেন কলের কোলে সমস্ত রস নিঃশেষে নিঙড়াইয়া দিয়া হাজার হাজার ইক্ষুদণ্ড মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

কী ভয়ানক! যেন চুষিয়া খাইয়াছে!

বলিলাম,—এরা আবার কারা?

বন্ধু উত্তর দিলেন না। দূরে গুটি পাঁচেক বাবলা গাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল; বন্ধু সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ দৃশ্য দেখা যায় না; চোখ জ্বালা করে।

বলিলাম, চল ঐ পুকুরটার ধারে একটু বসা যাক্ গে।

* * * *

ছোট্ট পুকুর। এদিকে বাঁধান ঘাট; ওদিকে কয়েকটা তালের গাছ পাখা নাড়িতেছে।

মন ভারি হইয়া গিয়াছে; যেন বর্ষার ভেজা হাওয়া।

কথা কওয়া যায় না।

কয়েকটা লোক নিঃশব্দে পুকুরে পা ধুইয়া চলিয়া গেল।—শুধু জলের শব্দ হইল খল্ খল্।

একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ী হাড় বাহির করা একশো বছরের বুড়ার মতো ফোকলা দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এদিকে—ওদিকে—সেদিকে কয়েকটা আশশ্যাওড়ার ঝোপ ভালুকের মতো জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতেছে।

চারিদিকে মাঠ; দূরে দু'দিকে দুইটা মিল, রণশ্রান্ত ষাঁড়ের মতো গর্জ্জন করিতেছে।

মাঠময় চাঁদের আলো বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে।

নিঃশব্দ।

* * * *

বন্ধু বলিলেন,—এই পুকুরের ইতিহাস,—শুনবে ?

কথা কহিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, শুনিব।

দূরের পোড়ো বাড়ীটার দিকে চাহিয়া বন্ধু বলিতে লাগিলেন :—একশো বছর আগে চারিদিকে যতটা দেখা যায়, এবং সম্ভবতঃ, যতটা দেখা যায় না তারও খানিকটা ছিল রায় বাবুদের জমিদারী। দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ; যাদের ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত।

তারও আগের ইতিহাস ? ঠিক জানিনে। তবে সে বোধ হয় ডাকাতি, কিম্বা লাঠির জোরের কাহিনী এমনি একটা কিছু হবে। তাদের রক্তে ডাকাতের বীজ আছে। তাতেই মনে হয়······

কিন্তু, সে যাক্।

একশো বছরের ইতিহাস,—ভালো জানা যায় না। ওই গাঁয়ের এক বুড়োর কাছে শোনা। তিন পুরুষের ইতিহাস সে জানে।

বলে, মিল তো সেদিনে হোল বাবু; সবাই দেখেছে। তখন এই সমস্তটা জায়গা ছিল জঙ্গল। দিনে লোকে যেতে ভয় পেত। তারও আগে ওখানে ছিল গাঁ। কতই বা লোক হবে! ঘর কতক তাঁতী, কয়েক ঘর চাষী, কিছু বামুন-কায়েত ভদ্রলোক। চারিদিকে মাটীর ঘর, খড়ের চাল, মধ্যিখানে বাবুদের প্রকাণ্ড বড় রাজবাড়ীর মতো বাড়ী। কিছুই তো রইল না বাবু ; রইল শুধু বাবুদের ওই জিরজিরে একটুকরো দালান আর ওই খিড়কীর পুকুরটুকু।

বন্ধু চুপ করিলেন।

রাত্রির কালো জলের উপর ঢেউয়ের লীলা ;—বেশ লাগে।

ভাবিলাম, তাই বটে! চারিদিকে পাঁচীল-ঘেরা ছোট্ট একটুখানি খিড়কীর পুকুর। হয় তো তখন ছিল পদ্মফুলে ভরা। বাবুদের বাড়ীর সুন্দরীরা হয় তো ওইখানে বুক ডুবাইয়া বসিতেন। কোটি কোটি পদ্মের পরাগকণা ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে বুকে আসিয়া স্পর্শ করিত। খিড়কীর পুকুর ; লজ্জাই বা কি, মাথার-বুকের কাপড় যদি খুলিয়াই যায়। হয় তো, ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো খুকীরা ঘড়া নিয়ে ওই অতদূর অবধি সাঁতারও দিত। এই যে ঘাট, ইহার উপর আলতা-পরা কতগুলি চরণ পদ্মফুলের মতো শোভায়-শোভায় ফুটিয়া উঠিত, কে জানে। এই আলিস, হয় তো সন্ধ্যার সময় চাঁদিনী রাত্রে ইহারই উপর বসিয়া কচি কচি বধূগুলি চুপে চুপে গত রাত্রের গল্প করিত। হয় তো, অনেক কথা শুনিয়াছে, এই

ফুলে ভরা লেবুগাছটি। সেদিনও হয় তো এমনি করিয়া ইহার ফুলগুলি নিঃশব্দে বধূগুলির কবরীর উপর ঝরিয়াছিল। অতি মমতায়, সন্তর্পণে তাহার দুইটা পাতা স্পর্শ করিলাম।

* * * *

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর সেই বাবুরা!

—সেই কথাই বলব; বাবুদের শেষ তিন পুরুষের ইতিহাস। বলিয়া একটু থামিয়া বন্ধু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—

শেষ দুর্দ্ধর্ষ জমিদার বলতে হোলে ব্রজেন্দ্র বাবুকেই বলতে হয়। লম্বা-চওড়া চেহারা, ফুট্‌ফুটে রং, গোঁফ দাড়ি কামানো। দুটি পাতলা ঠোঁট দৃঢ় সম্বদ্ধ, উন্নত ললাট। বুড়োর কাছে শুনেছি।

বুড়ো বলে, এমন গোঁয়ার দেখিনি, বাবু। জ্যান্ত মানুষ থামের সঙ্গে গেঁথেছে।—চুপি-চুপি বলে; এখনও তার ভয় যায় নি।

শিহরিয়া উঠিলাম!

—জ্যান্ত মানুষ থামের সঙ্গে গেঁথেছে কি?

—তাই গেঁথেছিল। কিন্তু, তাতে চমকাবার কিছুই নেই। সেকালে এমন ঘটনা বিরল ছিল না। বলতো, প্রজা শাসন না করলে জমিদারী চলে না। ব্যাপার এমন কিছুই নয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ে। একটি ছোকরা, বোধ করি সে কলকাতায় পড়ে birth rightএর সন্ধান পেয়েছিল। গ্রামে ফিরে এসে প্রজাদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে সুরু করলে। বল্লে, জমিদারের মেয়ের বিয়ে, তাতে প্রজা কেন তার খরচ বইবে? প্রজার মেয়ের বিয়ে হ'লে জমিদার তার খরচ বয়? জমিদার তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে খুন করে একদম থামের সঙ্গে গেঁথে ফেলে।

আবার কেউ বলে.....কিন্তু, সে থাক্ গে, সে একটা অবৈধ প্রেমের কাহিনী, যার সঙ্গে জমিদার দুহিতার না কি সংস্রব ছিল।

মোট কথা, এরই ফলে জমিদারের অর্দ্ধেক সম্পত্তি বন্ধক গেল। তা যাক, কিন্তু সম্পত্তি দিয়ে পাপ ঢাকা পড়ল। পুত্র-হারার চোখের জল? দুনিয়ার ক'ত হতভাগ্যের চোখের জল অহর্নিশি ঝরছে তার সন্ধান রাখতে গেলে পাগল হ'য়ে যেতে হয়।

সম্পত্তি অর্দ্ধেক গেল, কিন্তু চাল সমানই রইল; বরং মেকিকে আসল বানাতে গিয়ে মাজা-ঘষা বেড়েই গেল। ফাঁকির বাজারেই তো আড়ম্বরের রেওয়াজ বেশী। নইলে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক থাকে না।

বল্লাম না, এদের রক্তে ডাকাতের বীজ আছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু ছিল যেন সে যুগের মোগল বাদশা;—সে যেন হুকুম করবার জন্যেই জন্মেছিল।

তার বড় বড় টানা টানা চোখ, আর পাতলা দুটি ঠোঁটের সামনে দাঁড়িয়ে অতিবড় দুঃসাহসীরও ঠোঁট বন্ধ হ'য়ে যেত ;—এমনই রাশভারী।

কেনারাম মণ্ডলের ছেলে কলকাতায় পড়তে গিয়ে ইংরিজি চুল ছেঁটে এল। ব্রজেন্দ্রবাবু কেনারামকে সদরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন,—বাবু, তোমার ছেলেটি কোথায় ?

কেনারাম পুত্র-সৌভাগ্যের গর্ব্বে উল্লসিত হ'য়ে বাবুকে প্রণাম করে বললে,—আজ্ঞে, তাকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছি। তার মুখের যদি ইংরিজি শোনেন, বাবু......

এতগুলি কথা এক সঙ্গে বাবুর সামনে বলবার সৌভাগ্য কেনারামের কখনও হয় নি।

বাবু মধ্য পথে থামিয়ে বল্লেন,—সে আর একদিন হবে বাবু। আপাততঃ তার মাথাটা কামিয়ে দাও ; আর ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কৃষিকর্ম্মে লাগাও।

কেনারাম তো অবাক্ !

তার ইচ্ছে ছিল, জিজ্ঞেস করে, কেন ? কিন্তু বাবুর চোখের পানে তাকিয়ে যেন সংস্কারের বশে বল্লে, যে আজ্ঞে।

—যাও, এই জন্যই ডেকেছিলাম।

* * * *

তারপরে সুরু হোল ভাঙ্গন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর ছেলে মহেন্দ্রবাবু। কিছুদিন কলেজে পড়েছিলেন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধেও তাঁর পড়া ছিল। পড়া ছিল বল্লে কম বলা হয়, দুনিয়ার ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল।

যেন ভুলে এই বংশে জন্মেছিলেন ;—বিধাতার ভুল। বাপের মতো টানা-টানা চোখ,—উজ্জ্বল, তেজস্বী ; কিন্তু ঠোঁট দুটিতে সরলতা মাখানো ;—আশ্চর্য্য সম্মিলন !

পড়াটা ছিল তাঁর রোগ বল্লেই হয়। তাই ছেলের পড়ার দিকেই তাঁর দরদ ছিল বেশী।

এইটেই তাঁর জীবনের ট্রাজেডি।

বেশীদিনের তো কথা নয় ! সবাই জানে, কি খরচটাই তিনি করেছিলেন, এই একটি মাত্র ছেলের পেছনে।

এখন তিনি থাকতেন কলকাতাতেই। কিছুদিন আগেই গ্রামে এমন ম্যালেরিয়া সুরু হয় —যে, গ্রাম উজাড় হ'য়ে গেল। যা দু'চার ঘর ছিল, কেউ এখানে কেউ সেখানে পালিয়ে বাঁচল। জমিদার চলে গেলেন কলকাতায়। তার পরে, না ফিরে এলেন তিনি, না এল তাঁর প্রজারা।

মাটীর ঘর দু'দিনের অনাদরেই ঝুর ঝুর করে মাটির বুকে ঝরে পড়ল। বাবুদের দালান ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হ'য়ে যেতে লাগল। আজ আর বোঝাও যায় না, এখানে ছিল গ্রাম।

যেন উপকথা! যেন মরণ কাঠির স্পর্শে এক মুহূর্তেই সমস্তটুকু মরে গেল। জীয়ন-কাঠি? —কে জানে?……সে দরদী কই?

*   *   *   *

ঋণ ক্রমে বেড়েই চলে; যেন আসলের নাগাল ধরতে রেস দিচ্ছে।

দুর্ভাবনায় মহেন্দ্রবাবুর রক্ত মগজে ওঠে; রাতে ঘুম হয় না। হায় রে, তবু কাউকে মুখ ফুটে বলবার পথ নেই,—মানুষের সম্ভ্রম এমনি ঠুন্‌কো; হাওয়ার ভারে মাটিতে নেতিয়ে পড়ে। এই তো জীবনের ট্রাজেডি! বুক ফেটে যায়, তবু কাঁদবার উপায় নেই;—যেন চোরের মা।

ছেলে বলে, বাবা, আজকে হেডমাষ্টারের farewell; আমি চাঁদার খাতায় দশ টাকা সই করে এসেছি।

বাপের বুক কেঁপে ওঠে। তবু ছেলের মাথাটিকে বুকের কাছে টেনে বলেন—বেশ তো, নিয়ে যেও।

হায়রে বলা কি যায়! এই চারু, সুকুমার, লাবণ্য-ঢল-ঢল শিশুকে বলা কি যায়, যে নেই, টাকা নেই! দুঃখের আগুনের স্পর্শ থেকে একে তো বাঁচাতেই হবে! সোণার চেন বাঁধা যদি যায় তো যাক্। সে সইবে খুব;—সইবে না এই অফুটন্ত পুষ্পকোরকটিকে তপ্ত কড়ায় ছেড়ে দেওয়া। না, না, না, বাপের প্রাণে সব সইতে পারে, কিন্তু একমাত্র পুত্রকে দুঃখ দেওয়া তার সইবে না।

পাওনাদার আসে,—বলে,—আরতো পারা যায় না মহেন্দ্রবাবু, সুদ যে আসলকে ছাড়িয়ে যায়।

মহেন্দ্রবাবু মহাসমাদরে তাকে পাশে বসিয়ে বলেন,—যাক্ না ছাড়িয়ে, দেখি কতদূর ছাড়ায়। এমনই কি বেশী হয়েছে সুদ?

পাওনাদার চোখ কপালে তুলে বলে,—বলেন কি মশাই? আপনার জমিদারী বেচলে কত দাম হবে জানেন?

শিউরে ওঠেন মহেন্দ্রবাবু! জমিদারী বেচলে? কি বলে ও! কত দিনের কত পুরুষের রক্ত দিয়ে তৈরী এই জমিদারী, এ যাবে পরের হাতে, ঋণের দায়ে? কত দাম এই জমিদারীর? হাসিও আসে। মাথায় পাগড়ী বেঁধে সুদের সুদ আদায় করা যার পেশা, জীবনটা যে টাকা-আনা-পাই দিয়ে হিসেব মিলিয়ে রেখে দিয়েছে, সে জানবে জমিদারীর দাম! এ কথার উত্তর নেই।

পাওনাদার বলে, শোধ করবার ইচ্ছে যদি থাকতো মশাই, তা'হলে চাল কমিয়ে ঋণের আল বাঁধতেন। ঋণে যার গলা ডুবে, তার মোটরে চড়ে হাওয়া খাওয়াও মানায় না, ছেলের পেছনে তিনটে মাষ্টার রাখাও মানায় না।
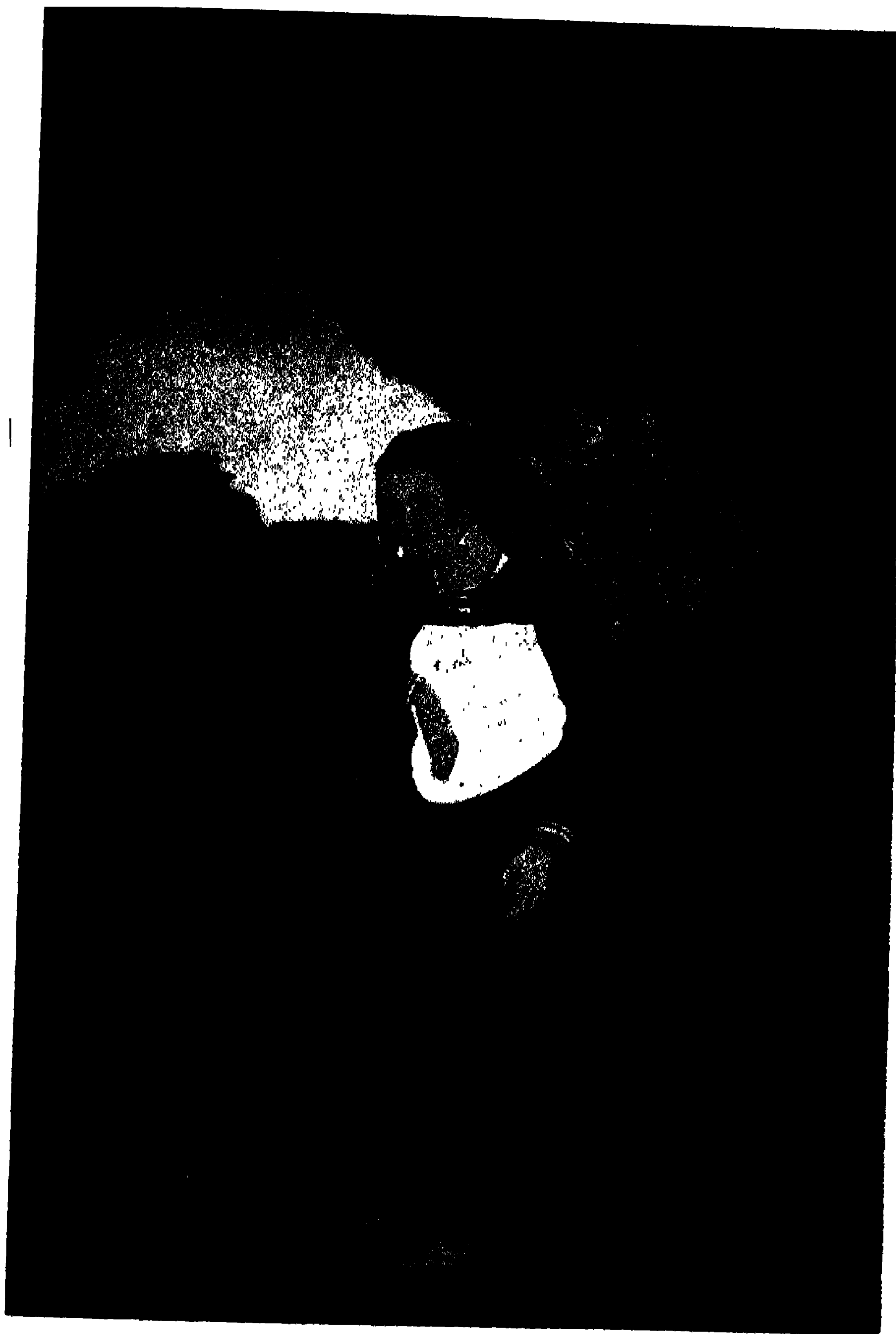
দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে! যা মনে আসে তাই যে বলে এ!

তাই তো বলে। বলে, যা ভালো বোঝেন করুন। আমি আরও মাস দুই অপেক্ষা করব। তারপরে……

বুক জ্বালা করে,…কাঁদতে ইচ্ছা হয় ··

কোথায় অশ্রু! দু চোখে ডাকাতির আগুন ঝলকে উঠে! যেন শুকতারাতে আগুন লেগেছে।

একটু পরেই হাসি আসে। মনে-মনেই বলেন,—অতি ছোট এরা। এদের ওপরও রাগ করে! এদের ছোঁয়া লাগলেও মন অশুচি হয়ে যায়।

গায়ের জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলে বেয়ারাকে দিয়ে দেন। বলেন, এগুলো তুই পরিস্, আর ওই চেয়ারটা·· চেয়ারটাকে…যা' হয় করিস্…ওটাকে জ্বালিয়েই ফেলিস।

* * *

গৃহিণী বলেন, তুমি দিন-দিন কি হয়ে যাচ্ছ?

মহেন্দ্রবাবু হাসেন, যেন ঝরা-গোলাপের পাপড়ি। বলেন, কি হয়ে যাচ্ছি?

—তা কি টের পাওনা? চোখের কোণে কালি পড়েছে, রং হয়েছে ফ্যাকাসে। তোমার পানে চাওয়া যায় না। যতই দেখ্‌ছি, বুকের রক্ত যেন জল হয়ে যাচ্ছে। কেন অত ভাব?

কান্নায় স্বর অবরুদ্ধ হয়ে আসে।

আদর করে কাছে টেনে এনে মহেন্দ্রবাবু বলেন,—কিছু ভাবিনে, কিছু হইনি, তোমার মিথ্যে ভয় সুরমা, আমি বেশ আছি।

—ওগো, আমায় মিথ্যে আশ্বাস দিও না। ফাঁকি দিয়ে আমার চোখ এড়ান যায় না। কি তোমার দুঃখ আমায় বল।

হায়রে, দুঃখের কি সীমা আছে;—সমুদ্র। কোনটা বলবেন, কোন্‌টা বলা যায়। তবু আনন্দে মহেন্দ্রর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

—বল, আমায় বল, কোথায় তোমার ব্যথা! ঋণের কথা ভাব? কত সে ঋণ? আমার গহনাগুলো যদি……

এবারে হাসি আসে! মনে মনে মহেন্দ্রবাবু বলেন, ওগো কত তোমার গহনা, কতই বা তার দাম! সমুদ্র বোজাতে চাও মুঠো-মুঠো বালু দিয়ে! মহেন্দ্রবাবু চুপ করেই থাকেন।

কিন্তু যার চোখের সামনে স্বামীর দেহ দিনে-দিনে তিলে-তিলে শুকিয়ে যায়, চুপ করে কি তাকে এড়ান যায়! সুরমা ছাড়েন না, বলেন,—তাতেও শোধ যাবে না? চুপ করে থেকো না। আমার কথার উত্তর দাও

—তুমি কেন ব্যস্ত হও, সুরমা। আমি সেজন্যে মোটে ভাবিনে। সে ঠিক হয়ে যাবে অখন।

সুরমা তবু ছাড়েন না, বলেন,—হ্যাঁ, ঠিক হবে,—ছাই ঠিক হবে। আমি জানি, আমার কপাল ভাঙবে। না, না, সে হবে না। তুমি যে আমারই চোখের সুমুখে দিন-দিন শুকিয়ে যাবে, সে হোতে দোব না। যেমন করেই হোক, ঋণ শোধ দিতেই হবে।

নারীর সরলতায় হাসি আসে। বলেন,—কিন্তু, সে কি করে শুনি।

মাথা দুলিয়ে সুরমা বলেন,— সে আমি জানিনে। কিন্তু, যেমন করেই হোক ;—সর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়েও।

মহেন্দ্র দুষ্টুমির হাসি হেসে বলেন, আমার সর্ব্বস্ব বলতে তো তুমি। কিন্তু, তোমাকে বাঁধা দেবার জায়গা…

লজ্জায় সুরমার মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠে,—পঞ্চদশী নববধূর লজ্জা। বলেন,—যাও। আমি নাকি তাই বলছি। আচ্ছা, জমিদারী…

আর্ত্ত কণ্ঠে মহেন্দ্র বাবু বলেন,—জমিদারীর কি করতে বল ?

অস্ফুট স্বরে সুরমা বললেন,—যদি বিক্রি…

মহেন্দ্র বাবুর চোখে আবার আগুন জ্বলে ওঠে।

ভয়ে-ভয়ে সুরমা বলেন,—ওগো, তুমি রাগ কোরো না। জমিদারী দিয়ে যদি তোমায় ফিরে পাই, সেই আমার ঢের। আমার আর কে আছে। সুরমার চোখ ছাপিয়ে হু হু করে অশ্রু ঝরে।

মহেন্দ্র বাবু শান্ত কণ্ঠে বলেন,—খোকা বুঝি এল সুরমা। তার খাবার দাও গে।

* * * *

কারো দুঃখ কেউ বোঝেন নি। সুরমা বোঝেন নি কোথায় স্বামীর ব্যথা ; মহেন্দ্রও বোঝেন নি কোথায় সুরমার ব্যথা।

এমনি ভুল বোঝার মধ্যে দুজনের মাঝে বেড়ে ওঠে ব্যবধান।

আর খোকা ? সে কারও দুঃখই বোঝে নি। তার আবদার সমানে চলেছে। হুহু করে জলের মতো টাকা খরচ।

* * * * *

সেদিন দোল পূর্ণিমা। রঙের ধুম লেগেছে।

খোকা মুঠো-মুঠো আবীর নিয়ে বাপের জামা-কাপড় রঙে ভরিয়ে দিচ্ছিল। রঙই দিচ্ছে, রঙই দিচ্ছে, যেন রঙ দেওয়ার আর শেষ নেই।

হঠাৎ দোরের পর্দা ফাঁক করে সুরমা ডাকলেন—খোকা। বলেই চলে যাচ্ছিলেন।

কিছুদিন থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে কথা বন্ধ।

কি মনে হোল, মহেন্দ্রবাবু দোরের কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে ডাকলেন,—শোন।

মুখ না ফিরিয়েই সুরমা বললেন,—বল।

গলার স্বর নামিয়ে মুখে হাসি এনে মহেন্দ্র বললেন,—আজকে দোল।

—সে জানি,—বলেই সুরমা চলে গেলেন।

হতভম্বের মতো মহেন্দ্র তার প্রতিধ্বনি করলেন,—সে জানি। দোরের কাছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ, শেষ, শেষ!……

সুরমাও তার কাছ থেকে সরে যেতে চায়। পোনের বছরের দোলও পথের মধ্যে এমনি করে হঠাৎ থেমে যায়,—এমনি দুনিয়া!

আস্তে আস্তে মহেন্দ্রবাবু তাঁর আসনে এসে বসলেন।

পোনের বছরের পোনেরটি দোলপূর্ণিমার স্মৃতি……

জমিদারী… জমিদারী…জমিদারী। সকলের নজর পড়েছে এই জমিদারীর ওপর; পাওনা-দারেরও, সুরমারও। দাঁতে দাঁত টিপে মহেন্দ্র বললেন, কিন্তু একে বাঁচাবোই সকলের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে।

খোকা বললে, মাথা নামাও না, বাবা। আমি তোমার মাথায় রঙ দিতে পারছি নে যে।

বাইরে পায়ের শব্দ হোল।

মহেন্দ্র শক্ত হয়ে বসলেন। আপন মনে বললেন, আসুক সুরমা। দোলের স্মৃতি আমিও ভুললাম।

পর্দ্দার ফাঁকে উঁকি দিল একযোড়া গোঁফ।

পাওনাদার কৃতার্থের মতো হেসে বললে,—খবর দিয়ে আসিনি,—পাছে বলে পাঠান, বাড়ী নেই।

তবে সুরমা নয়। মহেন্দ্র ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। কি বলে এ!

পাওনাদার বলতে লাগল,—জগুিস সাহেবের সঙ্গে কথা কয়ে এলাম। তিনি জুটমিল খুলতে চান, এ খবর সত্যি।

—বাঁচা গেল। কিন্তু, আমায় কি করতে বলেন?

—তিনি আপনার জমিদারীটা কিনতে রাজি হয়েছেন। সাতলাখ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছেন, আরও লাখখানেক টেনে টুনে উঠতে পারেন।

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারের দুটো হাতা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরলেন।

—এর চেয়ে বেশী দাম আপনি যতই চেষ্টা করুন পাবেন না। কি বলেন, আমি কথা দিয়ে আসি।

আঘাত…আঘাত…আঘাত…

তাকে নিতান্ত অসহায় পেয়ে অতি ছোট যে সেও আঘাত দেবার স্পর্দ্ধা পেয়েছে! কিন্তু আঘাত সওয়ারও সীমা আছে।

—একটু বসুন, আমি আসছি।

মিনিট দশেক পরে মহেন্দ্রবাবু ফিরে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গোটাকয়েক পিস্তলের আওয়াজ হোল।

খোকা আর্ত্তনাদ করে উঠল।

দাস-দাসী, লোকজন ছুটে এসে দেখলে, সেই ধূমাকীর্ণ ঘরের দুকোণে দুজনের দেহ ছট্‌ফট্ করছে।

ভলকে ভলকে রক্ত,ঘর ভেসে যায়…

* * *

কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম জানি না। কাছে এবং দূরে কোনও শব্দ নাই।

শুধু দূরে দুদিকে দুইটা মিল নিঃশব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতেছে।

পুকুরের নিস্তব্ধ জলে একটা ব্যাং লাফাইয়া পড়িল—টুপ্।

বলিলাম, চল, ওঠা যাক্।

* * *

নিঃশব্দে দুজনে পথ চলিতেছি।

হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর খোকা?

বন্ধু চমকাইয়া উঠিলেন,—কে খোকা?

—খোকা আজও বেঁচে আছে?

—এই মিলেই চটের ওপর নম্বর দেয়।

বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল…

আজও বুঝি দোল। কুলীদের মধ্যে এখনও দোলের উন্মত্ত কদর্য্য কোলাহল থামে নাই। এক বৎসরের দোল এক দিনেই ইহারা বুঝি খেলিয়া লইতে চায়।

একদল কুলিবালক নিরীহ ভালোমানুষ ভাবিয়া আমাদের গায়ে রঙ দিতে ছুটিয়া আসিল। বোধ করি বন্ধুকে দেখিয়াই অকস্মাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। "বাপ্‌পা হো, বড়াবাবু" বলিয়াই চীৎকার করিয়া যে যে-দিকে পারিল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল। শুধু একটা বছর দশেকের ছেলে

দুই হাতে নর্দমায় ভেজান ন্যাকড়া লইয়া বুঝি সঙ্গীদের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম,—এইও বাচ্চা, রঙ মৎ দেনা।

ছেলেটি তাহার বড়-বড় টানা চোখ দুইটা মেলিয়া বলিল,—আমি তোমার গায়ে রঙ দিই নি।

বা রে! বাংলা বলে!

অকস্মাৎ পিঠের উপর একটা ন্যাকড়া পড়ল;—কি দুর্গন্ধ! ছেলেটি কদর্য্য চীৎকার করিতে করিতে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

বন্ধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ওটি খোকার ছেলে।

স্বামীর বুকে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

এক
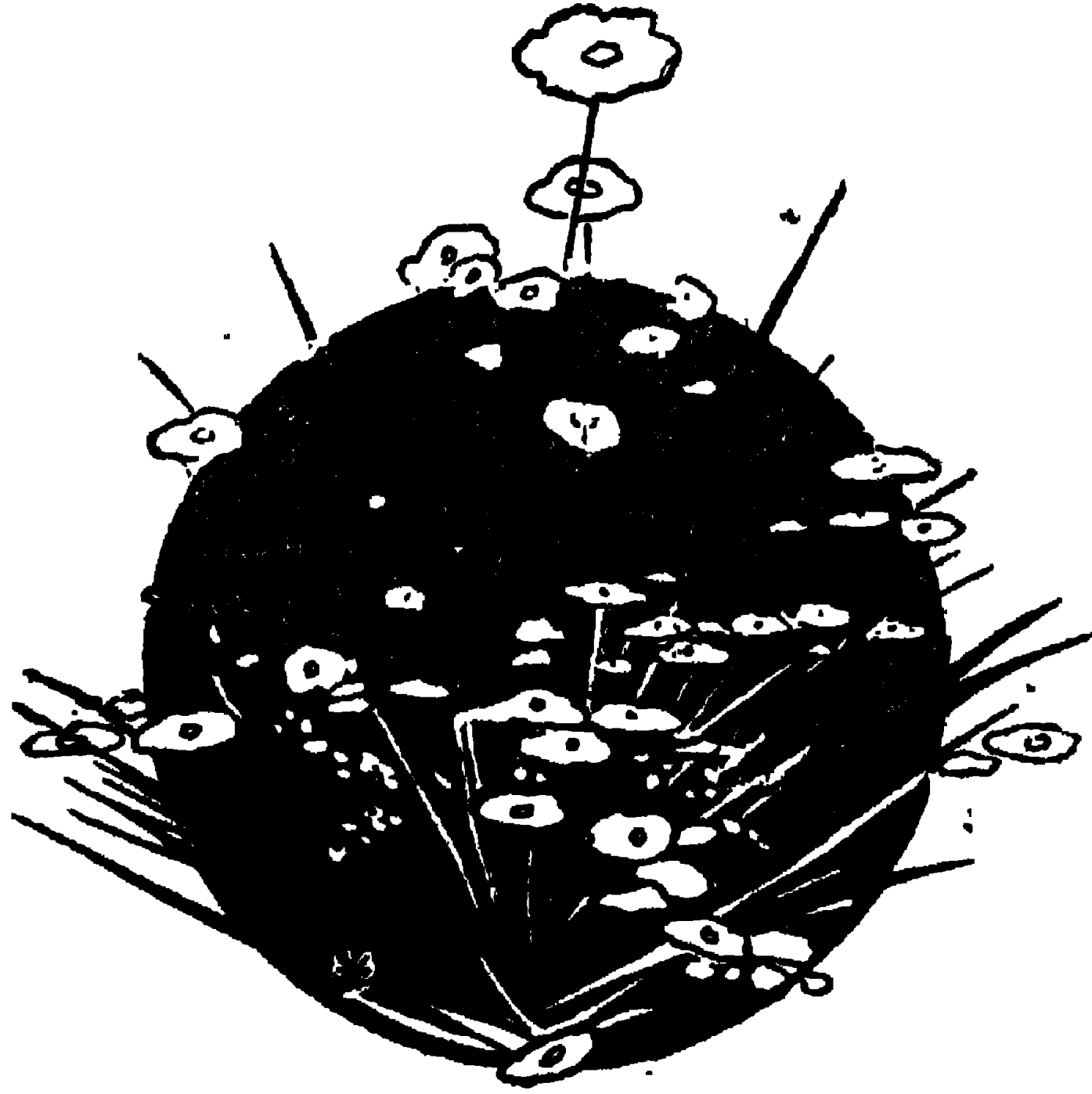
স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিয়া মেয়েস্কুলের গাড়ীটা যখন নির্ম্মলের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া চলিয়া যাইত তখন কোন মতেই সে আর নিজেকে বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ রাখিতে পারিত না। দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে ইহাও তাহার জীবনে এম্‌নি নিত্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের সে যতবার চেষ্টা করিয়াছে প্রতিবারেই তাহার নিষ্ফলতা জয়ী হইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। বন্ধুমহলেও কথাটা প্রচার হইতে বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু যে নেশা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রতিদিন ঠিক একই স্থানে একই সময়ে টানিয়া আনিত সে তীব্র নেশা সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই। সে শিক্ষিত, সে বুদ্ধিমান; তাহার শিক্ষিত অন্তঃকরণ ইহার কুৎসিত দিকটা তাহাকে বারংবার কাণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে কিন্তু এই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু যে কেমন করিয়া তাহার সমস্ত সাধু চেষ্টাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে ইহা সে তাহার সমস্ত বুদ্ধি দিয়াও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মানুষ যে কত দুর্ব্বল, তাহার সমস্ত দম্ভ ও অহঙ্কারের মূল্য যে কতটুকু এই তুচ্ছ ঘটনা হইতে সে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাই পরাজয়ের সমস্ত অপমান সহ্য করিয়া গাড়ীর আওয়াজে প্রতিদিনই সে বাহির হইয়া আসে, কোনদিন কোনও কারণে ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু চিরদিন সে এম্‌নি ছিল না। গাড়ীর শব্দ, বিপুল জনতার অসহ্য কলরব কোনদিন তাহাকে তাহার পড়িবার ঘর হইতে বাহির করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ তাহার সে নিষ্ঠা কোথায়? ছাত্রজীবনের যে কঠোরতা পালন করিয়া একদিন সে নিজেকে কর্ত্তব্যপরায়ণ মনে করিয়াছে আজ তাহার সে শক্তি কোথায়? কে তাহার একনিষ্ঠ জীবনে চাঞ্চল্যের স্রোত বহাইয়া দিল? কে আজ তাহাকে নূতন নেশায় মাতাইয়া তুলিল?

শহরের এক রঙ্গালয়ে সেদিন সে তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে আরো দু'একটা অভিনয় সে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেখিয়াছে কিন্তু একটা কাল্পনিক

বস্তু যে এমন বাস্তব হইয়া মানুষকে আকুল করিতে পারে ইহা সে কোনদিন অনুভব করে নাই। হঠাৎ কিসের আঘাতে তাহার সে তন্ময়তা ভঙ্গ হইয়া গেল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, একটী তরুণী অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাহারই পার্শ্বস্থিত একটী ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, কিছু মনে করবেন না, ছড়িটা তুল্‌তে গিয়ে আমার ভাগ্নিটী আপনাকে আঘাত করে ফেলেছে। নির্ম্মল ততোধিক বিনীতভাবে কহিল, এর জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, এমন হয়েই থাকে। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, ইহাতে অপরাধীর লজ্জা এতটুকু কমিল না, বরং অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া তাহার সমস্ত মুখখানি এক অপরূপ রঙে রঙীণ হইয়া উঠিল। ইহা অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ বস্তুটীই সে রাত্রের ঐ চিত্তাকর্ষক নাটকের বাকিটুকু আর নির্ম্মলকে তন্ময় করিতে পারিল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল যে, আর একবার সে ফিরিয়া দেখে, কিন্তু ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া পিছন ফিরিয়া এই নারীর ঐ মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিতে সে কোন মতেই সমর্থ হইল না। অভিনয় শেষে সকলে যখন স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন আর একবার সে তাহাকে দেখিয়া লইল এবং নারীর যে রূপটার সহিত এতদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই আজ তাহারই সে যেন একটা নমুনা পাইল। বাড়ী ফিরিয়া এত রাত্রেও সে আজ ঘুমাইতে পারিল না—একটা নূতন চাঞ্চল্য তাহার সমস্ত দেহ ও মনকে এম্‌নি অভিভূত করিয়া ফেলিল যে কিছুতেই সে শান্ত হইতে পারিল না। ভোরের দিকে কখন যে তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হইয়া তাহাকে সুপ্তির ক্রোড়ে ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই ; যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন একটা গভীর অবসাদে তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে ; এবং উষার যে নবীনতা মানুষকে আবার সজীব করিয়া তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া তুলে ইহার সে শক্তি আজ যেন হ্রাস হইয়া গিয়াছে। অন্যদিনের মত আজ আর তাহার পড়িবার উৎসাহ ছিল না তাই ছাদের ভাঙ্গা বেঞ্চিটার উপর সে শুইয়া পড়িল, এবং ক্লান্তিতেই, বোধ করি, প্রভাতের নির্ম্মল বাতাসে পুনরায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

চায়ের সময় নির্ম্মলকে দেখিতে না পাইয়া তাহার জননী কহিলেন, হাঁরে শিবু, আজ তোর দাদা কোথায় ?

শিবু কি একটা কাজে ছাদে গিয়াছিল তাই কহিল,—দাদা যে ছাদে ঘুমুচ্ছে।

এখনও ঘুমুচ্ছে ? কেন ? এই বলিয়া তিনি ছাদে আসিয়া দেখিলেন যে শিবুর কথাই সত্য। ভাঙ্গা বেঞ্চিটায় হাতের উপর মাথা রাখিয়া নির্ম্মল অসাড়ে ঘুমাইতেছে, আর রৌদ্র তাহার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি শশব্যস্তে তাহার মাথাটা নাড়া দিয়া কহিলেন, ওঠরে, বেলা হ'য়ে গেছে ; এই রৌদ্রে কি করে শুয়ে আছিস্ ?

মাতার আহ্বানে নির্ম্মলের ঘুম ভাঙিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল,—উঃ, এত রোদ হ'য়ে গেছে, কেউ আমায় ডেকে দেয়নি!

কি করে জান্‌বো বল্? শিবুর কাছে শুন্‌লুম তুই ছাদে ঘুমুচ্ছিস্, তাই ত আমি ছাদে এলুম। কা'ল কি তুই রাত্রে ঘরে এসে শুস্‌নি?

নির্ম্মল ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাই চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে সে যাহা বলিল তাহা তাহার জননীর বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি পুত্রের কপালে হাত দিয়া কহিলেন, তোর তো জ্বর হয় নি? চোখদুটো এতো লাল কেন? ইহারও সে কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। এবং কেন যে ঘরের পবিবর্ত্তে সে ছাদে আসিয়া শুইয়াছিল, এবং কেন যে তার চোখদুটা এতো লাল হইয়া উঠিয়াছে এসব প্রশ্নের উত্তর সে জননীকে দিতে পারিল না। কিন্তু নীচে আসিয়া আর্শিতে নিজের মুখ দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সত্যিই ত চোখদুটা তাহাব অত্যন্ত লাল! তাহার মনে হইল সারারাত্রি ধরিয়া সে যেন মদ খাইয়াছে এবং তাহার নেশা যেন এখনও ছোটে নাই।

কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি সে স্নানাহার সঙ্গে করিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন যে বস্তুটী তাহার চোখের সম্মুখে পড়িল, তাহা তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য গভীর বিস্ময়ে নিমজ্জিত করিল। ইহা সত্য, না তাহার নিদ্রাবিহীন রজনীর খেয়াল ইহা সে হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। গাড়ীর আওয়াজে যখন সে বুঝিল ইহা সত্য—সত্যই গত রাত্রির সেই মামার ভাগ্নিটিই স্কুলের গাড়ীর প্রথম আরোহী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন বিহ্বলের মত সে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল এবং কখন্ যে গাড়ীখানা তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল ইহা সে এতটুকু জানিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল এবং এই ছোট্ট মেয়েটা যে এত শীঘ্র তাহাকে এম্‌নি অভিভূত করিয়া ফেলিল ইহার জন্য নিজেকে সে বারংবার তিরস্কার করিতে লাগিল! কিন্তু বিশ্বের চিরন্তন নিয়মে যে বস্তুটী তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে যখন তাহার কোন তিরস্কারকে গ্রাহ্য করিল না তখন তাহারি বশ্যতা স্বীকার করা ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন উপায় রহিল না। তাই গাড়ীর আওয়াজে প্রতিদিনই সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, প্রতিদিনই ইহার কদর্য্য দিকটা তাহার শিক্ষিত হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া তুলে কিন্তু ইহা হইতে মুক্তির কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পায় না।

এম্‌নি করিয়া প্রায় ছ'মাস কাটিয়া গেল।

দুই

পূজার ছুটির আর বিলম্ব নাই। গাড়ীর অসম্ভব ভীড় কল্পনা করিয়া নির্ম্মলের পিতা প্রিয়নাথ বাবু পূর্ব্ব হইতেই সকলকে লইয়া শিমুলতলা যাত্রা করিলেন। নির্ম্মলের কলেজ তখনও বন্ধ হয় নাই, সেইজন্য সে-ই শুধু কলিকাতায় রহিল। সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নির্ম্মল যখন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নি-শূন্য এই গৃহখানি তাহার নিকট যে নির্জ্জনতার সৃষ্টি করিল তাহা তাহার সমস্ত চিত্তকে যেন অজস্র অশান্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ইহার উপর কয়েকদিন হইল তাহার ঈপ্সিত বস্তুটীর সন্ধান মেলে নাই, এবং পূজার অবকাশ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যে আর তাহার মানসপ্রতিমার সাক্ষাৎ মিলিবে না ইহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই না-দেখার বেদনা লইয়া এতগুলা দিন যে তাহার কেমন করিয়া কাটিবে ইহার সে কোন ধারণাই করিতে পারিল না। তা'ছাড়া আজ আর একটা দিক তাহার চোখে পড়িল, সেটা এই যে, একদিন না একদিন যখন ঐ মেয়েটীর লেখাপড়া সাঙ্গ হইয়া যাইবে তখন তো আর সে তাহার দেখা পাইবে না!—তখন কেমন করিয়া সে তাহার এই অদম্য লোভকে ত্যাগ করিয়া তাহার ভারাক্রান্ত দিনগুলি অতিবাহিত করিবে! এম্‌নি নানান্ চিন্তায় তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বিপ্লব বাধিয়া গেল এবং ভয়ার্ত্ত শিশুর মত আপন মনে কত কি শব্দ সে উচ্চারণ করিতে লাগিল যাহা অসংলগ্ন ও অর্থহীন।

পাচক আসিয়া কহিল, বাবু, খাবার কি দেব?

নির্ম্মলের চমক ভাঙ্গিল। কোন কিছু না বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

কলেজের ছুটি হইয়াছে অথচ নির্ম্মল এখনও শিমুলতলায় আসিল না দেখিয়া প্রিয়বাবু তাহাকে পত্র লিখিলেন। একটা কাজের অজুহাত দেখাইয়া নির্ম্মল পিতাকে লিখিয়া দিল যে শিমুলতলায় যাইতে তাহার আরো কয়েকদিন বিলম্ব হইবে। পত্র পাইয়া প্রিয়বাবু 'তার' করিয়া জানাইলেন যে কোনও কারণে এখন আর তাহার কলিকাতায় থাকা চলিবে না, টেলিগ্রাম পাইয়াই সে যেন কলিকাতা ত্যাগ করে।

টেলিগ্রামখানি নির্ম্মল ভাল করিয়া পাঠ করিল এবং কেন যে পিতা তাহাকে এত জরুরি তার করিয়াছেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় একটা ব্যাগ্ হাতে লইয়া নির্ম্মল নীচে নামিয়া আসিল কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা যেন বার বার তাহাকে বলিতে লাগিল, কাজ নাই, কাজ নাই—এখানে থাকিয়া যাও—হয় ত একদিন দেখা মিলিবে।

তাহা হইল না। ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালাইতে হুকুম করিয়া সে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল।

বহুত আচ্ছা বাবুজী বলিয়া শিখ্ড্রাইভার তাহার মোটা ভারী গাড়ীখানা ষ্টেশনাভিমুখে দ্রুত চালাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িতে আর অধিক সময় নাই, নির্ম্মল কোনরকমে একখানা সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

এস এস, বলিয়া তাহার কলেজের বন্ধু সুরেশ গাড়ীর ভিতর হইতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

নির্ম্মল অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কোথায় যাচ্ছ সুরেশ ?

যেখানে দু'চক্ষু যায়।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, উপস্থিত কাশীতে তারপর সকল তীর্থের সার এলাহাবাদে গিয়ে উঠ্‌বো বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

ওঃ—তা বটে, ছুটিটা কাটবে ভাল। তা পূজোর সময় কলকাতায় না থেকে তোমার বীণা এলাহাবাদে কেন ?

তবে আর কলিকাল বলেছে কেন! আগেকার সব মেয়েদের স্বামীভক্তির কথাই শুনা গেছে, এখন আর সেদিন নেই—এখন পিতৃভক্তির 'এজ' এসেছে। সেই যে দু'মাস আগে বাপের একটু শরীর খারাপ হতে তিনি স্বামী ত্যাগ করেছেন—সেই থেকে ব্যাস্, আর দেখাটী পর্য্যন্ত নেই। মনে করেছিলুম আমিও ডুব মেরে দেব কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা পারলুম না কাজেই কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। কিন্তু এ ত হলো আমার নিজের কথা, এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ বল ত ?

এইটেই পড়ে দেখনা বলিয়া সে তাহাকে পকেট হইতে টেলিগ্রামখানা বাহির করিয়া দিল।

হুঁ। কিন্তু সেদিন বল্লে যে শিমুলতলায় এখন যাবে না।

বলেছিলাম বটে, কিন্তু ভেবে দেখলুম না গেলে বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।

তবু ভাল। আমি মনে করেছিলুম এবার বুঝি সেই মামার ভগ্নীটিকে নিয়ে ছুটীতে একটু দারজিলিংএ হাওয়া খেতে যাবে।

তোমার এরূপ মনে করবার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। কিন্তু চিন্তাশক্তি আছে বলেই সকল সময় যা-তা চিন্তা করলে সে শক্তির অপব্যয়ও বড় কম হয় না ভাই। তুমি বেশ জান যে আজ পর্য্যন্ত তাঁকে দেখা ছাড়া একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার হয় নি। তা ছাড়া, আমাকে তিনি, বোধ হয় আদৌ চেনেনই না।

আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া সুরেশ কহিল, বল কি! শুধু দেখাতেই যদি তিনি তোমার এই

অবস্থা করে থাকেন! কথা হলে না জানি কি হতো! পরে, হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, যাকে জাননা-শোননা যার নামটা পর্য্যন্ত তোমার জানা নেই তারি জন্যে দুঃখ করে যে কি সার্থকতা তা আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় সেন্টিমেণ্ট বস্তুটা বাজে হ'লেও সেটা এতটা সস্তা নয়।

নির্ম্মল কোন উত্তর করিল না, শুধু বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে যেন একটা মহা দুঃখকে নীরবে চাপিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে সে অতি শান্তভাবে কহিল, এবার ছুটীটা কতদিন হলো বল ত?

মাস দুই হবে বলিয়া সুরেশ তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া একটা বড় ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। নির্ম্মল কহিল, একটু চা হ'লে মন্দ হতো না, কি বল সুরেশ?

সুরেশের এ বিষয়ে মতভেদ ছিল না, তাই দুই বন্ধুতে চায়ের উদ্দেশে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

তারপর বাকি রাতটুকু এক প্রকার নিদ্রা ও জাগরণের মধ্য দিয়া কাটিয়া ভোরের দিকে গাড়ী যখন শিমুলতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সুরেশ কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, আজ আমাদের দেখা না হ'লেই ভাল হ'ত।

কেন?

তা'হলে মিছামিছি আর তোমাকে আমার কথায় দুঃখ পেতে হতো না। কিন্তু সত্যি বল্‌চি, তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং—

নির্ম্মল বাধা দিয়া কহিল, আচ্ছা, তোমার আর এপোলজি চাইতে হবে না কিন্তু বৌদি'কে আমার নমস্কারটা জানাতে যেন ভুলো না।

দিন দুই পরে দিবানিদ্রা হইতে নির্ম্মল সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তাহার জননী যেন দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, হাঁরে নির্ম্মল, তুই আমাদের রেবাকে চিনিস্!

নির্ম্মল একটু হতভম্ব হইয়া গেল, 'আমাদের' বলিয়া জননী যাহাকে সম্বোধন করিলেন তাহাকে চেনা দূরে থাক তার নামটা পর্য্যন্ত ইহার পূর্ব্বে সে যে কোথাও শুনিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারিল না, অগত্যা একটী ছোট্ট 'না' বলিয়া সে মাতার প্রশ্নের জবাব দিল।

যে উৎসাহ ও আনন্দ পোষণ করিয়া জননী পুত্রের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। তবুও তিনি পুনরায় কহিলেন, কিন্তু সেদিন তোকে বাড়ীতে আসতে দেখে শিবুকে সে যে জিজ্ঞাসা করছিল, শিবু, ইনিই বুঝি তোমার দাদা? আমি যে নিজের কাণে তা শুনেছি।

নির্ম্মল অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কি জানি মা, কে তোমাদের রেবা এবং কেনই

বা তিনি আমার কথা শিবুকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তা বলতে পারি না, তা' ইনি থাকেন কোথায় ?

ঠিক আমাদের পাশের বাড়ীতেই। সত্যি বল্‌চি নির্ম্মল, এমন মেয়ে আমি কখন দেখি নি। এই ক'দিনের তো পরিচয় কিন্তু এর মধ্যেই সে আমার অনেকখানি মন কেড়ে নিয়েছে।

নির্ম্মল বুঝিল এই মেয়েটী যিনিই হউন, তাহার সহিত মায়ের বেশ পরিচয় হইয়াছে এবং সেই কারণে আমার আসার কথাটাও তিনি শুনিয়া থাকিবেন। সে বলিল, তিনি আমাকে চেনেন্‌ এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে! এমন তো হ'তে পারে যে আমার আসার কথাটা তিনি আগে থেকে তোমার কাছে শুনেছিলেন, আমাকে দেখে সেই কথাটাই শিবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তা' হয় ত হবে বলিয়া জননী চুপ করিলেন। কিন্তু যে কথাটা তাঁর অন্তরের মধ্যে সদাসর্ব্বদা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল তাহাকে কিন্তু তিনি চাপা দিতে পারিলেন না। কহিলেন, একে দেখে পর্য্যন্ত আমার কি মনে হয়েছে জানিস ?

কি ?

জননী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর এক রকম জোর করিয়াই কহিলেন, আমার বড় সাধ, একেই আমার বৌ করি।

কিন্তু মা পড়াশুনা শেষ না করে তো আমি বিবাহ কর্ব্বো না।

পুত্রের এই কঠিন কথায় তাহার চোখ দু'টী জলে ভরিয়া গেল। এবং এমনিটীই যে হইবে ইহাও তিনি যেন জানিতেন; কিন্তু কেন যে নির্ম্মল প্রতি বারেই তাঁহাকে এ সম্বন্ধে আঘাত করিতে এতটুকুও দ্বিধা করে নাই শুধু এই তথ্যটাই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া বোধ হইত।

বৈকালে একটা মোটা ছড়ি লইয়া নির্ম্মল বেড়াইতে বাহির হইল। তাহার বাড়ী হইতে যে পথটা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে সেইটা ধরিয়া সে পথ চলিতে লাগিল। পথে কত ভ্রাম্যমাণ বাঙ্গালীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু পরিচয়ের অভাবে কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল না। তবে তাঁহারাও যে সকলে তাহারি মত প্রবাসী, পূজার ছুটী উপলক্ষে একটু হাওয়া খাইতে আসিয়া এই দেশের অধিবাসীদের অযথা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা হইতে বেশ বুঝা গেল। খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা ছোট্ট পাহাড়ের তলায় আসিয়া সে উপবেশন করিল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, স্বাস্থ্য অন্বেষণকারীরাও প্রায় সকলেই স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গিয়াছে, প্রকৃতির এই অতি নির্জ্জন কোলে আসিয়া সুরেশের কথাগুলো হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া

উঠিল। যতই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল ততই সে বুঝিতে পারিল, সুরেশ ত মিথ্যা বলে নাই। সে তো ঠিকই বলিয়াছে। যাহাকে জানিনা-শুনিনা, যাহার নামটী পর্য্যন্ত জানিনা, তাহার জন্য অকারণে এত বড় দুঃখ সহিব কেন? মিথ্যাই এতদিন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি! আর না! এম্‌নি কত কথা বলিয়া সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু যে দুষ্ট দেবতা অনন্তকাল ধরিয়া নর-নারীর এই ব্যথা লইয়া খেলা করিয়া বেড়ান তিনি তাহা শুনিয়া মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রাত্রি গভীর হইয়াছে নিস্তব্ধতার বুক চিরিয়া একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার যেন সারা ধরিত্রীকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে, এম্‌নি সময় নির্ম্মল তার মোটা ছড়িটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ধীরে ধীরে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া যখন সে বাড়ীর সন্নিকটে আসিল তখন দূর হইতে দেখিতে পাইল যে কতগুলা লোক আলো ও লণ্ঠন লইয়া তাহার ফটকের সম্মুখে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। কৌতূহলবশতঃ যখন সে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন সকলের সমবেত প্রশ্নের কলরবে তাহার অবস্থা কতকটা সে উপলব্ধি করিতে পারিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া যে এই বিপুলবাহিনী তাহারি অন্বেষণে সজ্জিত হইয়াছিল ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু চক্ষু কর্ণ সজাগ করিয়া যতই সে তাহার ভগ্নির পার্শ্বের ঐ মেয়েটীকে চিনিতে চেষ্টা করিল ততই তাহার দৃষ্টিশক্তি যেন হ্রাস হইয়া আসিল এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার যে কোনদিন সংসারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

তিন

ঘুম ভাঙিলে নির্ম্মল পূবের জানালাটা খুলিয়া দিল। এবং উষার যে তরুণ আলো তাহার জানালার পিছনে সৌন্দর্য্যের জাল টানিয়া দিতেছিল তাহারি দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত পুলকে যেন মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। বহুদিন হইতে যে বেদনা তাহার সমস্ত জীবনকে ভারী করিয়া তুলিয়াছিল আজ তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। এম্‌নি শান্ত বেদনা-বিহীন জীবন সে অনেকদিন উপভোগ করে নাই, তাই আজিকার এই প্রভাতকে সে যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিল এবং ইহার গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস কোনটাকেই সে আজ অবহেলা করিতে পারিল না।

এই নূতন চিন্তা তাহাকে এম্‌নিই মাতাইয়া তুলিয়াছিল যে কখন যে শিবু আসিয়া চা দিয়া গিয়াছিল—কখন যে তাহার জননী আসিয়া তাহাকে উন্মনা দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, ইহার কোনটাই সে লক্ষ্য করে নাই। চা খাওয়া সাঙ্গ করিয়া শিবুকে সে ডাকিয়া পাঠাইল। এই

ভাইটীকে নিত্য সে নিজেই পড়াইত, তাই ভ্রাতার আহ্বানে শিবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ছুটীর দিনেও যে তাহার না পড়িয়া উপায় নাই, ইহার জন্য মনে মনে সে দাদার উপর অত্যন্ত রাগ করিল, কিন্তু তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিবার তাহার সাহস ছিল না। কাজেই কতগুলা বই হাতে করিয়া মুখখানা অত্যধিক গম্ভীর করিয়া শিবু দাদার ঘরে প্রবেশ করিল। নির্ম্মল হাসিয়া কহিল বই, কি হবে রে?—এখন যে তোর ছুটী। কথা শুনিয়া শিবু বড় খুসী হইল এবং আহ্লাদে কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; আনন্দের আতিশয্যে সে কহিল, তোমার হারমোনিয়মটা নিয়ে আসবো দাদা?

হারমোনিয়ম, কোথা থেকে রে?

শিবু হতবুদ্ধি হইয়া গেল; আনন্দের নেশায় সে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছে তাহা তো বলা উচিত হয় নাই! পুরস্কারের লোভে, দাদার অনুমতি না লইয়াই বাজ্‌নাটা কাল সে তাহার রেবাদিদিকে দিয়াছিল, এবং দাদা যে তাহার এত বড় অপরাধকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না—ছুটীর এই আনন্দের দিনেও যে তাহার ভাগ্যে অন্ততঃ ৬টি কাণমোলা সুনিশ্চিত ইহা ভাবিয়া তাহার মনটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া গেল। সে ক্ষমাপ্রার্থীর মত কুণ্ঠিতভাবে দাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বাজ্‌নাটা কোথায় আছে রে? এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদ্‌চিস্ কেন? বলিয়া পরমস্নেহে নির্ম্মল ভ্রাতাকে নিজের নিকট টানিয়া লইল। কতকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া শিবু কহিল, রেবাদি যে কাল সেটা চাইলে তাই তো আমি দিলুম। কিন্তু তাহার পুরস্কারের কথাটা দাদাকে বলিতে তাহার ভরসা হইল না। তোর রেবাদি বুঝি সেটা চেয়েছিলেন? হাঁরে বোকা, তাতে কি হয়েছে? বেশ ত, তুই যেন সেটা চাইতে যাস্‌নি বলিয়া তাহার এই গম্ভীর দাদাটী তাহার সহিত যে কাণ্ডটী বাধাইয়া দিল ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল এইটা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। দাদার আচরণে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। কহিল, রেবাদি বলে, আমি তোমার দাদাকে চিনি শিবু। সত্যি দাদা? বলিয়া বিস্ময়ের সহিত সে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। নির্ম্মল আগ্রহের সহিত কহিল, তিনি আর কি তোকে বলেছেন শিবু?

আর যে তাহার সহিত কি কথা হইয়াছে তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না, তবে তিনি যে তাদের কল্‌কাতার বাড়ীটা জানেন্ এই খবরটাই সে দাদাকে জানাইয়া দিল। নির্ম্মল আর একবার ভাইকে আদর করিয়া কহিল, আচ্ছা, তুই যা! কিন্তু দাদা কেন যে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন ইহাই প্রশ্ন করিতে গিয়া দেখিল তাহার রেবাদি তাহাকেই হাত নাড়িয়া ডাকিতেছেন। বাহিরে যাইবার তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না, ঘর হইতে সে চীৎকার করিয়া কহিল, দাদা, এই যে রেবাদি এসেছেন, ডাক্‌বো এখানে? নির্ম্মল তাড়াতাড়ি একখানা বই তুলিয়া লইল। আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, আপনি কি আমায় ডাক্‌ছিলেন?

নির্মল বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, আসুন। আপনারা বুঝি পাশের বাড়ীটাতেই আছেন? কতদিন আপনারা এখানে থাকবেন?

রেবা সামনের চেয়ারটাতে বসিয়া কহিল, প্রায় মাস দেড়েক হবে। মামার শরীরটা ভাল নেই তাই এখানে আসা—একটু সারলেই আমরা কলকাতা চলে যাবো।

নির্মল লজ্জিতভাবে কহিল, দেখুন, আপনাকে বসতে না বলার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত—অন্য কোন সমাজের হলে তিনি আমার সঙ্গে হয়তো কথাই কইতেন না।

রেবা হাসিয়া কহিল, আমরা যখন কেহই সে সমাজের নই, তখন আর আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কি? তা ছাড়া, লজ্জা তো আমারি হওয়া উচিত নির্মলবাবু! সেদিন অকারণে আপনাকে সহসা আঘাত করেও যখন কিছুতেই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারলেম না তখন আপনি কি মনে করেছিলেন বলুন ত?

নির্মল বুঝিল রেবা সেই থিয়েটারের ঘটনাটী ইঙ্গিত করিতেছে। সে কহিল, সে তো আর আপনি ইচ্ছে করে করেননি—ও তো এক্সিডেন্ট্।

রেবা ইহার কোন উত্তর দিল না, নিজের মনেই কহিল, তারপর যতবার আপনাকে দেখেছি কিছুতেই আর আপনার দিকে যেন তাকাতে পারিনি। আচ্ছা নির্মলবাবু, ঐটেই বুঝি আপনাদের কলকাতার বাড়ী?

একটী ছোট্ট হুঁ বলিয়া নির্মল তাহার প্রশ্নের জবাব দিল, এবং তাহার দুর্ব্বলতা যে এই মেয়েটীর নিকট ধরা পড়িয়া গেছে ইহার জন্য সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

শিবু এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবং সত্যই যে তাহার রেবাদির সঙ্গে তাহার দাদার পরিচয় আছে ইহা সে কতকটা অনুমান করিতে পারিল। কিন্তু কোথায়—কেমন করিয়া যে ইহা ঘটিয়াছিল ইহাই চিন্তা করিতে করিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রেবা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও শিবু, কালকের সেই ছবির বইটা নিয়ে যাও।

বাহির হইতে শিবু কহিল, সে আমি চাই না।

তারপর নির্মলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কালকে এইটের লোভেই আমাকে আপনার হারমোনিয়মটা ছেড়ে দিয়েছিল। আপনাকে না বলে ওটা নিয়ে যাওয়াতে আপনার তো কোন অসুবিধা হয়নি?

কিছু না। ওটা বোঝার মতই খালি বয়ে বেড়াই, শেখবার কত চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারিনি—এম্‌নি অক্ষম আমি!

সেটা আপনার অক্ষমতা, না চেষ্টার অভাব? আপনি এত লেখাপড়া শিখেছেন আর এই সামান্য কাজটাতে ফেল্ হয়ে গেলেন! আমার তো মনে হয়, এর জন্যে আপনাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া উচিত। ওঃ, আপনার তো বিবাহই হয়নি!

অর্থাৎ, আমার শাস্তি দেওয়ার লোক হয়নি, এই না? তা সে ভারটা কি আপনি গ্রহণ করতে পারেন না? সত্যি বলচি, এ ভার আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ ভার দিতে পারব না। বলিতে বলিতে উত্তেজনায় তাহার চোখদুটা যেন জ্বলিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দুই হাত নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া বার বার বলিতে লাগিল, বল বল রেবা, আমার এ ভার তুমি নেবে?

এ আপনি কি ছেলেমানুষী করচেন? ছেড়ে দিন্—কেউ হয় ত এখনি এসে পড়বে, বলিয়া জোর করিয়া সে নিজেকে যেন মুক্ত করিয়া লইল। এবং কোন রকমে গায়ের কাপড়টা গুছাইয়া লইয়া অভিভূতের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাতের যে আনন্দ অনুভব করিয়া নির্ম্মলের চিত্ত তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল সে যে এমনি করিয়া তাহাকে আবার অতৃপ্তির বহ্নিতে পুড়াইয়া ছারখার করিবে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার কোন সংবাদই সে পায় নাই!—আগুন ধরিয়া গৃহখানি যখন পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল তখনি সে বুঝিল যে এই শান্ত নিস্তব্ধ গৃহের মধ্যে বহুপূর্ব্ব হইতেই বহ্নি তাহার কার্য্য সুরু করিয়াছিল এখন সময় বুঝিয়া তাহা ভস্মসাৎ করিল। তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত যে এক নিমিষে শীলতার ও লজ্জা সরমের কোন কিছু আর অবশিষ্ট রাখিবে না ইহা সে তাহার অতি বড় উন্মাদ মুহূর্ত্তেও কখন কল্পনা করে নাই। চিরদিনই সে তাহার অন্তরের ব্যথাকে নিজের মধ্যেই লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন্ দুঃসাহসে সে যে আজ মাতিয়া উঠিয়া তাহাকে এই অপরিচিতার নিকট চিরদিনের মত এমনি হেয় করিয়া দিল ইহা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাহার চোখ দুটো ফাটিয়া যেন জল আসিয়া পড়িল, এবং যত প্রকার কঠোরতার দ্বারা তাহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব তাহার কোনটাই সে আজ যথেষ্ট মনে করিল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এইবার যখন ঐ মেয়েটী তাহাকে দেখিতে পাইবে তখন নিশ্চয় সে মনে মনে হাসিয়া বলিবে, ওরে ভণ্ড, ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া দাঁড়কাক কখন ময়ূর হয় না। নিজের গৃহে অতিথির যে সম্মান রাখিতে পারে না তাহার আবার ভদ্রলোক বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা কেন?

বেলা তখন অধিক হইয়াছে, নির্ম্মল তখনও নীচে নামিল না দেখিয়া তাহার জননী আসিয়া কহিলেন, হাঁরে, নাওয়া-খাওয়া কি ভুলে গেছিস? তারপর সন্তানের যে চেহারা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতে তিনি ভয় পাইয়া গেলেন। মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, চোখের কোল দুটায় যেন কালী লেপিয়া দিয়া দিয়াছে, মুখের উপর একটা গভীর হতাশার কালো ছায়া পড়িয়াছে। তিনি ভীতকণ্ঠে কহিলেন, কি হয়েছে বাবা নির্ম্মল? এমনি করে শুকনো মুখে বসে আছিস কেন বাবা! চুপ করে রইলি যে? বল্ না, কি হয়েছে তোর?

নির্ম্মল সহজ ভাবেই কহিল, কিছুই হয় নি মা, হঠাৎ মাথাটা বড় ধরেছে তাই একটু চুপ করে বসে আছি। এই বলিয়া হাতের কাপড়টা দিয়া সে মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু

মনুষ্যত্বের সবটুকু নিঃশেষ করিয়া যে কালিমা সে নিজ হাতে লেপিয়া দিয়াছে তাহা যেন কিছুতেই মুছিতে পারিল না।

পুত্রের কথায় জননীর প্রত্যয় হইল না, কিন্তু তবুও তাহাকে আর বেশী প্রশ্ন করিবার তাঁহার সাহস ছিল না।

পরদিন সকাল হইতেই বাড়ীময় কিসের একটু সাড়া পড়িয়া গেল, আজ বিজয়া দশমী। এখানে আত্মীয়-স্বজন না থাকায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা এদিনটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারে না, কিন্তু তবুও এ দিনটাকে তাহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখে। বিকেল বেলায় নির্ম্মলের জননী রান্নাঘরে বসিয়া বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেছিলেন এমন সময় নির্ম্মল আসিয়া কহিল, এত আয়োজন কিসের মা!

মা কহিলেন, আজ যে বিজয়া রে। একটু আধটু মিষ্টি মুখ তো করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্যের দিকে চাহিয়া নির্ম্মল কহিল, তা না হয় হবে। কিন্তু এতো খাবার খাবার লোক কৈ মা!

মা হাসিয়া কহিলেন, তোরাই খাবি—আবার কে খাবে! আর যদি রেবা ও তার মামী আসেন বেড়াতে। সুনীতি বাবুর শরীর ভাল নেই—তিনি এ সব কিছুই খান না।

নির্ম্মল আর কোন প্রশ্ন করিল না, নীরবে উপরে চলিয়া গেল। কিন্তু ঘরের মধ্যে গিয়া একটা বড় কথা তাহার বার ব।র মনে হইতে লাগিল. ইহা কি সম্ভব! রেবা কি সে ঘটনার পর আর কোন দিন এ বাড়ীতে পদার্পন করিবে? মায়ের কথা মনে করিয়া তাহার হাসি আসিল, এবং তাঁহার এত পরিশ্রম যে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহই রহিল না।

সন্ধ্যার সময় নির্ম্মল হাত মুখ ধুইয়া উপরের ঘরে বসিয়া আছে এমন সময় হঠাৎ যেন একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ অকস্মাৎ তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, রেবা। গভীর বিস্ময়ে বিপুল আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্ম্মল কহিল, আপনি!

রেবা হঠাৎ তাহার পায়ের তলায় একটা প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যে বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন! কিন্তু আজকের দিনে বড়দের যে এটা প্রাপ্য সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?

নির্ম্মল নিজেকে শক্ত করিয়া কহিল, আচ্ছা, এই পাপিষ্ঠকে স্পর্শ করতে আপনার ঘৃণা হচ্ছে না?

সে শান্তভাবে কহিল, ঘৃণা কেন হবে নির্ম্মল বাবু? এমন কি অপরাধ আপনি করেছেন!

অপরাধ? অতিথিকে ঘরের মধ্যে পেয়ে যে তাঁর মর্য্যাদা রাখতে পারে না, তার অপরাধ

কি সোজা! তারপর, অনুতপ্তস্বরে কহিল, কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল কি ভেবেছি জানেন! মৃত্যু! মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত!

দেখুন। আপনি অনর্থক এটাকে বাড়িয়ে তুলচেন। যাতে আপনার কোন হাত নেই তার জন্যে যে আপনি কেন মিছে কষ্ট পান, তা আমি বুঝতে পারচি না।

নির্ম্মল উত্তেজিত হইয়া কহিল, বল্‌েন কি? সত্যি আমার কোন দোষ নেই?

সত্যই, এতে আপনার কোন দোষ নেই। তারপর নির্ম্মলের অতি সন্নিকটে আসিয়া কহিল, সেদিন অতিথি যদি স্বেচ্ছায় ধরা না দিতেন তাহলে আপনি কি তাঁকে অপমান করতে পারতেন? বলিয়াই বিদ্যুদ্বেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ম্মল সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যতদূর দৃষ্টি যায় সে তাহার দুই চক্ষু দিয়া এই নারীর আজিকার এই সৌন্দর্য্যটুকু যেন গিলিয়া খাইতে লাগিল।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া নির্ম্মলের জননী ঘরে আসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দিন-রাত্রি তামাক নিয়ে থাকলেই কি ছেলের বিয়ে হয়ে যাবে? এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ কিন্তু আমি কোথাও দেখিনি।

প্রিয়বাবু তখন সবেমাত্র তাঁহার মুখের ধোঁয়াটা ছাড়িয়াছেন, গৃহিণীর কথায় তাকিয়াটা একটু টানিয়া লইয়া কহিলেন, তোমার ছেলে যদি বিয়ে ক'রবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে থাকে তাহলে মিথ্যা চেষ্টা করে লাভ কি?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, না গো না, আর তোমায় মিথ্যা চেষ্টা করতে হবে না,—নির্ম্মল আমার বিয়ে করবে।

প্রিয়বাবু কহিলেন, কি করে জান্‌লে?

গৃহিণী তেমনি হাসিয়া কহিলেন, সে আমি জানি। তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু সুনীতিবাবুর ঐ ভাগ্নিটী ছাড়া সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে না বলে দিচ্চি। যেমন করেই হোক্ এটা তোমায় পাকা করতেই হবে।

তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কথা ক'য়ে দেখবো—নিশ্চয় কিছু বলা যায় না।

দিন কতক পরে তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ সুনীতিবাবুর কাছে বিয়ের কথাটা উত্থাপন করেছিলুম; তিনি বল্লেন, কল্‌কাতায় গিয়ে এসম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা কইবো—এখন কিছু বলতে পারচি না।

কথাটা শুনিয়া নির্ম্মলের জননী বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিলেন না।

চার

ওগো শুনচো?

কি? বলিয়া নির্ম্মলের জননী স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিলেন।

আজ আমি স্থনীতিবাবুর বাড়ী গেছলুম।

তাঁরা ফিরেছেন নাকি?

হাঁ। আমাদের আসার দিন পনেরো পরেই তাঁরা ফিরেছেন। বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হলো। যা বুঝলুম তাতে নির্ম্মলের সঙ্গে তাঁর ভাগ্নীর বিবাহ হওয়ার এতটুকুও সম্ভাবনা নেই। তিনি একটী পাত্র পেয়েছেন, ছেলেটী ডাক্তার—বাপ বড় উকিল; কল্‌কাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী—টাকাকড়িও যথেষ্ট আছে। এ ছেড়ে তিনি আমাদের বাড়ী মেয়ে দিতে রাজী হবেন কেন?

গৃহিণী কহিলেন, আমার নির্ম্মলও তো এম-এ পড়ছে—সেও তো আমার মূর্খ ছেলে নয়। তা ছাড়া তার স্বভাব চরিত্র এ পাড়ার কে না জানে?

প্রিয়বাবু হাসিয় কহিলেন, আমি কি তোমার ছেলের হয়ে ওকালতি করতে কসুর করেছি? কিন্তু টাকাটাই যে এসংসারে বড় জিনিষ গৃহিণী?

রাগের মাথায় গৃহিণী কহিলেন, টাকা? কেন, আমরাই কি পথে দাঁড়িয়েছি নাকি?

প্রিয়বাবু আর একবার হাসিলেন, এ হাসি দুঃখের কি আনন্দের ঠিক বুঝা গেল না।

নির্ম্মলের পরীক্ষার আর বিলম্ব নাই। একটা নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া ইহারই জন্য সে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছিল হঠাৎ এ দুঃসংবাদে সে তাহার মাথাটা ফাটাইয়া ফেলিবে, কি হাতে হাতে এই অভিশপ্ত জীবনের পালাটা শেষ করিয়া দিবে কিছুই যেন স্থির করিতে পারিল না। আজ এক নিমিষে তাহার নিকট ঘর-সংসার, লেখাপড়া, এমনি তুচ্ছ হইয়া গেল যে, আপনার বলিতে এ সংসারে তাহার কোথাও যেন কিছু আর অবশিষ্ট রহিল না। শুধু একটা আর্ত্তনাদ অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তাহার বুকের ভিতর হইতে ফাটিয়া বাহির হইবার ব্যর্থ চেষ্টায় আছাড়-পাছাড় খাইতে লাগিল।

সেদিন নির্ম্মল খাইতে বসিয়াছিল জননী ভয়ে ভয়ে কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, মায়ের এ সাধটা কি তুই পূর্ণ করবি না? শ্যামবাজারের এ মেয়েটীও তো বেশ সুন্দরী বাবা!

নির্ম্মলের হাতের ভাত হাতেই রহিল; সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, আমার মরণ হলেই কি তোমরা বাঁচো?

বালাই! ষাট! পুত্রের কথায় জননীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কত বলিলেন কিন্তু নির্ম্মল আর কিছুতেই খাইতে বসিল না।

জীবনের যে দুর্দ্দশায় পৌছিলে মানুষ আর ভাল করিয়া এ পৃথিবীটার দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে না—সমস্তটাই যেন কি রকম ঘোলা হইয়া যায়; নির্ম্মলও ঠিক সেই অবস্থায় পৌছিয়াছিল। এখানে মায়া নাই, দয়া নাই, আশা নাই, সহানুভূতি নাই—আছে কেবল বিরাট নৈরাশ্য, আর তীব্র অনুশোচনা।

রাত্রি প্রায় বারোটা। বাহিরে টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছিল। সুরেশ নীচের ঘরে

বসিয়া তাহার আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ফিলজফি পড়িতেছিল। হঠাৎ গাড়ীর আওয়াজে চাহিয়া দেখিল—নির্ম্মল। এত রাত্রে তাহাকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ব্যাপার কি নির্ম্মল? কিন্তু ইহার বেশী সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কেননা, তীব্র সুরার গন্ধে তাহার যেন বমি হইবার উপক্রম হইল। মুখটা ফিরাইয়া সে কহিল, আগে ত এ সব খেতে না!

না! আগে এর প্রয়োজন হয়নি।

কবে থেকে তবে সুরু করলে?

এ জিনিষ কি কেউ দিন-ক্ষণ দেখে সুরু করে না সুরেশ, যেদিন এর প্রয়োজন হয় সেদিন আর মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব সয় না। এম্‌নি অসময়ে এসে তোমার বড় ক্ষতি করলুম, নয়?

সুরেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে কহিল, অপরের ক্ষতি বুঝবার যার শক্তি আছে সে যে নিজের ক্ষতির পরিমাণটা বুঝতে পারচে না কেন, এইটেই আজ আমায় বড় আশ্চর্য্য করে দিয়েছে, নির্ম্মল।

কথা শুনিয়া নির্ম্মল হাসিল; এ হাসি সুরেশ চিনিল। কিন্তু বেদনা যত বড়ই হউক তাহাকে এম্‌নি করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া সে উচিত মনে করিল না। কহিল, আমি তোমায় উপদেশ দিচ্চি না ভাই, কিন্তু এর পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছ?

পরিণাম? সেটা ভাববার আর সময় পেলুম কোথায় ভাই? একেবারে এক মুহূর্ত্তে সব গুলিয়ে ঘোলা হয়ে গেল যে! কিছুই কি আর দেখতে দিলে! আচ্ছা সুরেশ, জলন্ত আগুনে কখন মানুষকে পুড়তে দেখেচ? দেখনি, নয়? কিন্তু আমি দেখেছি—উঃ, কি সে যন্ত্রণা!

সুরেশ আর সহ্য করিতে পারিল না। কহিল, সুখী হও সংসারে আর কি এমন কিছু নেই?

নির্ম্মল পকেট হইতে মদের শিশিটা বার করিয়া কহিল, আছে বৈকি। এই যে।

দুঃখে ও ক্ষোভে সুরেশের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। সে কহিল, নির্ম্মল, ছেলেবেলার না হলেও, বন্ধুত্বটা আমাদের বড় কম দিনের নয়। সুখ দুঃখের কোন কিছু থেকেই তুমি আমায় বাদ দাওনি। আজ একটা কথা তোমার হাতে ধরে আমি অনুরোধ করচি, এ বিষ খেয়োনা। কোনদিন কোন হতভাগাই এ থেকে সুখ পায়নি।

নির্ম্মল কহিল, উপায়ওতো কিছু নেই সুরেশ। আজ আমার কি মনে হচ্চে জান? মনে হচ্চে, যাদের মরা উচিত অথচ যারা বেঁচে থাকে তাদের এত বড় বন্ধু বুঝি আর কিছু নেই।

সুরেশ কহিল, এ যুক্তি আমি বহুবার শুনেছি ভাই, কিন্তু যে বস্তুটা মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয়—

নির্ম্মল বাধা দিয়া কহিল, থাক্। জান্‌লে সুরেশ, ছেলেবেলায় মরালিটির প্রবন্ধ লিখে

আমিই প্রথম প্রাইজটা পেয়েছিলুম। তোমার বিশ্বাস হয়? আচ্ছা, আমি এখন উঠলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, দশ-বার দিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে যাই। ক্ষতি হয় ত একটু হলো, এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে তোমার বন্ধুত্বের অপমান করতে চাই না।

তার কোন আবশ্যকও নেই ভাই; কিন্তু এ অবস্থায় তোমায় তো আমি যেতে দিতে পারি না।

অর্থাৎ, বাড়ীতে গেলে সুনামটা আর আমার বাঁচিয়ে রাখা যাবে না? কিন্তু, আর যাই করি, বাড়ী গিয়ে যে মাতলামি করবো না এ আমি তোমায় গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

গ্যারাণ্টি না দিলেও তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে থাকলে আজ তোমার কোন অসুবিধা হবে না, কেননা আজ সকলে মাসীর বাড়ী গেছেন—বাড়ীতে কেউ নেই।

সুরার তীব্র নেশায় বহুক্ষণ ধরিয়া সে ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল তাই বন্ধুর এ অনুরোধ সে আর উপেক্ষা করিল না।

* * *

সুনীতিবাবু পাকা লোক। পিতৃমাতৃহীনা এই ভাগ্নীটিকে তিনি আশৈশব পালন করিয়াছিলেন, তাই তাহার ভবিষ্যতের দিকে তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়া রেবা যখন যৌবন-উষায় জাগিয়া উঠিল তখন হইতেই তিনি তাহার জন্য একটী সুপাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে মনে নির্ম্মলকেও একটা স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন যখন এই ডাক্তার ছেলেটীর সন্ধান লইলেন, তখন আর তিনি লোভ সাম্‌লাইতে পারিলেন না, একেবারে দিনস্থির করিয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

রেবা স্বামীর ঘর করিতে আসিল; প্রকাণ্ড বাড়ী, বহু দাস-দাসী, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য। নারী-জীবনের যাহা কিছু কাম্য তাহা সে সকলি পাইল, এমন কি প্রয়োজনের অধিকই পাইল। স্বামী আদর করিয়া বলে, রেবা, এতদিন তোমায় না পেয়ে আমি যে কি করে ছিলুম তাই এখন কেবল ভাবি। রেবা হাসিয়া চলিয়া যায়। স্বামী তাহাকে টানিয়া আনিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরে, চুমু খাইয়া তাহার গালদুটা রঙীন করিয়া দেয়—রেবা স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে স্থির হইয়া থাকে। যাও, তুমি আমায় ভালবাস না বলিয়া স্বামী আদর ভিক্ষা করে, রেবা ছুটিয়া তাহাকে আদর করিতে যায়, কিন্তু পারে না—ফিরিয়া আসে।

এম্‌নি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

বৈশাখ মাস, সকাল হইতেই যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল সন্ধ্যার সময় তাহা ঝড়বৃষ্টি লইয়া উপস্থিত হইল। তারপর প্রকৃতির যে তাণ্ডবনৃত্য সারা ধরিত্রীকে কাঁপাইয়া তুলিল তাহা চক্ষু কর্ণ সজাগ করিয়া উপলব্ধি করে এমন কঠিন প্রাণ সংসারে অল্পই আছে।

স্বামীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া রেবা উৎসুক হইয়া উঠিল, তারপর কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি যতো বাড়িতে লাগিল প্রকৃতির এই উন্মাদনৃত্যও যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিলে রেবা স্বামীর বুকের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল, কখন্ এলে? জলের জন্য বুঝি দেরী হলো?

না। আজ একটা বড় এক্সিডেন্ট্ কেস্ এসে পড়ল তাই হাঁসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলুম না। ছেলেটী এম-এ পড়ে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোথায় একটু মদ খেয়েছিল, নেশার ঝোঁকে একেবারে একটা মোটরের মুখে পড়ে গেছল। জল-বৃষ্টি দেখে ড্রাইভারও খুব জোরে গাড়ী চালাচ্ছিল কিছুতেই আর থামাতে পারলে না—বুকের ওপর দিয়ে গাড়ীখানা একেবারে বেরিয়ে গেছে। বাপকে খবর দিতে, বাপ এসে হাজির হলো। উঃ, তাঁর কি কান্না! কিছুতেই তাঁকে থামানো যায় না।

কান্নার কথা শুনিয়া রেবার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। কহিল, ভদ্রলোকের ছেলে ত, তবে তিনি মদ খেলেন কেন?

শুনলুম খুব ভালছেলে, আর ক'দিন পরেই তার পরীক্ষা। কি যে একটা তার জীবনে হয়েছে, পড়াশুনাও আর করে না—যখন তখন মদ খায়। বেচারী এখন বাঁচলে হয়?

তাঁর বাড়ী কোথায়?

এই শিবতলায়—বেশী দূরে নয়!

রেবা উৎসুক হইয়া কহিল, শিবতলায়? কাদের বাড়ী?

বাপের নাম বুঝি প্রিয়বাবু?

রেবা চীৎকার করিয়া কহিল, তাঁর নাম? বল বল, নির্মল তো নয়?

হাঁ। তুমি কি করে জানলে?

রেবা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সজোরে স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

স্বামী কহিল, রেবা, তুমি তাঁকে দেখতে যাবে?

একটা অস্ফুট স্বর তাহার হৃদয়ের কোন তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ।

সাধু

শ্রীমতী কিরণবালা সেন গুপ্তা

১

গাড়াপুর মালাকা গ্রাম লক্ষ্ণৌ থেকে এগারো মাইল উত্তরে। শুনলাম সেখানে ভাগবত সাধু নামে একজন ভারি জবর সন্ন্যাসী এক আশ্রম ক'রে আছেন।

এই সাধুটী নাকি কারো কাছে দান গ্রহণ করেন না। সামান্য চাষ আবাদ আছে, আর দু' একটি শিষ্য আছে যাঁদের সাহায্যে আশ্রম চলে। অথচ এই আশ্রমের আশে পাশে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট খানা গ্রামের লোক ব্যাধি ও অনশনের হাত থেকে উদ্ধার পেতে জমিদারের কাছে না গিয়ে এই সাধুরই শরণাপন্ন হয়। আজ কালকার সাধু ব্যক্তিরা, দেশহিতৈষী নেতারা অধিকাংশই তহবিল মারার চেষ্টায় ফিরেন—এই সাধুটি নাকি ঠিক তার উল্টা। লোকটা বেশ সাদা সিধে অথচ শুনা যায় বেশ পণ্ডিত লোক।

একেত রেলওয়ে বিভাগের ছুটী নেই, তাতে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট। তবুও কোন রকমে একটু ফুরসৎ করে সাধু সন্দর্শনের সাধু সংকল্প জাগলো মনে। সঙ্গে বামাপদ সরস্বতী, পণ্ডিত মানুষ, ছুটী নিয়ে পুরোণো বন্ধুত্বের খাতিরে আমার অতিথি। আর সঙ্গে ছিল কেতকী ভূষণ—আমারই সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, সম্প্রতি বিলেত থেকে নূতন ডিগ্রী নিয়ে এসেছে,—ভাগ্যিস্ একেবারে সাহেব ব'নে যায় নি।

২

আমি আর কেতকীভূষণ আউটডোরের (outdoor) পোষাকে সজ্জিত খাঁটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। পায়ে পুরা বুট ও লেগ্‌গার্ড, কাটুরাইয়ের ব্রিচেস্ ও গল্‌ফ কোট, মাথায় প্রকাণ্ড সোলা হ্যাট্, হাতে ছড়ি ও মুখে বর্ম্মা চুরুট।. বামাপদ সোজা খালি পায়ে, বামুন পণ্ডিত—হাতে কিন্তু মোটা লাঠী।

মাত্র এগারো মাইল যাব। কিন্তু কত যে ভালভাজা ক্রোশ চললাম তার ঠিক ঠিকানা নাই। উপরে রোদ, নিচে তপ্ত বালি—আমাদের পায়ে বুট ও মাথায় টুপি। কিন্তু বামাচরণ

বেচারি! ভিজান চাদর মাথায় বেঁধে রাস্তার পাশে যা দু'এক গাছি ঘাস গজিয়েছে সেই ঘাসের উপর দিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে থার্মোফ্লাস্ক খুলে কফি পান কচ্ছি।

সাধু দর্শন হোক আর না হোক—খুব একটা এ্যাডভেঞ্চার যে হচ্ছিল তার আর ভুল নেই। কেতকী কহিল—রোমান্স বা এ্যাডভেঞ্চার করবার মতন সুবিধে, সুযোগ, অর্থাৎ কিনা স্থান কাল মিললেও 'প্রার্থিত জন' মিলবে কি!" কেতকী ছিল কুমার। আমি ধমক দিয়ে বললাম—সাধু দর্শনে চলেছ, কি যে ছাই বল—অনিত্যচিন্তা, বৈরাগ্য, অনুকম্পা এ সব কোথায় মনে আনবে—তা নয়, উনি রোমান্সের 'কী' (Key) খুঁজছেন।

কেতকী—বৈরাগ্য সাধনার জন্যই ত রোমান্স খুঁজছি। সংসারাসক্তির সব রকম বন্দোবস্তও প্রশ্রয় থাকা সত্ত্বেও বৈরাগ্য আসবে, তাতেই হচ্চে বাহাদুরী।

বামাপদ—মশাইদের দেহাবরণেই বৈরাগ্যের শতদল ফুটে উঠেছে—এর বেশী বৈরাগ্য এনে কাজ নেই—সইতে পারবো না।

কেতকী—সাহেবী পোষাক পরেছি ব'লে কি মনে হয় আমরা কম কষ্টসহিষ্ণু না বৈরাগ্যই আমাদের কম! দরকার হ'লে আমরা সব অবস্থাতেই চালিয়ে নিতে পারি—কিছুতেই আটকায় না। সন্ন্যাসের বীজ কেবল ফোঁটাতে আর নগ্ন পদেই নয় হে!

৩

এমন সময় পথি মধ্যে এক নদী। কথায় বলে 'একা নদী বিশ ক্রোশ'। কে জানতো এ পথে আবার নদী আছে। ছোট্ট নদী, যান বাহন চালাবার মত বড় নয়, কিন্তু তা' বলে নদী ত শুকনো ছিল না—জলও ছিল বেশ। কি বিপদেই পড়া গেল—নদী পার না হ'য়ে সাধু দর্শন হয় না, আর ফিরে গেলেও কাপুরুষতা প্রমাণ হয়। আমরা ত ভেবেই আকুল' নদী ব্যাটাকে সরাতেও পাচ্ছি না পারও হ'তে পাচ্ছি না।—বিধাতা পুকুর সৃষ্টি করেছেন বেশ—একটু ঘুরে গেলেই গোল চুকে যায় কিন্তু নদীরত দুটী বই আর তীর নেই এবং সেই দুটী তীরের মধ্যে চিরকাল থাকে ব্যবধান।

দেখা গেল, জল বেশী নয়—দু'একজন লোক বেশ হেঁটে পার হচ্চে, জল হাঁটুর কিছু উপরে। মনে একটু ভাবনা এলো বটে কিন্তু তাতেও প্রধান বাধা রইলো পোষাক। বামাপদ পদব্রজে নদীর ব্যবধান অতিক্রম করবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের উপায়! পোষাক খুলতে লাগবে আধঘণ্টা, তার উপর ব্রিচেস্ খোলা মানে একটা জোয়ান চাকরকে দিয়ে বলির পশুর ছাল ছাড়ানোর ব্যাপার আর কি! বামাপদ আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে—মশাইরা ত' দরকার হ'লে সব অবস্থাতেই চালিয়ে নিতে পারেন—কিছুতেই আটকায় না—বেশ, এইবার চালিয়ে নিন্ না।

কুহু ও কেকা

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র অঙ্কিত

Himani Press, Calcutta.

৬

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানই বহন করেন। তারপর আমাদের কামনা ছিল সাধু কিনা, তাই নদী পার হবার সুযোগ তিনিই করে দিলেন। এক ব্যাটা কুলি ছপ ছপ করে নদী পার হচ্ছিল। কেতকী, কুলিটাকে ডাকলো এবং আমাদের পার করে দিতে বললে। পার করতে পারলে পয়সা যে পাবে তা সে আমাদের ভাবভঙ্গী ও পোষাক দেখেই আন্দাজ করেছিলো বোধ হয়। পয়সা জিনিসটা সব করতে পারে—বিশেষতঃ এই ছোট লোকগুলোর কাছে পয়সার প্রভাব খুবই বেশী। কোথায় জন খাটতে যাচ্ছে,—রাস্তায় এই রোজগারটা উপরি পাওনা বইত নয়, রাজী হবে না কেন! কুলিটাই ফিরে এলো এবং বিনা বাক্যবয়ে এসে হাজির, নদী পার ক'রে দেবে। ব্যাটার কালো রূপ, বসন্তের দাগ মুখে, ইয়া পালোয়ানী চেহারা।

আমরা একে একে সবুট, কুলির কাঁধে উঠে অনায়াসে নদী পার হ'লাম। বামাপদর কুসংস্কার, সাধু দর্শনে যাচ্ছে কিছুতেই মানুষের কাঁধে উঠে নদী পার হবে না। সুতরাং সে হেঁটেই নদী পার হ'লো।

নদী পার হ'য়ে কেতকী কুলিটাকে একটি টাকা বখ্‌শিস্ করতে গেল। কুলীটা কিন্তু টাকা নিল না। কেতকী ভাবলে একটা টাকা বলে বোধ হয় নিতে আপত্তি, আর একটাকা বের ক'রে দেয় আর কি—আমি বাধা দিয়া বল্লাম ওরা খেটে খায়, দিন গেলে পায় ছ-আনা থেকে আট আনা— একটা টাকাই যথেষ্ট। আমাদের এই সাহেবী পোষাক দেখে দাঁও মারবার চেষ্টা। ছোটলোকগুলা কি পাজী নেমকহারাম।' কুলিটা বললে বাবু নদী পার ক'রে আমি পয়সা নিই না—আমি ইচ্ছে ক'রেই ত পার করেছি,—পয়সার কড়ার ত করি নি—বেশী পয়সাই হোক আর কম পয়সাই হোক—।' ব্যাটার ছোট মুখে বড় কথা! কাজ করেন কুলিগিরি, বক্তিমে দেন ত্যাগের। ব্যাটা হন্ হন্ ক'রে নিজের কাজে চলে গেল। যা, ব্যাটা যা, অতি লোভে নিজেই ঠকলি।

৭

আমরা আরো প্রায় মাইল তিনেক চলবার পর এলাম সাধুর আশ্রমে। যিনি আশ্রমের অতিথি পরিচর্য্যার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি সাদরে আমাদের 'অভ্যর্থনা' করলেন। আমরা এদিকে ওদিকে একটু ঘুরে আশ্রমটী মোটামুটী দেখে নিলাম—প্রাঙ্গণ, মাঠ, পুকুর সবই ছিল বেশ কিন্তু বাড়ী ঘর গুলি তেমন সুবিধার নয়—সবই পাতার বা খোলার ছাউনি মাটির ঘর। এগুলি পাকা হ'লেই মানাত বেশ। অনুমানে বুঝলুম আশ্রমের টাকা পয়সার তেমন সচ্ছলতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মালপোয়া প্রাপ্তির আশাটা একটু ক্ষীণ হ'লো বই কি!

রোগী ডাক্তার-ওষুধ, অন্ধ-আতুর খঞ্জ ও তার সেবা, ছাত্র-চতুষ্পাঠী-অধ্যাপক—যা থাকা দরকার সবই একটু আধটু আশ্রমে ছিল। পরে ভাল করে দেখা যাবে ভেবে প্রাঙ্গণে ঘাসের বিছানায় বসে পড়লাম। ব্রহ্মচারীটি গেলেন আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে—এটা অবশ্য আমাদের অনুমান। সাধুর সঙ্গে এখনোও দেখা হয় নি, তিনি তখন কি কাজে আশ্রমের বাইরে গিয়েছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

কেতকীভূষণ কোটটা খুলে একেবারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়লো—আমি অর্দ্ধশায়িত, বামাপদ বাইরে বসে আশ্রমের সৌন্দর্য্যে ভাবে তন্ময়, গুণ গুণ করে সংস্কৃতে কি একটা আওড়াচ্ছিল—সেটা বেদ গান কি মেঘদূত জানি না। এমন সময় দেখি সেই কুলিটা এসে উপস্থিত।

কেতকীকে বললাম "ওহে টাকা জিনিসটার মায়াটা বড় মায়া, কুলি ব্যাটা দম দিচ্ছিল বেশী পাওয়ার জন্য, যখন পেলে না তখন অগত্যা এক টাকা এক টাকাই সই—পথে পাওয়া টাকার চৌদ্দ আনায়ও ক্ষতি নেই—ঐ স্বাথ ব্যাটা টাকা নিতে এসেছে। টাকা দেবার আগে ওকে দিয়ে জুতো গুলি সাফ করিয়ে নেওয়া যাক।"

এমন সময় ব্রহ্মচারীটি কিছু আহার্য্য নিয়ে ফিরে এলেন—কুলিটা তখন আমাদের কাছে এসেছে। ব্রহ্মচারীটি তার দিকে চেয়ে ব'লে উঠলো 'এই যে গুরুদেব এসেছেন'।

আমি তো অবাক—'এ—ই—ই—নি—ই—ভাগবত সাধু—'

কেতকী—এঁ্যা—
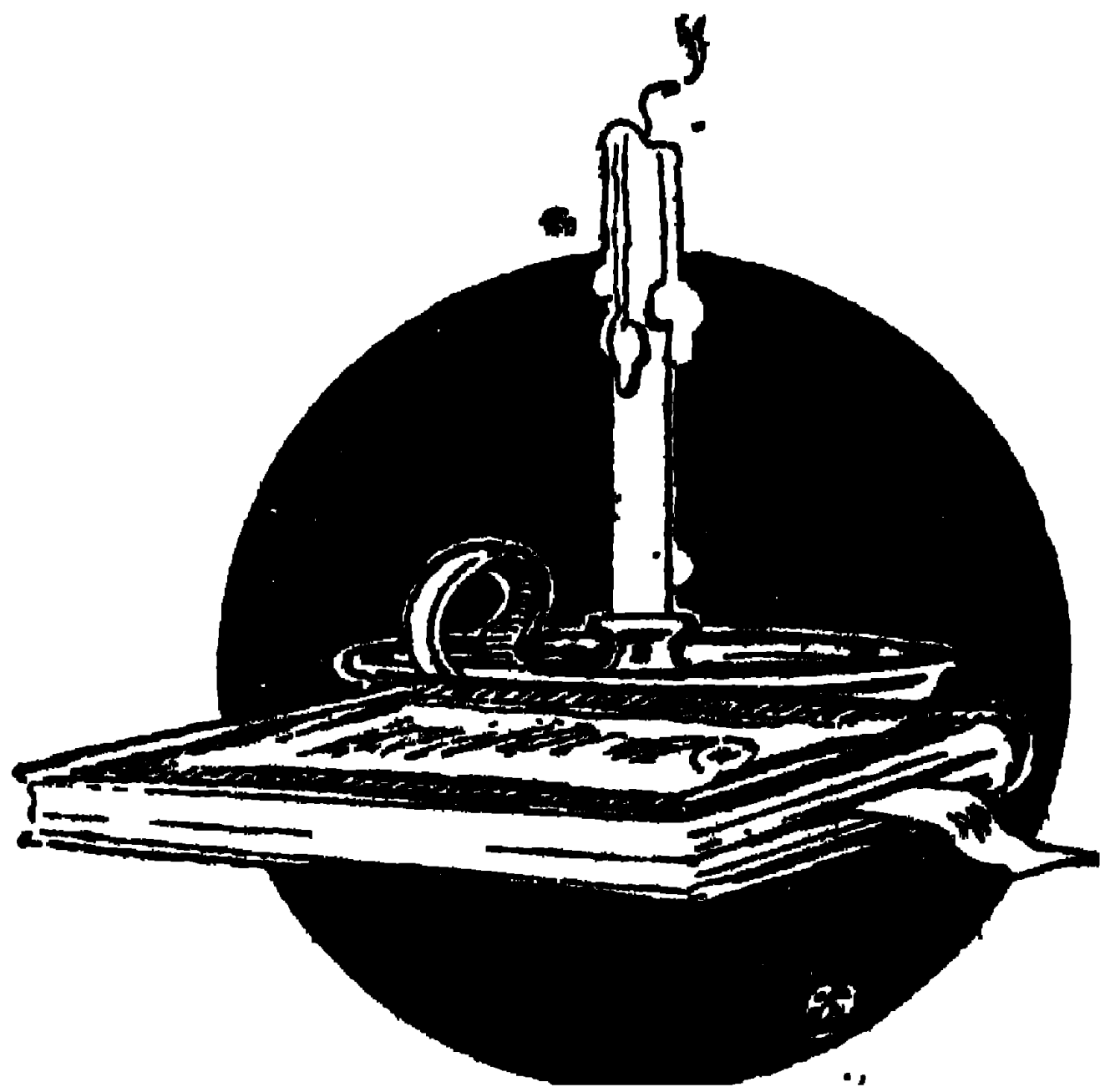
বড়মা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

১

তখন মধ্যাহ্ন। মন্দাকিনী আহার শেষ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখাখানি খুলিয়া দিয়া সবেমাত্র বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সুষমা ভয়ে ভয়ে ডাকিল, "বড়মা ?"

মন্দাকিনী মাথা তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি মা সুষমা, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আয়।"

সুষমা কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "মা আপনাকে ডাকছেন, বড্ড দরকার।"

মন্দাকিনীর ননদ সারদাসুন্দরী হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে বারান্দা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, সুষমার কথা কানে যাইতেই তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্তপরে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া কক্ষের ভিতর মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "রাজরাণী যে একেবারে হুকুম করে পাঠিয়েছেন! তা ত পাঠাবেই, কথায় বলে না,— বলি যদি এতই দরকার রাজরাণী গা তুলে একবার দয়া করে এখানে আসতে পারলেন না, এ বাড়ী এলে কি তাঁর মানের লাঘব হত,—"

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, মন্দাকিনী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ওর দোষ কি ঠাকুরঝি, ওকে কেন ও সব কথা বলছ, দেখ দেখি ভয়ে বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে, মানদার অবস্থাও ত জান, আজ বাদ কাল তার ছেলেপুলে হবে,—" হঠাৎ থামিয়া সুষমার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যা মা, তোর মা বুঝি শুয়ে আছে, উঠতে পারছে না, চল্ আমি এখনই যাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি খাট হইতে মেজের উপর নামিলেন।

সারদাসুন্দরী মুখখানি হাঁড়ির মত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে তাঁহার অতিরিক্ত স্থূল দেহ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। দরিদ্রের এ স্পর্দ্ধা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইতেছিল। ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ বৌ, অত সোহাগ ভাল না, তুমি নিজের ওজন বুঝে চলনা বলেই বৌটার অত সাহস বেড়ে গেছে। যাও, কিন্তু বলে রাখছি, এই বাড়াবাড়ির ফলভোগ একদিন তোমায় করতে হবে, তাও আমি দেখব।"

মন্দাকিনী মৃদু হাসিয়া সুষমার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুষমার পিতা তারাপদ সওদাগরী আপিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি করেন। বড় বংশে এবং ধনীর ঘরেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্যবসায় করিতে গিয়া ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়েন, ইচ্ছা করিলে তিনি কৌশল অবলম্বন করিয়া পাওনাদারদের ফাঁকি দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তিনি অঋণী হইয়াছেন। পুত্র তারাপদর জন্য মাত্র একখানি ছোট বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও মন্দাকিনীর স্বামী সদানন্দের নিকট চারি হাজার টাকায় বন্ধক দেওয়া আছে। পিতার মৃত্যুর পর তারাপদ যখন স্ত্রী ও একটী কন্যা লইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন তখন সদানন্দ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার এই চাকরী করিয়া দেন। সদানন্দ যে আপিসের বড়বাবু সেই আপিসেই তারাপদর চাকুরী হয়। তাঁহার পিতার আমলে সুদ হিসাবে যে চারি শত টাকা সদানন্দের পাওনা হইয়াছিল, তাহা তিনি ছাড়িয়া দেন এবং ভবিষ্যতে সুদ হিসাবে কিছু লইবেন না, একথাও তিনি তারাপদকে জানাইয়া দেন। সে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তারাপদর আর একটী পুত্র জন্মিয়াছে এবং তাঁহার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা।

তারাপদর পিতা যখন জীবিত ছিলেন তখন একটী উচ্চ প্রাচীর দুইটী বাড়ীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর মন্দাকিনীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সদানন্দ প্রাচীরের মধ্য পথে একটী দরজা বসাইয়া ভিতর দিয়া যাতায়াতের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। বিধবা ভগিনী সারদাসুন্দরী মাসাবধি যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া ইহাতে প্রবল আপত্তি করিয়াছিলেন, সদানন্দ তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া অবশেষে শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সারদার যত রাগ পড়িয়াছিল এই দরিদ্র পরিবারটির উপর। যাহাদের অভাবের অন্ত নাই, তাহারা কি জন্য বড়লোকের সহিত আত্মীয়তা করিতে আসে, যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া খাইবার মতলব ছাড়া এই আত্মীয়তা স্থাপনের মধ্যে আর কিছুই থাকিতে পারে না ইহাই তাহার অন্তরের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল।

মন্দাকিনী মানদার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যার উপর মানদা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে শয্যা প্রান্তে গিয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বড্ড কষ্ট হচ্ছে মাসু ?"

মানদা ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "সব যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না, এবার আর বাঁচব না দিদি।"

তাহার রক্তশূন্য মুখের দিকে চাহিয়া মন্দাকিনীর অন্তর শঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। কোন রকমে সে ভাব চাপিয়া তিনি কহিলেন, "ভয় কি, সেরে যাবে, আমি এখনই আপিসে খবর পাঠাচ্ছি, আর ডাক্তারবাবুকেও সঙ্গে করে আনতে বলে দিচ্ছি।" তারপর সুষমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "যা ত মা একবার ও বাড়ীতে, দশরথকে ডেকে নিয়ে আয়, বলবি বিশেষ দরকার বড় মা ডাকচেন।"

সংবাদ পাইয়া সারদাসুন্দরী কোন রকমে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একবার মানদার বেদনা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন্দাকিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "গরীব দুঃখীর এতটা অধৈর্য্য হওয়া কি ভাল, হয়েছে কি? দু-দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে, এত নতুন না, এত আদিখ্যেতা কিসের?"

মন্দাকিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও ত চুপ করে পড়ে আছে ঠাকুরঝি, ও ত কিছু করে নি, আমিই ত ব্যস্ত হয়েছি, যা বলতে হয়, বাড়ী ফিরে গেলে আমায় বল, এখানে না, এই মাত্র খেয়ে দেয়ে উঠলে, নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে।"

সারদাসুন্দরী ভ্রুকুটি-কুটিল কটাক্ষে কহিলেন, "এই চেঁচামেচি ডাকাডাকির চোটে কি বিশ্রাম করবার জো আছে, যাচ্ছিলাম তো একটু গড়াতে, এমন সময় ছুঁড়িটার গলা পেলাম—দশরথ দশরথ করে ডাকছে,—এই তোমাকে হুকুম দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল, আবার সঙ্গে সঙ্গে দশরথের ডাক পড়ল—ব্যাপারটা কি না জেনেই কি ছাই শুতে পারি, তাই ত হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলাম। কে জানে বাপু ঘরে শুয়ে শুয়ে এই সব আদিখ্যেতা করা হচ্ছে।"

এত যন্ত্রণার মধ্যে মানদা মন্দাকিনীর দিকে চাহিয়া কোন রকমে কহিল, "দিদি তুমি যাও দিদি, আমার কিচ্ছু হয় নি। গরীবের ভগবান আছেন।"

সারদাসুন্দরী ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "তা গাল দেবে বৈ কি, সত্যি কথা বললে গায়ে লাগবেই ত! বলি কত ঢঙই জান, এই ত ভিরমি গেছল।"

মানদা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন মরতে তোমায় ডেকেছিলাম দিদি! তুমি যাও।"

মন্দাকিনী ননদের দিকে চাহিয়া এইবার কঠিন হইয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি ঝগড়া করবার আর সময় পেলে না, তাই বাড়ী বয়ে এই সময় এসেছ ঝগড়া করতে! এখানে থাকবার কোন দরকার নেই তোমার, আমি যা ভাল বুঝব তাই করব, কারুর পরামর্শ আমি শুনতে চাই না, না না তুমি যাও মিথ্যে গোল কর না।"

সারদাসুন্দরী নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। মন্দাকিনীকে তিনি

বিশেষ করিয়াই জানিতেন, সে যেমন নরম হইয়া থাকিতে জানে তেমনই কঠোর হইতেও পারে, তখন কাহারও কোন খাতির সে রাখে না।

মানদার দুই চোখ দিয়া তখন ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া মন্দাকিনীর বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল, এমন সময় সুষমার পিছনে দশরথ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। তাহাকে যথাযথ উপদেশ দিয়া তিনি নিঃশব্দে মানদার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ডাক্তার বাবু ও তারাপদ প্রায় এক সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রোগিণীকে বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু নিভৃতে তারাপদকে কহিলেন, "দেখুন অবস্থা ভাল বলে মনে হচ্ছে না, এখনই হাঁসপাতালে পাঠান দরকার, বাড়ীতে চিকিৎসা করতে গেলে সে অনেক টাকার ব্যাপার, আপনি তা পেরে উঠবেন না। যা হ'ক আর দেরী করা চল:ব না।"

তারাপদ অসহায় ভাবে কহিলেন, "আমি আর কি বলব বলুন, আপনি ত আমার অবস্থা সবই জানেন, বাঁচবে ত ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "বাঁচবেনা, এমন কথা বলতে পারি না। আজকের রাতটা কি ভাবে যায় না দেখে ঠিক কিছু বলা যায় না।"

তারাপদ ভারি গলায় কহিলেন, "তা হ'লে অ্যাম্বুলেন্স ডাকি।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "তাই করুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

অ্যাম্বুলেন্স কথাটি কানে যাইতেই মন্দাকিনী রোগিণীর শয্যাপ্রান্ত ত্যাগ করিয়া অতি ব্যস্ত-ভাবে ডাক্তারবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

ব্যগ্র ভাবে মন্দাকিনী কহিলেন, "কি হয়েছে আমায় বলুন?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "অবস্থা খুব খারাপই হয়েছে, তাই হাঁসপাতালে—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "বাড়ীতে কি চিকিৎসা হ'তে পারে না? সে অবস্থা কি পার হ'য়ে গেছে?"

ডাক্তার কহিলেন, "না, তা এখনও হয় নি, বাড়ীতেও চিকিৎসা চলতে পারে, অনেক খরচ তাই—"

মন্দাকিনী কহিলেন, "খরচের জন্য ভাববেন না, আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন, আমাদের বাড়ী হ'লে যে ব্যবস্থা করতেন তাই করুন।"

ডাক্তার কহিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে তাই করছি—"

তারপর তারাপদর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অ্যাম্বুলেন্স ডাকবার আর দরকার নেই, আমি

লিখে দিচ্ছি এই ওষুধটা এখনই নিয়ে আসুন, তারপর অন্য ডাক্তার আর নার্সের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি, আমি এখানে রইলাম, আপনি ভাববেন না।"

ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যবস্থাই হইয়া গেল। ধাত্রী-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ দুই জন বড় ডাক্তার আসিলেন, একজন বিলাতী নার্স আসিল, হরেক রকম যন্ত্রপাতি আসিল, আয়োজনের কোন ত্রুটীই হইল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ করিয়া সকলে স্থির করিলেন, পেটের ভিতর হইতে জীবন্ত সন্তানটীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে, তবে মাতার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, অবিলম্বে তাহা না করিলে সন্তান ও মাতা উভয়ে মারা পড়িবে —সন্তান যে অবস্থায় পেটের ভিতর আছে এ অবস্থায় কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। অগত্যা শিশু হত্যা করাই সাব্যস্ত হইল।

মন্দাকিনী শুনিয়া তাহার স্বামীকে ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ গা, একটা জ্যান্ত ছেলেকে মেরে ফেলবে? বড় বড় দু'জন ডাক্তার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না?"

সদানন্দ কহিলেন, "তাই ত ওঁরা বলছেন, মাকে বাঁচাতে হ'লে শিশুকে মারতে হবে, তবে শিশুকে তাঁরা বাঁচাতে পারেন, তাতে মাকে বাঁচান যাবে না।"

মন্দাকিনী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি আর কি বলিবেন? তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—একটী সন্তানের জন্য কত পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহারই মত কত বন্ধ্যা নারীর বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, আর সেই অমূল্য রত্নকে ইহারা স্বচ্ছন্দে হত্যা করিবে! তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সদানন্দ আর কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সারদাসুন্দরীও সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি সহানুভূতির স্বরে কহিলেন, "বৌ কেঁদে আর কি করবে বল, সবই ভগবানের হাত, তুমি যা করেছ, পরের জন্যে পরকে এমন করতে কখনও শুনিনি দেখিনি, পয়সাকে পয়সা বলে তুমি গ্রাহ্য করলে না, টাকা ত অনেকের থাকে, কে এমন করে পরের জন্যে খরচ করে বল ত বৌ, তোমার ত আর দুঃখ করবার কিছু নেই।"

মন্দাকিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা একটা জ্যান্ত ছেলেকে যে মেরে ফেল্‌তে যাচ্ছে ঠাকুরঝি—একটা ছেলের জন্যে—"

সারদাসুন্দরী কহিলেন, "তার আর কি করবে বৌ! এ ত আর মানুষের হাত ধরা নয়। এখন বৌটা বেঁচে উঠলে তোমার টাকা খরচ করা সার্থক হয়।"

মন্দাকিনী কহিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বল ঠাকুরঝি, মানদা বেঁচে উঠুক—"

শিশুহত্যা করিবার সমস্ত যন্ত্রপাতি সাজাইয়া লইয়া ডাক্তারেরা সুসজ্জিত হইয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। একজন ডাক্তার রোগিণীর বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অপর-জন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া

এক হৃষ্টপুষ্ট শিশু আপনিই ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল। ডাক্তারেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া অবাক্-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

খানিকপরে ডাক্তারেরা তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কক্ষের বাহির হইয়া আসিলে মন্দাকিনী ছুটিয়া গিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সবলকায় শিশুটির পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা এই সোণার চাঁদকে মেরে ফেলছিলরে!"

২

যাহা হউক মাতা ও পুত্র এযাত্রা দুই জনেই বাঁচিয়া গেল। মন্দাকিনী সেই যে ছেলেটাকে কোলে লইয়া বসিলেন সে রাত্রে আর উঠিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া মা কালীবাড়ীর পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার আনন্দ আর ধরে না! স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে কহিলেন, "আহা ছেলে নয় যেন সোণার চাঁদ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

সদানন্দ নিঃশব্দে হাসিলেন, সে হাসির মধ্যে যে গোপন ব্যথা লুক্কায়িত ছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। তিনি কহিলেন, "ছেলেটাকে না হয় তোমার নিজের করেই নিয়ো।"

আনন্দ-বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "সত্যি বলছ?"

সদানন্দ সহাস্যমুখে কহিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ সত্যি বলছি, তোমার মা হবার সাধ ত মিটবে।"

মন্দাকিনীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া গলায় অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। তাঁহার মনে হইল একটী ক্ষুদ্র শিশুর কলকণ্ঠে তাহার নিরানন্দ গৃহখানি সহসা যেন আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মন্দাকিনী যখন স্নান করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, সারদাসুন্দরী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "তোমার হ'ল কি বৌ! পরের ছেলের জন্যে শেষে কি একটা রোগ বাধাবে। সকাল নেই, বিকেল নেই, আতুড়ে ছেলে কোলে করে বসে আছ, কসুর ত কিছু কর নি, একেবারে পাশকরা দাই এনে আঁতুড়ে হামেহাল বসিয়ে রেখেছ, তবু তোমার আঁতুড়ে না গেলে নয়!"

মন্দাকিনী তাঁহার তিরস্কারে বিন্দুমাত্র রাগ করিলেন না, হাসিয়া কহিলেন, "ছেলেটাকে কিছুতে যে ফেলে আসতে পারিনি ঠাকুরঝি, কি করব বল ভাই, সাধ করে কি অবেলায় নেয়ে মরি, পারিনে যে ভাই।"

সারদাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার কথা শুনলে রাগে গা জ্বলে পুড়েও যায়, আবার হাসিও পায়। পরের ছেলের জন্যে শেষকালে দেখছি পাগল না হ'য়ে যাও বৌ!"
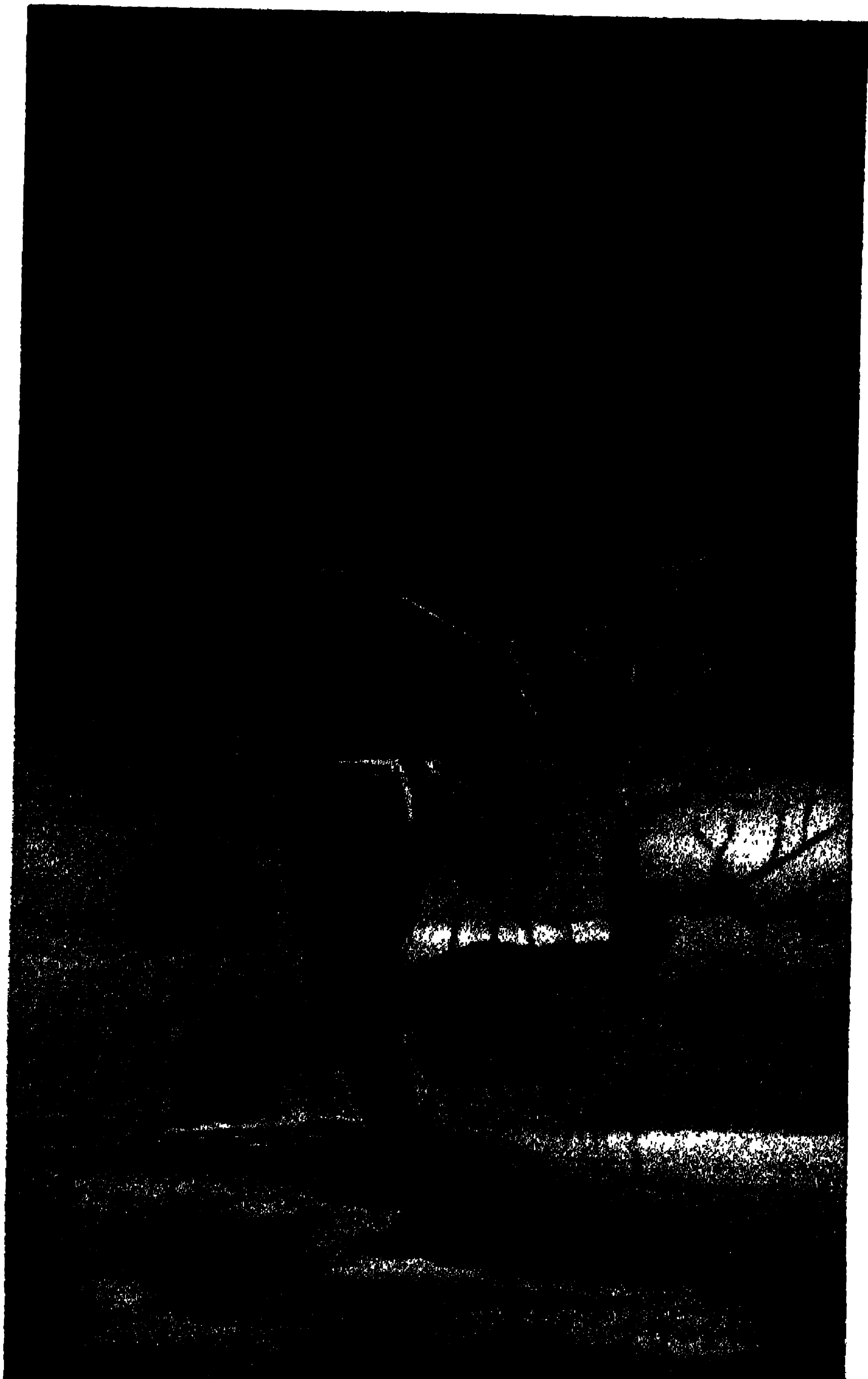
মন্দাকিনী গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "ওকে যে কিছুতেই পরের ছেলে মনে করতে পারি না ভাই, তোমায় সত্যি বলছি ঠাকুরঝি আমার যেন মনে হয় ও আমারি ছেলে, তাই ত ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে বসি, কি যে আনন্দ হয় ঠাকুরঝি তা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না ভাই।"

সারদাসুন্দরী শুধু অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না।

অন্য লোকের সত্যই অবাক হইবার কথা! এই দুই পরিবারের অবস্থার আকাশপাতাল তফাৎ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না, তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। অথচ মন্দাকিনী ভোর হইতে না হইতে আঁতুড় ঘরে গিয়া ছেলে কোলে করিয়া বসেন, স্বামীর] আহারের সময় একবার উঠিয়া আসেন, স্নান করিয়া সম্মুখে বসিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া, তাঁহার পাতে দুটী খাইয়া, স্বামী আপিস চলিয়া গেলে আবার গিয়া আঁতুড়ে ঢোকেন, স্বামীর আপিস প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহাকে কত আদর করেন, আপন মনে তাহার সহিত কত কথা বলেন। অপরাহ্নে স্বামী জলযোগ সারিয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া আবার যখন বেড়াইতে বাহির হইয়া যান, মন্দাকিনী আবার আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলে কোলে তুলিয়া লন, তার পর গভীর রাত্রে গৃহে ফিরেন। সারদাসুন্দরী দিনে অন্ততঃ চার পাঁচবার তাঁহাকে কঠিন তীব্র তিরস্কার করেন, কিন্তু তিনি শুধু হাসেন, কোন উত্তর দেন না।

দিন তিনেক পরে সারদাসুন্দরী সদানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "দাদা, বৌকে তুমি কিছু বলবেনা, আমি ত বলে বলে হায়রাণ হয়ে গেলাম।"

সদানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই যখন পারলে না সারদা, তখন আমি বললে আর কি হবে! দিনে ত ঐ করে বেড়ায়, রাত্রে হঠাৎ খোকা খোকা বলে এমন চেঁচিয়ে ওঠে!"

সারদাসুন্দরী গালে হাত দিয়া কহিলেম, "তবুও তুমি হাসছ দাদা, সারাদিন ঐ কাণ্ড করে বেড়ায়, আবার তোমার মুখেই শুনলাম রাত্রে খামকা চেঁচিয়ে ওঠে,—পাগলের লক্ষণ ছাড়া আর কি বলব, নিশ্চয়ই ছুঁড়িটা ওকে গুণ করেছে, আর দেরী কর না, ভাল কবিরাজের ব্যবস্থা কর, ঝাড়ফুঁক জানে এমন গুণীরও আমি সন্ধান করি, তুমি আর অমন ক'রে হেস না দাদা।" এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিতভাবে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

রাত্রের ব্যাপারটা সদানন্দ এতটুকু অতিরঞ্জিত করিয়া বলে নাই। সত্যই মন্দাকিনী ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে খোকা খোকা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। সদানন্দের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, গোপনব্যথায় তাঁহার বুক টন্‌টন্ করিয়া উঠে।

এমনই ভাবে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। মানদা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। ছলছল চোখে ধরা গলায় সে মন্দাকিনীকে কহিল, "দিদি তোমারই দয়ায় খোকাকে আমরা ফিরিয়ে

পেয়েছি,—তুমি দয়া না করলে খোকাও বাঁচত না, আমিও বাঁচতাম না। আমাদের জন্ম কি কষ্টই না সহ্য করেছ দিদি!"

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "তাই নাকি! বেশ বকশিশ দে।"

মানদা কহিল, "তোমার এ ধার যে-শোধবার নয় দিদি।"

মন্দাকিনী হাসিমুখে কহিলেন, "খোকাকে আমায় দিয়ে দে, তা হ'লে তোর সব শোধ হয়ে যাবে।"

মানদা সানন্দে কহিল, "ও কথা কেন বলছ, দিদি, ও ত তোমারই, তুমি না থাকলে ওকে ত আমরা পেতামই না।"

মন্দাকিনী কহিলেন, "তা হ'লে আজ থেকে কিন্তু খোকা আমার?"

মানদা হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিদি খোকা তোমার।"

মন্দাকিনী তখন খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন। দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া তিনি বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন, তার পর মুখের কাছে তাহার কচি মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর মানদার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

মানদা কহিল, "তুমি কখন থেকে নিয়ে আছ দিদি, তোমার ভারী কষ্ট হচ্ছে, আমায় দাও দিদি!"

কষ্ট! তাঁহার বুকের মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস গুমরিয়া উঠিল। প্রাণপণবলে তাহা চাপিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "না না তোমার শরীর এখনও ভারি কাহিল, খোকা আমার কাছে থাক।"

মানদা হাসিয়া কহিল, "আমার শরীর বেশ সেরে গেছে দিদি, খোকাকে নিতে আমার কোন কষ্ট হবে না; তা ছাড়া ছেলে বয়ে বয়ে আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে, ওতে ত আমার কোন কষ্ট হয় না, তোমার ত ছেলেটানা অভ্যাস নেই, তোমার যে খুবই কষ্ট হয় দিদি।"

কথাটা অতি সরল সত্য, তবুও ইহার আঘাত যেন পুত্রহীনা বন্ধ্যা নারীর অন্তরে গিয়া বিষম বাজিল! মানদা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর খোকা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, মন্দাকিনীর বুকের বেদনা যেন কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেল, শিশুর কান্না থামাইবার জন্ম নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিলেন। বসিয়া বসিয়া তাহাকে কোলের উপর নাচাইলেন, লক্ষ্মী আমার, যাদু আমার, না না কাঁদে না, এমনই কত কি অনভ্যস্থ কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিশুর কান্না কিছুতেই থামে না। তারপর তিনি তাহাকে বুকে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার কত রকমের কথা বলিয়া এধার ওধার পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তবুও খোকার কান্না থামে না, সে একবার মুহূর্তের জন্ম চুপ করে আবার কাঁদিয়া ওঠে। মন্দাকিনী একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

মানদা হাসিয়া কহিল, "দেখছ কি রকম দুষ্টু ছেলে দিদি, কিছুতেই থামবে না।"

মন্দাকিনী একবার মানদার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের সেই হাসি তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকার মত তাঁহার বুকে আসিয়া বিঁধিল। উঃ এই হাসির ভিতর দিয়া সে তাহাকে বুঝাইতে চাহে, 'দিদি তুমি এত চেষ্টা করিয়াও ত খোকার কান্না থামাইতে পারিলে না, আমার কোলে একবার দাও দিকি, আমি কেমন এক নিমেষে খোকার কান্না থামাইয়া দি।' বিধিনির্ব্বন্ধে ভাগ্যহীনা সে—সন্তানের জননী হইতে পারে নাই, তাই ত তাহার প্রতি ভাগ্যবতীর এই অবজ্ঞা প্রদর্শন! অজ্ঞাতসারে এক অননুভূতপূর্ব্ব হিংসার জ্বালায় ত মন্দাকিনীর অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। খোকা তাঁহার কোলের উপর তখন তেমনই ভাবে কাঁদিতেছিল। তাঁহার অন্তর চীৎকার করিয়া কহিল, "না না খোকাকে কিছুতেই মানদার কোলে দিব না, যেমন করিয়াই পারি আমিই তাহাকে থামাইব।' তিনি আবার কান্না থামাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গেল, তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

মানদা কহিল, "একবার মাই না খেলে ও কিছুতে থামবে না দিদি।"

মন্দাকিনী চমকিয়া উঠিলেন। তাই ত তাহার মনে পড়ে নাই। সে যে সন্তানহীনা বন্ধ্যা। হায় ভগবান, পরের পেটের সন্তানকে আপন সন্তান জ্ঞানে বক্ষে ধারণ করিবার অধিকারই যদি দিলে, তবে তাহার শুষ্ক স্তন দুগ্ধে প্লাবিত করিয়া দিলে না কেন? অতিকষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া তিনি রোরুদ্যমান শিশুকে জননীর কোলে তুলিয়া দিলেন।

জননীর কোলে যাইতেই খোকার কান্না যেন যাদুমন্ত্রে থামিয়া গেল, মানদা স্তনটি তাহার মুখে ধরিতেই, সে মহানন্দে টানিতে লাগিল।

পুত্রহীনা আর এক নারী চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

৩

দুইটী নারীর বিভক্ত স্নেহের মধ্যে শশীকলার ন্যায় খোকা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মন্দাকিনীর ক্রোড়ের উপর যখন সে হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করে, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মনে হয় পৃথিবীতে উহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু নাই! খোকা যখন স্খলিত চরণে তাঁহার বুকের উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে নাচিতে গভীর আনন্দে তাঁহার নাক মুখ সমস্ত লালায় ভরিয়া দেয়, তখন তিনি চক্ষু মুদিয়া যে তৃপ্তি অনুভব করেন, বোধ করি ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কখনও কিছুতে এত তৃপ্তি অনুভব করেন নাই!

খোকা ক্রমে হামা দিতে শিখিল, ঘরময় তাহার মাতামাতি দেখে কে! ঘরের যেখানে যাহা কিছু থাকে, তাহাই ধরিয়া সে টানাটানি করে, এদিকে ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সুবিধামত দুই একটা বা মুখে পুরিয়া ফেলে।

সারদাসুন্দরীর চোখে পড়িলে তিনি হা হা করিয়া ছুটিয়া আসেন, ভৎর্সনাসূচক দৃষ্টিতে মন্দাকিনীর দিকে চাহিয়া বলেন, "তুমি কি গা বৌ, বসে বসে দিব্যি হাসছ, ঘরের জিনিষগুলো যে একেবারে তচনচ করে দিচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছ না।"

মন্দাকিনীর হাসির উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়া যায়। সারদাসুন্দরী রাগে গসগস করিতে করিতে চলিয়া যান।

একদিন মধ্যাহ্নে মানদা আসিয়া দেখিল, খোকা মন্দাকিনীর সাজান ঘরখানি একেবারে চষিয়া ফেলিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই বুঝি এমনই করে দিদিকে রোজ জ্বালাতন করিস, না তোকে আর এখানে আসতে দেব না। এমন দুষ্টু ছেলেও ত কোথাও দেখিনি।"

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "কেন তুমি ওকে বকছ, ও ত তোমার ঘর নোংরা করতে যায় নি, ও কি তোমার ছেলে না কি যে তুমি ওকে তোমার ঘরে পুরে আটকে রাখবে।"

মানদা কহিল, "না দিদি তুমি বোঝ না,—এখন থেকে ওকে ধরাকাট না করলে, দুদিন পরে ও যখন হাঁটতে শিখবে, তখন কি আর ও কিছু আস্ত রাখবে সব ভেঙে তচনচ করে দেবে।"

মন্দাকিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "দেয় দেবে, ওর জিনিস ও ভেঙে গুড়ো করে ফেলবে তাতে তোর কি লা,—তোর কি আর কোন কাজ নেই; যে বাড়ী বয়ে খোকার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিস।"

মানদা হাসিয়া কহিল, "বেশ দিদি আর কিছু বলব না, পরে কিন্তু আমায় দুষো না,—এমন ছেলেও পেটে ধরিছিলি।"

মন্দাকিনী কহিলেন, "যা যা তোর আর বাক্‌চাতুরী করতে হবে না। পেটে ধরেছিলি বলে ত ও ছেলে তোর নয়, আমার—আমার ছেলে যা খুসী করবে তাতে তোকে দুষতে যাব কেন লা?"

মানদা হাসিয়া চুপ করিল।

ইহারই সপ্তাহ খানেক পরে, এক অপরাহ্নে খোকাকে এক গা গহনা পরাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া মন্দাকিনী মানদার বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় সারদাসুন্দরী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খোকার দেহের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই গা-ভরা গয়না তুমি ছোঁড়াটার জন্যে তৈরী করিয়ে আনালে না কি বৌ?"

ছোঁড়া কথাটা মন্দাকিনীর বুকে গিয়া খক্ করিয়া বাজিল। সে আঘাত সামলাইয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "দেখতে পাচ্ছ না ঠাকুরঝি এ সবই নতুন গয়না, খোকার জন্যে ফরমাস দিয়ে তৈরী করিয়ে এনেছি।"

সারদাসুন্দরী দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "কি বলছ বৌ, সত্যিই কি তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। এ কি কম টাকার গয়না—কোথাকার কে একটা পরের ছেলের জন্যে এত গয়না গড়ানই বা কেন ?"

মন্দাকিনী কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তারপর কথাটা একটু অন্য ভাবে বলিলেন, কহিলেন, "এ আর কটা টাকার গহনা ঠাকুরঝি, আমাদের আর কে আছে বল।"

সারদাসুন্দরী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তাই বলে এমনই করে টাকাগুলো নষ্ট করবে নাকি ? দানধর্ম্ম করলেও ত পরকালের কাজ হবে।"

"আমি অত পরকাল বুঝিনি ঠাকুরঝি" বলিয়া মন্দাকিনী ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন ; মানদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই দেখ ত গয়নাগুলো কেমন হ'ল ?"

খোকার দেহের পানে চাহিয়া মানদা স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "কি লা একেবারে বোবা হ'য়ে গেলি যে ?"

মানদা কহিল, "কি আর বলব দিদি, এত দামী সব গয়না তুমি খোকাকে গড়িয়ে দিয়েছ !"

মন্দাকিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "কেন লা, আমার ছেলে বুঝি দামী গয়না পরতে পারে না !"

মানদা এইবার হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "হ্যাঁ সে কথা ভুলে গেছলাম দিদি, ও যে তোমার ছেলে।"

দিন কতক পরে সদানন্দ আপিস হইতে গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মন্দাকিনী খোকাকে কোলে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "ওগো দেখ দেখ খোকা কেমন কথা বল্‌তে শিখেছে,—বল ত খোকা, মা বাবা।"

খোকা কিন্তু তাঁহার কথা কানেই তুলিল না। একটা পুতুল তাহার হাতে ছিল, তাহারই নাক কামড়াইয়া মুখ কামড়াইয়া মাথা কামড়াইয়া খেলায় মজগুল হইয়া রহিল।

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "দেখেছ খোকা কেমন দুষ্ট, তোমার সামনে কিছুতেই বলবে না।"

সদানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "তা না বলুক, তোমাকে ত মা বলে ডেকেছে।"

আনন্দ-উদ্বেল মুখে মন্দাকিনী বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ তা বলেছে, একবার নয়, কতবার বলেছে, মা, মা, মা।"

খোকা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, মা, মা।"

মন্দাকিনী আনন্দে আত্মহারা হইয়া কহিলেন, "ওগো ঐ শুনলে, খোকা শুধু মা বলে না, বাবাও বলে, এখন বল্‌লে না !"

৪

খোকা ক্রমে হাঁটিতে, দৌড়াইতে শিখিল, অনেক কথাও বলিতে শিখিল,—মা, বাবা, দাদা, দিদি, বড়মা,—আরও কত কি। সে বেশ স্পষ্ট করিয়াই সব কথা বলে, তাহার বড় দুই ভাই-বোনের দেখাদেখি সে মন্দাকিনীকে বড়মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম যেদিন সে তাঁহাকে বড়মা বলিয়া ডাকিল, তখন কথাটা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার অন্তরে গিয়া বাজিল। খোকা কেন তাহাকে বড়মা বলিয়া ডাকিবে? প্রত্যহ তাহাকে পাখীপড়ানর মত করিয়া শিখাইতে হইবে,—বল্ মা, মা, বড়মা না। মন্দাকিনী গোপনে তাহাকে শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট খোকা কিছুতেই তাহাকে মা বলিতে চাহিল না, সে বলিতে লাগিল, 'দূর তুমি ত আমার বড়মা, মা কেন হবে, মা ত ঐ বাড়ীতে থাকে।' শেষে মন্দাকিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, না আর দেরী করা চলিবে না, এখন খোকা ত বেশ বড় হইয়াছে, এখন ত সে মানদাকে ছাড়িয়া রাত্রে তাহার কাছে শুইয়া ঘুমায়, মাতৃস্তন্যের প্রতিও তাহার আর ত তেমন আসক্তি নাই।

সেই রাত্রেই মন্দাকিনী স্বামীকে কহিলেন, "ওগো আর ত দেরী করা চলে না, পুরুত-মশায়কে ডেকে একটা দিন স্থির করে ফেল।"

সদানন্দ কহিলেন, "বেশ! কাল সকালেই ডেকে পাঠাব।"

মন্দাকিনী কহিলেন, "হ্যাঁ গা শুধু হাতে ত আর ছেলে নেওয়া যাবে না, ওদের কিছু দিতে থুতে হবে ত?"

সদানন্দ কহিলেন, "হ্যাঁ তা ত দিতেই হবে। তাও আমি একটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি বাড়ীর দলিলখানা তারাপদকে লিখেপড়ে ফেরত দিয়ে দেব, সুদ ত নেবই না বলেছি আসলই ত চারহাজার টাকা, আর নগদ হাজার দুই টাকা দেব।"

মন্দাকিনী খুসী হইয়া কহিলেন, "তা হ'লেই ঢের হবে।"

সদানন্দ কহিলেন, "তা ছাড়া সবই ত একদিন ঐ তারাপদর ছেলেই পাবে।"

মন্দাকিনী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "তারাপদর ছেলে কি রকম? হোম করে ছেলে নেবে, সে ত তখন তোমারই ছেলে হবে, তোমার বংশের পরিচয়েই ত তার পরিচয় হবে।"

সদানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "তা ত হবে, কিন্তু যেমন করেই তাকে নাও, বড় হয়ে সে ত জানবে, সে সত্যি কার ছেলে, তখন সে তার বাবা মা ভাই বোনকে নিয়ে সংসার পেতে থাকতে পারে, যাক, সে সব কথা আমাদের ভাববার দরকার নেই। আমরা যথারীতি শাস্ত্রমতে তাকে গ্রহণ করব তা হ'লেই হ'ল।"

মন্দাকিনী এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিলেন, "দেখ খুব ঘটা করে কিন্তু লোকজন খাওয়াতে হবে।"

সদানন্দ কহিলেন "বেশ ত খাইয়ো।"

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। মন্দাকিনী কহিলেন, "দেখ, সব কাজ চুকে টুকে গেলে, আমরা খোকাকে নিয়ে মাস ছয়েক কাশীর বাড়ীতে গিয়ে থাকব। তুমি কিন্তু আগে থেকেই ছুটির ব্যবস্থা করে রেখো। বাপ মা ভাই বোনের কাছ থেকে কিছুদিন একেবারে আলাদা করে রাখতে না পারলে খোকাকে আপনার করে নেওয়া ভারি শক্ত হবে, ভাইবোনদের দেখাদেখি খোকা আমায় বড় 'মা' বলতে চায় না। ছোট ছেলে যা শোনে তাই বলে, ওর আর কি দোষ বল, কিছুদিন তফাতে থাকলে ও কাকে কি ব'লতে হয় তা শিখে নে'বে।"

সদানন্দ কহিলেন, "হঁ্যা তা নেবে বৈ কি। ছুটির ব্যবস্থা আমি করে রাখব, এদিকে সব ঠিক হয়ে যাক।"

পরদিন সকালে পুরুতমহাশয় আসিয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন। সামনের মাসের ১০ই খুব ভাল দিন।

সদানন্দ কহিলেন, "তা হ'লে তুমি তাদের দিনটা একবার জানিয়ে রেখ।"

মন্দাকিনী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "আজই জানিয়ে রাখব, ঠাকুরঝিকেও কথাটা এইবার বলব, কি বল? সে ত ভেতরের কথা জানে না, তাই খোকাকে এত আদর যত্ন করি, গয়না-গাঁটি, জামা-কাপড় দিই বলে সে আমার ওপর কত রাগ করে। এইবার আর সে রাগ করবে না।"

সদানন্দ কহিলেন, "ওদের খবরটা দিয়ে, তার পর বল!"

মধ্যাহ্নে আহারের পরই মন্দাকিনী মানদার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত মুখখানি হাসিতে ভরিয়া তিনি কহিলেন, "দিন স্থির হয়ে গেল ভাই। সামনে মাসের ১০ই খুব ভাল দিন।"

মানদা কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কিসের দিন দিদি?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "তুই অবাক করলি যে,—আমার কি পেটের একটা মেয়ে আছে যে তার বিয়ের দিন স্থির করে তোকে জানাতে এসেছি! ছেলে তুই দিলি আর আমি নিলাম, তা হ'লে ত আর চলবে না, একটা হোম টোম করে নিতে হবে ত; এইবার বুঝলি কিসের দিন।"

মানদা অধিকতর বিস্মিতভাবে কহিল, "না দিদি, কিছু ত বুঝতে পারলাম না।"

মন্দাকিনীও এইবার কেমন যেন বিস্ময় বোধ করিলেন। এই সোজা সরল কথা মানদা বুঝিতে পারিল না! আর কত স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা বলিবে? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া

তিনি কহিলেন, "পোষ্যপুত্র নিতে হ'লে যে যাগযজ্ঞ ক'রে নিতে হয়, তাও তুই জানিস নি ?"

মানদা যেন এইবার কথাটা কতক বুঝিল, কহিল, "তাই বল দিদি, তুমি পুষ্যিপুত্তর নিচ্ছ। হঁ্যা দিদি কাকে নিচ্ছ ?"

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "আ-মলো কথার ছিরি দেখ—যেন রাস্তার রেমো শ্যেমো কাউকে ডেকে এনে আমি পুষ্যিপুত্তর নিচ্ছি! কেন তুই আমার কাছে বাক্যদত্তা আছিস তা বুঝি ভুলে গেলি ?"

মানদা চমকিয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন তোলপাড় করিতে লাগিল। ব্যাকুল স্বরে সে কহিল, "তুমি কি বলছ দিদি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি স্পষ্ট করে আমায় বুঝিয়ে বল।"

মন্দাকিনী তাহার বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খোকাকে যে তুই আমাকে দিয়েছিস, ১০ই তারিখে যাগযজ্ঞ করে সকলকে ত জানিয়ে দিতে হবে। এইবার বুঝলি।"

মানদা অস্থিরচিত্তে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি খোকাকে পুষ্যিপুত্তর নেবে দিদি ?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "হঁ্যা রে হঁ্যা! কথাটা কি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

মানদা যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল। তাহার খোকাকে যাগযজ্ঞ করিয়া পরকে বিলাইয়া দিতে হইবে! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। কি সর্ব্বনাশ! তাহার এক একখানি বক্ষপঞ্জর যেন খসিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে! "ও দিদি এমন করে ছেলে বিলিয়ে দিতে পারব না দিদি," বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সে ছুটিয়া চ'লিয়া গেল।

মন্দাকিনী আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন শুব্ধ হইয়া গেল! কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ যেন তাঁহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি আশে পাশে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কক্ষ শূন্য, খোকা কাছে নাই, বিরাট শূন্যতা যেন মুখব্যাদন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! এতদিন কল্পনায় যে বিচিত্র সুখ-সৌধ সে রচনা করিয়াছিল, তাহা যেন চারিদিক হইতে ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে। তাহার নিঃশ্বাস যে রুদ্ধ হইয়া আসিল! তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, টলিতে টলিতে কোন রকমে তিনি অগ্রসর হইলেন, কোথায় যাইতেছেন কোন হুঁসই যেন তাঁহার ছিল না, সম্মুখে ধূ ধূ মরু প্রান্তর, ঝাপসা আলোয় যেন সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। কেমন করিয়া যে তিনি নিজের শয়ন কক্ষতলে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, "খোকারে।"
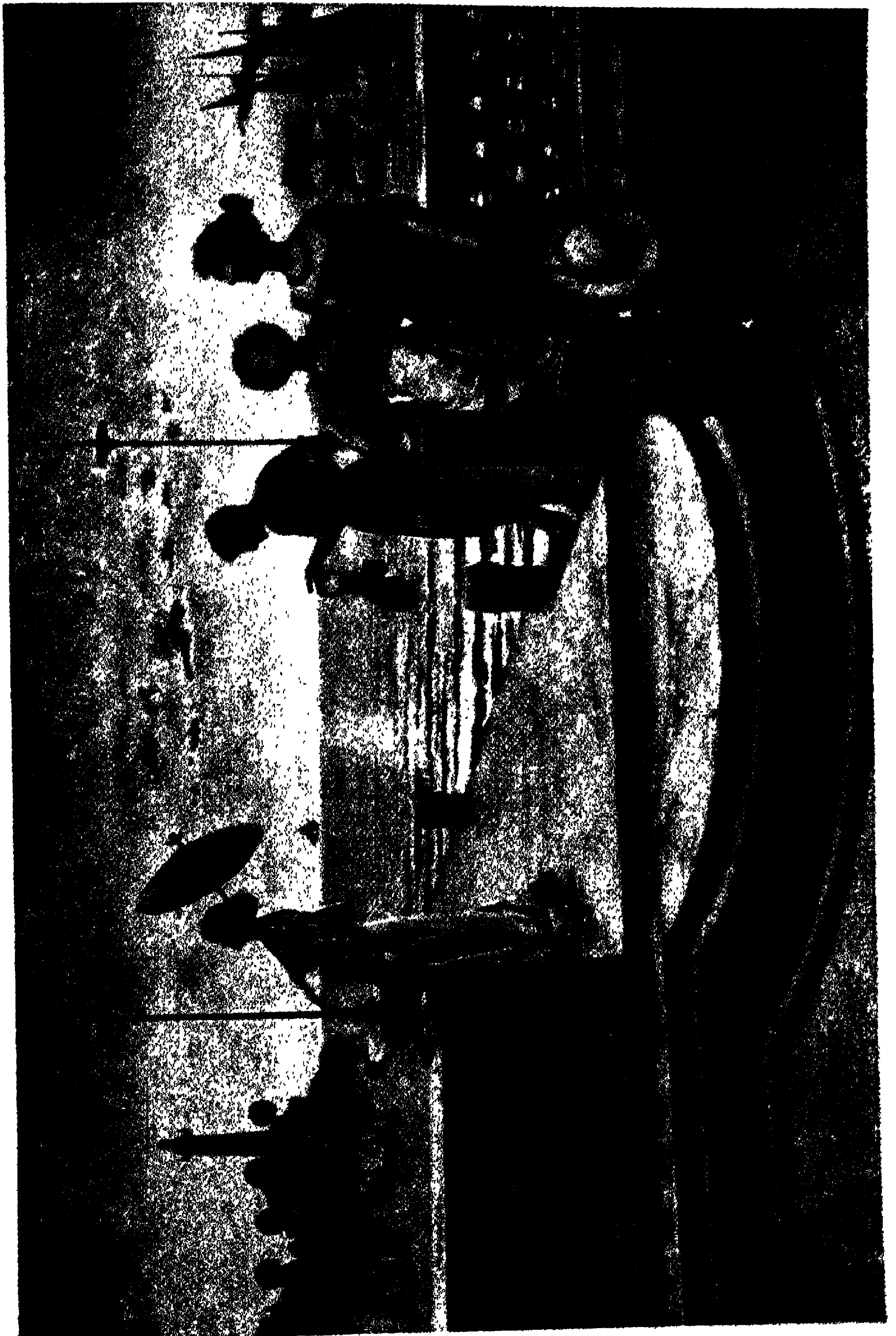
তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী চীৎকার শুনিয়া সারদাসুন্দরী হন্তদন্ত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। ভূলুণ্ঠিত দেহের পানে চাহিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'য়েছে বৌ?" কোন সাড়া পাইলেন না। তখন তিনি ভীত ভাবে মেঝের উপব বসিয়া পড়িয়া তাঁহার লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এ কি! হাউমাউ কবিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন। দাসী চাকর যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া আসিল। কেহ কুজা হইতে জল ঢালিয়া মূর্চ্ছিতা মন্দাকিনীর মাথায় মুখে ছিটাইয়া দিতে লাগিল, কেহ পাখা লইয়া হাওয়া দিতে লাগিল। একজন সদানন্দকে সংবাদ দিবার জন্য আপিস অভিমুখে ছুটিল।

সদানন্দ যখন আপিস হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তখন মন্দাকিনীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে, কখনও তিনি বক্ষে করাঘাত করিতে যাইতেছেন, কখনও চুল ছিঁড়িতে উদ্যত হইতেছেন, আর সারদা-সুন্দরী প্রাণপণবলে তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভ্রাতার দিকে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস, আমি ত কিছুতেই বৌকে ঠেকাতে পারছি না।"

স্বামীর আগমনে মুহূর্ত্তের মধ্যে মন্দাকিনী যেন শান্ত ভাব ধারণ করিলেন, অত্যন্ত করুণ দীন নয়নে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া তিনি ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "আমি সব হারিয়েছি, আমি রাক্ষসী কিনা, তাই খোকাকে তার মা আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।"

সদানন্দ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পত্নীর নিকটে গিয়া বসিলেন।

সারদাসুন্দরী ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সদানন্দ পত্নীর দেহে হস্ত স্থাপন করিয়া গদগদকণ্ঠে ডাকিলেন, "মন্দা!"

মন্দাকিনী দুই অবসন্ন বাহুলতা দিয়া স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইলেন। তারপর সে কি কান্না! বোধ কবি যত অশ্রু তাঁহার দুই চোখের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, সমস্তই স্বামীর কাঁধের উপর নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িল। কান্না থামিলে তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সদানন্দের মনে হইল যেন বিষাদ মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রবল ঝড় বৃষ্টিব পর বিধ্বস্ত শাখাপত্র পুষ্প শেফালি বৃক্ষের রূপ যে ভাবে বদলাইয়া যায়, মন্দাকিনীর রূপও যেন ঠিক সেইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সদানন্দ প্রাণপণ বলে নিজেকে দমন করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

মন্দাকিনী ছেলে মানুষের মত অভিমান-জড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ আহ্লাদ করে তারিখের কথা বল্‌তে গেলাম, আর আমায় বললে কিনা, না না এমন করে আমি ছেলে বিলিয়ে দিতে পারব না গো পারব না,—আমি যেন রাক্ষুসী, তার ছেলে কেড়ে নিতে এসেছি, তাই সে তার ছেলেকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে আমার সামনে থেকে নিয়ে ছুটে চলে গেল। হ্যাঁ গা আমি কি নিয়ে থাকব, তুমিই বল না খোকাকে ফেলে কেমন করে থাকব?"

সদানন্দ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "খোকাকে আমি এনে দেব।"

আনন্দ বিহ্বল হইয়া মন্দাকিনী বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ এনে দেবে, খোকাকে এনে দেবে, তাকে আবার আমি কোলে নিতে পাব ?"

সদানন্দ-কহিলেন, "পাবে বৈ কি। তুমি কথাটাকে বোধ হয় তাকে বুঝিয়ে বল নি, বাড়ীটা ফিরিয়ে পাবে, দু'হাজার টাকা পাবে এ সব কথা তাকে কিছু বল নি ?"

মন্দাকিনী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, তা ত কিছু বলি নি, সে কথা শুনলে ঠিক খোকাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে না গো ?"

সদানন্দ কহিলেন, "দেবে বৈকি। আমি এখনই তারাপদর কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তারাপদ বাড়ীতেই আছে, সে আমার সঙ্গেই আপিস থেকে এসেছে, আরও দু'তিন জন বাবুও আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা বাইরে বসে আছেন, আমি এখনই গিয়ে তাঁদের এক জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি কেন ভাবছ মন্দা।"

মন্দাকিনী নিরুদ্বেগে কহিলেন, "না, আর ভাবব না ত, হ্যাঁ গা কত দেরী হবে ?"

সদানন্দ কহিলেন, "দেরী আর বিশেষ কি হবে। আমি তা'হলে যাই ?"

মন্দাকিনী বেশ শান্ত ভাবে কহিলেন, "এস।"

সদানন্দ বাহিরে গিয়া তাঁহারই এক সহকর্মীকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া তারাপদর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই ভদ্রলোকটি গম্ভীর মুখে ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, তারাপদ তাহার পুত্রকে দত্তক দিতে রাজি নহে তাহার এবং তাহার স্ত্রীর পিতৃকুলে কেহ কখনও সন্তান বিক্রয় করে নাই। তাহার পুত্রটিকে যে ভাবে ইচ্ছা তাঁহারা লালন পালন করুন, তাহাতে তাহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সে কিছুতেই পুত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না।

আসন্নবর্ষণ মেঘের মত সদানন্দ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর সহজ ভাবে কহিলেন, "আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম। আর আপনারা দেরী করবেন না, আপিস থেকে এখনও বাড়ী যান নি।"

তাঁহারা সবলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সদানন্দ তেমনই গম্ভীর ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলেন।

শয়নকক্ষে গিয়া যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, মন্দাকিনী নিঃশব্দে ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন।

মুহূর্তের জন্য সদানন্দের অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "তারা ছেলে বিক্রি করতে রাজি নয় মন্দা।"

মন্দাকিনীর দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সদানন্দ তাড়াতাড়ি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাঁহার পতনোন্মুখ দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।"

পোষ্যপুত্র লইবার সংবাদটা ইতিমধ্যে সারদাসুন্দরীর কানে গিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বাড়ী একেবারে তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া মানদাকে গালি পাড়িতে লাগিলেন। তারপর মন্দাকিনীর শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "হ্যাঁলা বৌ, তা পুষ্যিপুত্তুর নেবে, আমায় এতদিন বলনি কেন! আমি রাজপুত্তুরের মত ছেলে এনে দিতাম। ছেলের আবার ভাবনা। ঐ আবাগী সর্ব্বনাশী ঘুঁটে কুড়ুনীর ছেলের পেছনে কি টাকাটাই না ঢাললে, ছুঁড়ি কি ফাঁকি দিয়েই না অতগুলো টাকা বের করে নিলে,—তবু ত ওর ঐ ছেলে,—দেখলে ঘেন্না করে! ভাবনা কি বৌ, দেখ না আমি সাত দিনের মধ্যে রাজপুত্তুরের মত ছেলে এনে তোমার সামনে হাজির করে দিচ্ছি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।"

মন্দাকিনী তখন উপুড় হইয়া মেজের উপর পড়িয়াছিলেন, আর সদানন্দ নতমুখে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, এইবার মুখ তুলিয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সারদা মিছে চেঁচামেচি করে কোন লাভ নেই; ঐ রকমের যা হ'ক একটা ব্যবস্থা পরে করা যাবে।"

সারদা কহিলেন, "হ্যাঁ তা করতে হবে বৈ কি দাদা, ঐ ছুঁড়ির দেমাক ভেঙ্গে তবে অন্য কাজ! মনে করছেন গুমর দেখিয়ে সর্ব্বস্ব লিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। তা আর হচ্ছে না, এমন ছেলে এনে দেব, যার দিকে চাইলে ছুঁড়ির চোখ কপালে উঠে যাবে।" তাহারই এক দরিদ্র ননদের চারি বৎসরের একটী পুত্রের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

৮

উভয় বাড়ীর ব্যবধান প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাতায়াতের যে পথ করা হইয়াছিল, পরদিন রাজমিস্ত্রী ডাকিয়া ইট গাঁথিয়া সেই পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সারদাসুন্দরী মহানন্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কত মানা করেছিলাম, তখন ত আমার কথা কেউ শুনলে না। সেই ত বন্ধ ক'রতে হ'ল, করতেই হবে। খুব হ'য়েছে ছুঁড়ি মনে করেছিল ঐ পথ দিয়ে আবার ছেলে লেলিয়ে দেবে, কেমন জব্দ!"

সেদিন আর সদানন্দ আপিসে গেলেন না, বাহিরের ঘরে গিয়াও বসিলেন না, শয়নকক্ষে সন্তানবিরহকাতর পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। সেই যে কাল অপরাহ্ন হইতে মন্দাকিনী মুখ বন্ধ করিয়া আছেন, আজ পর্য্যন্ত তিনি আর মুখ খুলেন নাই। সদানন্দও তাঁহাকে কথা বলাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে, এমন সময় নীচে সারদাসুন্দরীর সু-উচ্চ কণ্ঠস্বর স্বামীস্ত্রী উভয়ের কানে আসিয়া পৌছিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, "গয়না না দিয়ে যাবে কোথা। ঠকিয়ে নেওয়া,—হাতে দড়ি পড়বে না; সে ভয় বুঝি নেই; আমি ত আর জানি না

বৌ কি কি গয়না, কত ওজনের গয়না দিয়েছিল সে সব বুঝে নেব। দু' একখানা সরালে, কিম্বা হাল্কা ওজনের গয়না দিয়ে ভারি ওজনের গয়নাগুলো বদলে নিলে তা আমি কি করে ধরব বাপু, যাই ওপরে পুঁটুলিটা নিয়ে; বৌকে একবার দেখিয়ে আসি।"

ছোট্ট একটি পুঁটুলি হাতে করিয়া প্রফুল্লমুখে উপরে উঠিয়া মন্দাকিনীর কক্ষদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সারদাসুন্দরী কহিলেন, "ওবাড়ীর তারাপদ আপিস যাবার সময় দশরথকে দিয়ে এই পুঁটুলিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে দাদা, খুলে দেখলাম, বৌ সেই ছোঁড়াটাকে গা ভরে যে সমস্ত গয়না দিয়েছিল, এ গুলো সেই রকমের কতকগুলো গয়না, বৌকে একবার দেখে মিলিয়ে নিতে বল দাদা।"

মন্দাকিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সদানন্দ ব্যস্ত হইয়া সারদাকে কহিলেন, "ওগুলো তোমার কাছে রেখে দাও গে সারদা। দেখবার কোন দরকার নেই। দেখ, আর জ্বালাতন কর না।"

সারদা অবাক হইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার দাদা বৌদির এই ব্যবহার নিতান্ত বাড়াবাড়ী বলিয়াই মনে হইল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর হঠাৎ এক সময় মন্দাকিনী কক্ষ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সদানন্দ তাহাতে বাধা দিলেন না। কিছুক্ষণ বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া মন্দাকিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সবেমাত্র সদানন্দ একখানি খবরের কাগজের উপর দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়াছেন, এমন সময় মন্দাকিনী ছুটিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বড় মা বড় মা বলে খোকা কাঁদছিল, আর তাকে মানদা কি মারটাই মারলে, হ্যাঁ গা ঐটুকু দুধের বাছাকে অমন করে মারলে, ওকে পুলিশে ধরিয়ে দাও, দেখ ঠিক ওর জেল হবে।"

সদানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া কাছে বসাইয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "পরের ছেলেকে মারুক ধরুক তাতে আমাদের কি মন্দা।"

মন্দাকিনী শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেছলাম, খোকা ত আমাদের কেউ না, সে পরের ছেলে, পরের ছেলে।"

সদানন্দ মনে মনে ডাকিলেন, ভগবান!

এমনই ভাবে সে দিনটা কাটিল। মন্দাকিনী ক্রমে যেন খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিলেন। সদানন্দ মনে মনে কহিলেন একমাত্র পুত্র হারাইয়া সে শোক সহিয়া মানুষ যদি বাঁচিয়া থাকিয়া আবার সংসারে নিয়মিত কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, তখন তাহার তুলনায় এই অতি সামান্য আঘাতই বা মন্দাকিনী সহিতে পারিবে না কেন?

পরদিন সদানন্দ যথাসময়ে আহার শেষ করিয়া পত্নীকে কহিলেন, "তা হ'লে আজ আমি আপিস যাই?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "আপিস যাবে বৈ কি। শুধু শুধু আপিস কামাই করে আর লাভ কি।"

সদানন্দ ভগিনীর উপর মন্দাকিনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার দিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

যেখানে সারদাসুন্দরী বসিয়া রান্না করিতেছিলেন, মন্দাকিনী সেইখানে গিয়া বসিলেন। সারদা খুসী হইয়া কহিলেন, "বস বৌ বস। তোমার কোন ভাবনা নেই, আমার ননদকে আমি কালই চিঠি লিখে দিয়েছি—সে ছেলে নিয়ে এসে প'ড়ল বলে। দেখ বৌ সে ছেলে দেখলে চোখ একবারে জুড়িয়ে যাবে।"

মন্দাকিনী কোন কথা বলিলেন না, একবার সারদার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলেন।

সারদা কহিলেন, "ও কি, উঠলে কেন বৌ, বস, কোথায় যাচ্ছ?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "কোথায় যাইনি ঠাকুরঝি, এই এটু ঘুরে বেড়াই।" এই বলিয়া তিনি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে সেই প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সেই রুদ্ধ পথের উপর গিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

শব্দ পাইয়া সারদা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সেই দিকে ছুটিয়া গিয়া মন্দাকিনীকে ধরিয়া ফেলিয়া চাপা গলায় কহিলেন, "ছি বৌ, এ কি হচ্ছে! ওরা টের পেলে যে আস্কারা পাবে, চলে এস এখান থেকে।"

দুই হাত জোড় করিয়া কাতরকণ্ঠে মন্দাকিনী বলিয়া উঠিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি আমায় এখানে থাকতে দাও। শুনতে পাচ্ছ না পাঁচীলের ওপারে খোকা কথা বলছে, ঐ যে বড়মা বলে ডাকছে।"

সারদা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বেশ তোমার যা খুসী কর, আমি আর কি করব, দাদাকে আপিসে খবর পাঠাই।"

মন্দাকিনী তেমনই জোড়হস্তে কহিলেন, "যাচ্ছি ঠাকুরঝি, তাঁকে কিছু বল না।"

৬

দেখিতে দেখিতে সাতটা দিন কাটিয়া গেল। মন্দাকিনীর ব্যবহারে কোন চাঞ্চল্য আর দৃষ্ট হয় না। তিনি বেশ সহজভাবেই খান দান, ঘুরিয়া বেড়ান, আগে সকলের সহিত যেভাবে কথা বলিতেন, সেইভাবেই কথা বলেন। খোকার কণ্ঠস্বর শুনিবার আশায় আর তাঁহাকে গৃহের এখানে সেখানে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় না, মাথা খুঁড়িবার জন্য আর তিনি সেই রুদ্ধ পথের দিকে ছুটিয়া যান না।

ইতিমধ্যে পত্র পাইয়া সারদাসুন্দরীর ননদ তাহার সাতটী পুত্রকন্যা লইয়া সদানন্দের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারই পঞ্চম সন্তান চারিবৎসরের পুত্রটিকে মন্দাকিনীর সম্মুখে হাজির করিয়া সারদা কহিলেন, "এর নামও খোকা। আহা কি চেহারা দেখেছ বৌ, যেমন বলেছিলাম ঠিক তেমনটি কিনা? নাও একে কোলে নাও বৌ, যা খোকা যা তোর নতুন মার কোলে যা।"

মন্দাকিনী মুখ নত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মাপ কর ভাই ঠাকুরঝি, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।"

সারদা তাঁহাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। কিন্তু পরদিন তিনি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। এক হাতে সেই গহনার পুঁটুলি এবং অন্য হাতে খোকাকে মন্দাকিনীর সম্মুখে টানিয়া আনিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "এই নাও বৌ গয়নাগুলো খোকাকে পরিয়ে দাও।"

মন্দাকিনীর দুই চোখ ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, ক্ষিপ্রবেগে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া সারদার হাত হইতে পুঁটলিটি কাড়িয়া লইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কি মনে করেছ ঠাকুরঝি, আমি মানুষ না আর কিছু, দোহাই তোমার আর আমায় দগ্ধে দগ্ধে মের না।" এই বলিয়া পুঁটুলিটি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তিনি টলিতে টলিতে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং কোন রকমে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন।

সদানন্দ আপিস হইতে ফিরিলে, তিনি তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আর আমি এ বাড়ীতে থাকতে পারছি না, তুমি যেখানে হ'ক আমায় নিয়ে চল।"

আবার কি এক নূতন ব্যাপার ঘটিল তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, সদানন্দ অনুমানে ইহাই বুঝিলেন তাহার ভগিনীর আনীত ছেলেটী লইয়াই কিছু গোল বাধিয়াছে। সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তিনি কহিলেন, "চল আমরা কাশী গিয়ে কিছুদিন থেকে আসি।"

কাশী! মন্দাকিনীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "সেখানে যেতে পারব না, অন্য যেখানে হক আমায় নিয়ে চল।"

সদানন্দ কহিলেন "আচ্ছা, যেখানে হক তোমায় নিয়ে যাব।"

আবার দিন ছয়েক কাটিল। মন্দাকিনী আর নিজের ঘর হইতে বড় বাহির হন না, প্রায় সব সময় নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বহুদিন তিনি মানদার গৃহের দিকে ফিরিয়া দেখেন নাই। সেদিন সকাল বেলা মন্দাকিনী বারান্দায় গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ কি ভাবিয়া একবার মানদাদের গৃহের দিকে চাহিলেন।

সারদা সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন, কহিলেন, "কি দেখছ বৌ, ওদের এখনকার বাস

উঠেছে, দু'দিন পরে পেয়াদা এসে বের করে দেবে, তাই আগে থেকে সরে পড়ছে! বাঁধাছাদা শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার যাবে।"

সদানন্দ বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। মন্দাকিনী ঝড়ের মত সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো ওরা যে চলে যাচ্ছে।"

তারাপদ যে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছে সদানন্দ তাহা জানিতেন, তিনি কহিলেন, "কি করব মন্দা! তারাপদকে আপিস থেকে তাড়িয়েছি, তাকে ভিটে ছাড়া করবার ব্যবস্থা করেছি, আর আমি কি করতে পারি মন্দা।"

মন্দাকিনী ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "পার পার এখনও তুমি সব করতে পার।"

সদানন্দ সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "বল মন্দা আমি কি করতে পারি?"

দুই হাত জোড় করিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "ওগো তুমি ওদের যেতে দিও না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ কহিলেন, "তাদের আটকে রাখবার সাধ্য ত আমার নেই মন্দা।"

তেমনই কাতরভাবে মন্দাকিনী কহিলেন, "ওগো আছে, তুমি গিয়ে তাদের বল, মা হবার সাধ আমি অনেকদিন বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমি বুঝতে পেরেছি পরের ছেলে কিনে নিয়ে জোর করে মা হওয়া যায় না, আমি আর সে রাক্ষুসী নেই, তুমি তাদের বল, আমি খোকার বড়মা হয়েই থাকব। একবার তারা খোকাকে আমার কোলে দিক, খোকা আমার গলা জড়িয়ে আবার তেমনই করে আমায় বড়মা বলে ডাকুক। ওগো যাও, দেরী করো না, তারা চলে যাবে। তুমি বল্‌তে না পার আমায় সঙ্গে নিয়ে চল, আমি মানদার দুই পা জড়িয়ে ধরে বলব, আমি খোকার বড়মা হ'য়ে থাকব, একবার খোকাকে আমার কোলে দাও।"

সদানন্দ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "সেই ভাল, যাই মন্দা।"

উচ্ছৃঙ্খল
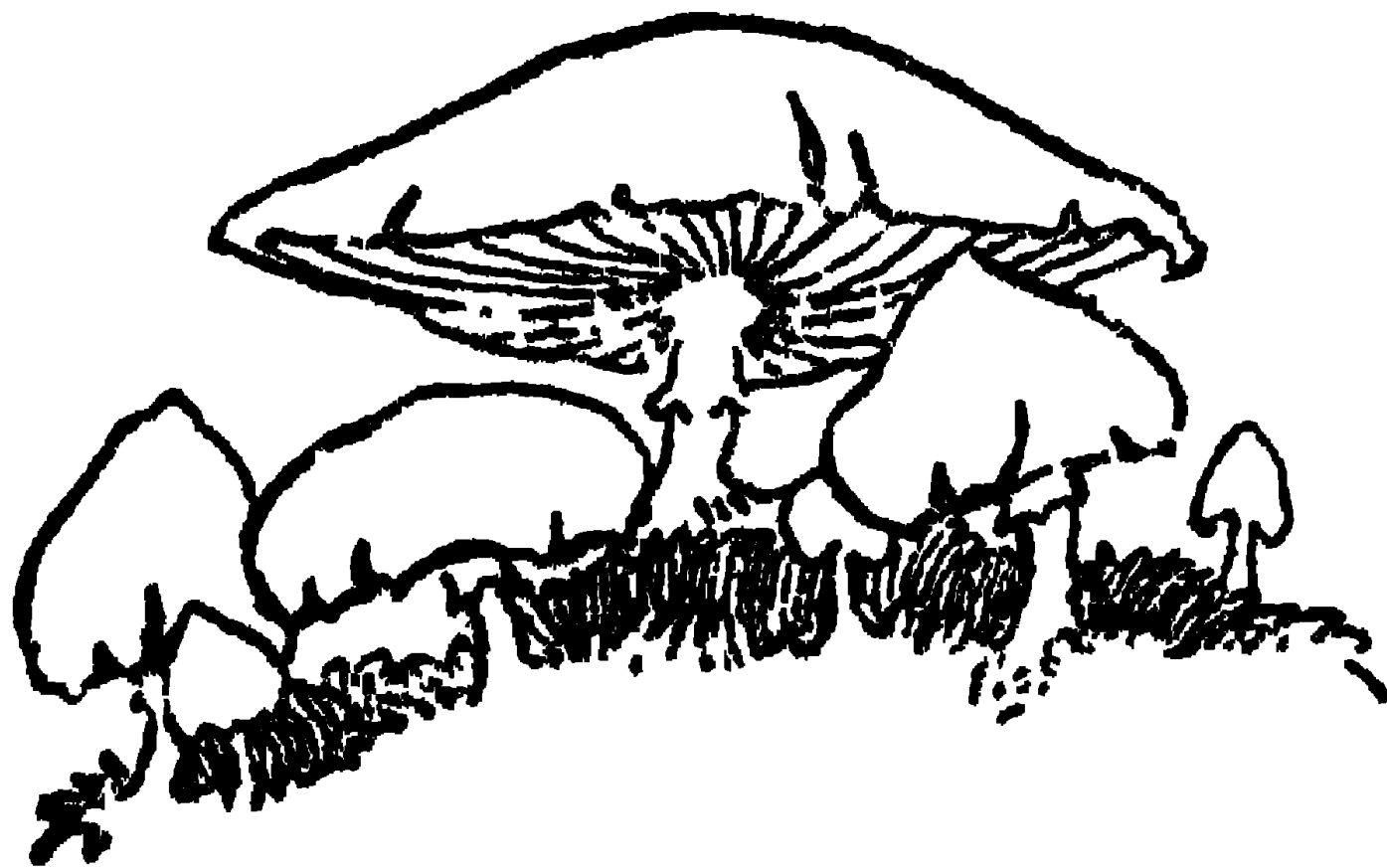
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আজি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে উচ্ছৃঙ্খল—
রাতে অগ্নিতে পুড়ে' গেছে গৃহসম্বল,
ঝড়ে মন্দির চৌচির বিগ্রহ চুর—
গৃহে রন্ধ্রেতে শনি পঞ্চমে মঙ্গল !

ফুল— মালঞ্চে আজি শুধু কাঁটাজঙ্গল—
সেথা দিবসে দুপুরে ফিরে শিবাদঙ্গল ;
ছিল টল্‌টলে জল যেথা শ্যাম সরোবর,
মজি' পঙ্কে ও শৈবালে হ'ল পল্বল !

ঘরে কর্ত্তা গিয়াছে মরে' গিন্নী পাগল,
রাতে ভৃত্যটি নাই দ্বারে বাঁধিবে আগল,
যেথা প্রাঙ্গন ভরা ছিল কল-কোলাহল,
সেথা শিশু দুটি অনাহারে কাঁদিছে কেবল !

আজি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে উচ্ছৃঙ্খল,
তাই যেথায় যা-কিছু ছিল হয়েছে বিকল ;
যেথা কিঙ্কিনী-ঝঙ্কারে ভরা গৃহতল,
সেথা পোড়ো বাড়ী ঝোড়ো বায়ে বাজায় শিকল

শ্রীঅতুল সেন

১
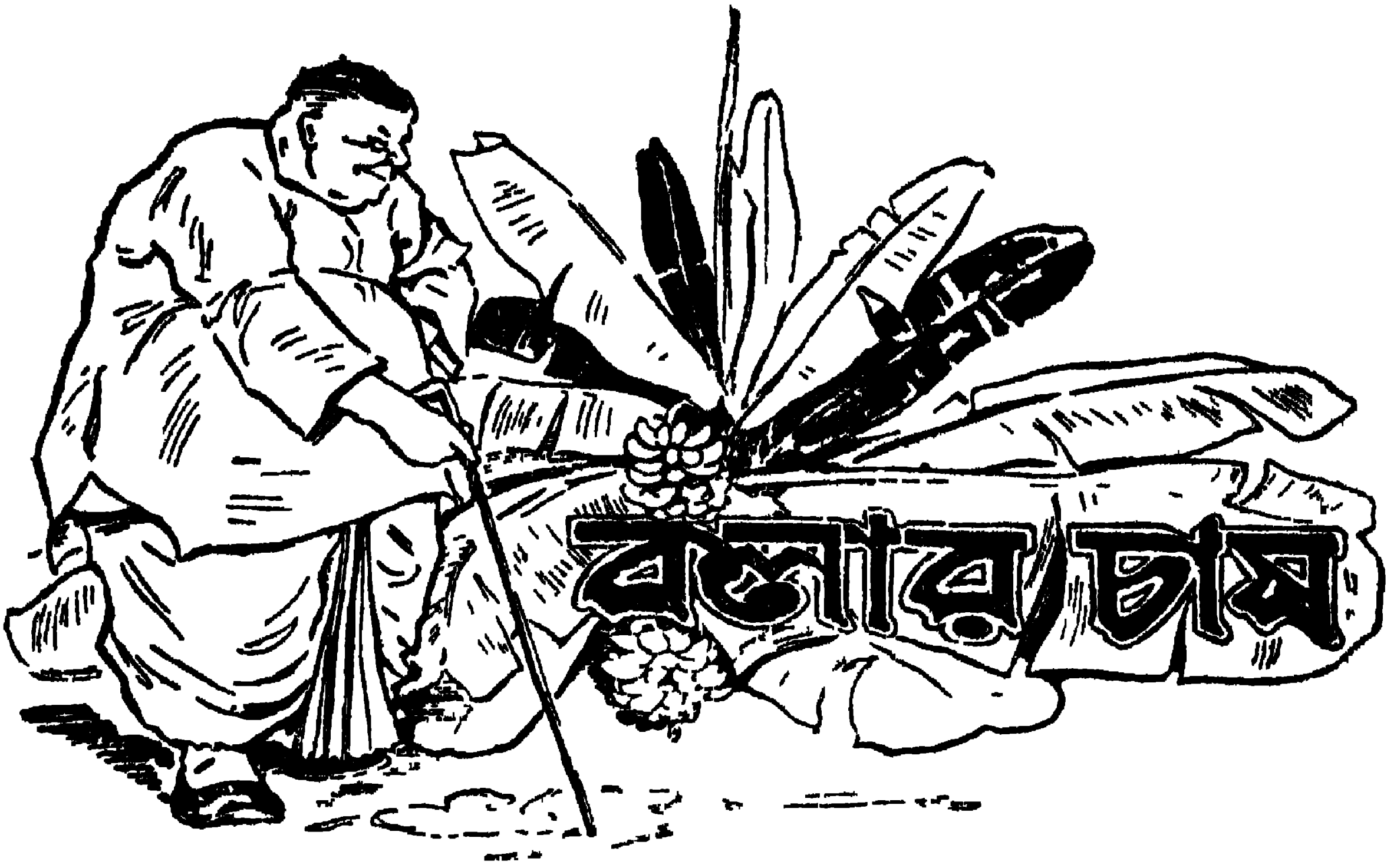
পার্ব্বতীচরণ লস্করচৌধুরী খুব হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। তাঁহার বরাবরই ধারণা ছিল কলিকালের অমরাবতী কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবামাত্রই তাঁহাব ছেলেদের অকালপক্কতা দোষ ঘটিবে এবং বাজে খরচের উৎপাতে সমস্ত সম্পত্তি যাইবে। সুতরাং তিনি কখনও পুত্রদের কলিকাতা আসিতে দিতেন না। পূর্ব্বপুরুষদের হুঁসিয়ারীতে তাঁহার জমিদারীর আয় ছিল প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। আঠারজাঙ্গাল গ্রাম, শুনিয়াছি আঠার জঙ্গলের নামান্তর। এখানে পূর্ব্বে নাকি আঠারটা জঙ্গল ছিল—পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ জলদস্যুর লীলাক্ষেত্র এবং পরে এখানে মগ জলদস্যুদেরও প্রাদুর্ভাব হয়। এই স্থানটি বরিশালের বাদা অঞ্চলে অবস্থিত। শুনা যায় এই লস্কর চৌধুরীরা অর্থকরী বিদ্যায় সদসৎ বিচার করিতেন না—জলদস্যুদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহাদের পেশা ছিল এবং তাহারই স্বাভাবিক ফলে এই প্রকাণ্ড জমিদারি।

পার্ব্বতীচরণ পাটের ও ধানচালের ব্যবসায় করিয়া কলিকাতায় সাত আটখানা বাড়ী করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে একখানা তাহার গদি ও থাকিবার জন্য—এবং বাকী বাড়ীগুলি ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল কলিকাতাবাসিনী ইত্যাদিদের কাছে। পার্ব্বতীচরণের মৃত্যুর পর পাটের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়—গদিবাড়ীতে গোমস্তারা থাকে—বাড়ীভাড়া আদায় করাই তাহাদের একমাত্র কাজ।

পার্ব্বতীচরণ অনেক চেষ্টা করিয়া পুত্র ভবানীচরণ ও শিবাণীচরণকে গ্রামের মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠাইয়াছিলেন। বড়লোকের ছেলে, ইহার বেশী পরিশ্রম তাহাদের সহ্য হইল না, অতএব এইখানেই বিদ্যার খতম। তবে তাহারা বটতলার উপন্যাস, নাটক ও সাপ্তাহিক বাংলা খবরের কাগজ পড়িতে শিখিয়াছিল এবং সঙ্গগুণে সস্তায় নেশায় দম দিতেও শিখিয়াছিল।

পার্ব্বতীচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা জমিদারীর ব্যবস্থা, সংসারের হাল চাল সবই নূতন ফ্যাসানে ঢালিয়া সাজিতে প্রয়াস পাইল। জমিদারীতে ইংরাজী জানা একজন ম্যানেজার বাহাল হইল। মাইনর স্কুল উচ্চ ইংরেজীতে পরিণত হইল—কমিটির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হইলেন দুই ভ্রাতা—সেক্রেটারী হইলেন ম্যানেজার বাবু। ইহা ছাড়া পাইক বরকন্দাজদের পোষাক ও হিন্দুস্থানী দারোয়ান আমদানি করিয়া নানা রকমে অনেক পরিবর্ত্তন করিবার পর বাবুদের বাসনা জাগিল কলিকাতা সন্দর্শনে।

২

কলিকাতা আসিয়া বাবুরা যাহা দেখেন তাহাই নূতন। হাতে পয়সা আছে, খেলনা হইতে আরম্ভ করিয়া মটরগাড়ী পর্য্যন্ত অনেক কাজের ও অকাজের জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যানেজারটী শিক্ষিত ও বিবেচক লোক হইলেও বাবুদের বাগ মানাইয়া রাখা তাঁহার সাধ্যাতীত হইত।

যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বটানিক্যালগার্ডেন ভিক্টোরিয়ামেমোরিয়াল ইত্যাদি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া আর আশা মিটে না। ম্যানেজারবাবু সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন, তাঁহার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল যাহাতে বাবুরা কলিকাতার আবহাওয়াতে জমিদারী ফুঁকিবার পথে পা না বাড়ান তাহার উপর।

একদিন ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়া ছোটবাবু রেসের ঘোড়াকে তীব্র বেগে দৌড়িতে দেখিয়া আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "ঐ—ঐটে আমি নেব"—যেমন কথা তেমনই কাজ—দশহাজার টাকায় সেই ঘোড়া কেনা হইল। বড়বাবু একখানা অতিকায় মটরকার কিনিলেন। এমনি করিয়া যখন মোটা মোটা খরচ করিতে আরম্ভ করিল তখন ম্যানেজারবাবু ভাবিয়া আকুল—কি উপায় হইবে!

থিয়েটার, বায়স্কোপ ও সার্কাসে যাতায়াত পূর্ব্বে হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ম্যানেজারবাবু মাথায় একটা ফন্দি আঁটিলেন—বেশ গুছাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বাবুদের বুঝাইয়া দিলেন যে আজকাল শিক্ষিত বড়লোকেদের একটা ফ্যাসান আর্টের কালচার করা—এমন কি বিশ্বকবি পর্য্যন্ত আজকাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন। নাটক জিনিসটা নির্দ্দোষ আমোদ, ইহাতে কলা শিল্প আছে, শিক্ষা আছে, আরোও কত কী ইত্যাদি।

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "ঐ—ঐটে আমি দেব"

বাবুদের আর্টের কালচার মাথায় ঢুকিল। ইহার সাহায্যে প্রজাদের Educate করা চলিবে হুকুম হইল গ্রামে যাইয়া থিয়েটার করিতে হইবে এবং এই থিয়েটারের ভিতর দিয়া প্রজা-দিগকে রাজ তথা জমীদার ভক্ত করিতে হইবে।

বাবুরা প্রত্যেক থিয়েটার-বারেই থিয়েটারে যান। শীঘ্রই গ্রামের থিয়েটারের জন্য সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করিবার একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রাত্রিদিনই বাবুরা কেবল হাত পা ছুড়িয়া কল্পনা করেন কেমন করিয়া 'এ্যাক্‌ট' করিবেন। ম্যানেজারবাবু মোটা অপব্যয়ের গতি রুদ্ধ করিলেন ভাবিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—গ্রামের থিয়েটারে কতই বা খরচ হইবে, তাহাতে ত আর জমিদারী বিকাইয়া যাইবে না।

কলিকাতার এক থিয়েটার কোম্পানী হইতে একজন মোশন মাষ্টার সংগ্রহ হইল। ইনি কলিকাতাতে নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। সিন্, চুল, পোষাক, পেণ্ট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া জমিদার বাবুরা ঘটা করিয়া সদলবলে গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

৩

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, লস্কর-চৌধুরীদের বাড়ী ও জমিদারীর দুইটী হিস্যা ছিল। আমাদের

এই বাবুরা বড় তরফের। ছোট তরফের কেউ বাড়ীতে থাকে না—তাহারা কলিকাতাবাসী কালে ভদ্রে দেশে যান। গোমস্তা, দারোয়ানরা বাড়ী আগলায়, আদায় তহবিল করে এবং বড় তরফের সঙ্গে মামলামোকদ্দমা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করে।

বড় তরফ ও ছোট তরফের মধ্যে সীমানা ও শরিকানা লইয়া দ্বন্দ্ব আছেই, মোকদ্দমা দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। উভয়ের বাড়ী হইতে দুইটী ভরা বন্দুক পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া সাজান রহিয়াছে।

ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। খত প্রস্তুত, অপরের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি ইত্যাদিতে ত অভ্যস্থ ছিলেনই—এমন কি এক একজন দাঙ্গাতে এত পোক্ত ছিলেন যে জীবনে দুই তিন কুড়ি নরহত্যার গৌরবও অক্লেশে করিতে পারিতেন। এখন ইংরাজের অত্যাচারে দাঙ্গা হাঙ্গামাও তেমন হয় না—খুন খারাপি জনশ্রুতি, দুটা একটার বেশী ঘটে না,—তাহার জন্য আবার ওয়ারেন্ট, সাক্ষী ও মুচলেখার জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। জমিদারের ইজ্জত আর নাই।

যা হোক, জমিদার বাবুরা গ্রামে আসিয়া জনশিক্ষার তুমুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। বহির্ব্বাটীতে, আলমারীতে বহি বোঝাই হইয়া 'লাইব্রেরীর' সূত্রপাত হইল, তাহার অধিকাংশই পুস্তকালয়ের প্রেরিত পাঠ্যপুস্তকের Presentation Copy ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আনীত গৈবী খুন, হীরের ছবি ইত্যাদি বটতলার উপন্যাস। ইহা ব্যতীত ম্যানেজার বাবুর পরামর্শে কতকগুলি ইংরাজি গ্রন্থও দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা লাইব্রেরীর শোভাবর্দ্ধনের জন্য সযত্নে রক্ষিত হইতে লাগিল। সাধারণের শিক্ষা লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হইলেও বাবুদের নামীয় কাগজ পড়িবার হুকুম কাহারও ছিল না।

দৈনিক ইংরাজী পত্রগুলি পৌছিলে বাবুরা যত্নের সহিত সেগুলি সাজাইয়া রাখাইতেন। বাবুরা ইংরেজী জানেন না বটে কিন্তু তাঁহারাও জমিদার, ইংরাজী খবরের কাগজ রাখা তো দরকার। এই কাগজগুলি পড়িবার হুকুম কাহারও ছিল না যেহেতু এসব কাগজ বাবুদের জন্য—অবশ্য ম্যানেজার বাবু বাদ।

৪

তারপর নাটকাভিনয় বা আর্ট কালচারের পালা। এই উপলক্ষে পুরাতন নাট্যমন্দির সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রঙ্গমঞ্চ বা নাচঘরে পরিণত হইল। এই সব ব্যাপারে সর্ব্ব প্রধান মোড়ল হইলেন মোশন মাষ্টার লক্ষীকান্ত পাল। তাহার সম্মান ও সেবা দেখে কে! লক্ষী-কান্ত বাবুর বেতন মাসিক থবলক দেড় শত টাকা, দৈনিক একটী বোতল ভাইনাম প্যাডি, ইহা ছাড়া কাপড় চোপড়, আহারের ও বাসের ব্যবস্থা, ছানা, ক্ষীর, ননী, দুধ, মাছ এই সব

ব্যাপারে লক্ষ্মীকান্ত প্রায় বাবুদের সমকক্ষ। লক্ষ্মীকান্ত প্রথমটা এই সব দিল্লীর লাড্ডু পাইয়া হাতে আকাশ পাইল।

ছোকরার দল জুটিল, গাইয়ে বাজিয়েও আসিল। ইহাদের অধিকাংশই সংগৃহীত হইল যাত্রাদল বা কীর্ত্তনের দল হইতে দিন রাত গান বাজনা, নাচ, অভিনয়ের মহলা। লক্ষ্মীকান্ত বাবু যখন মোশন দিতে উঠিয়া নিজের বুক চাপড়াইয়া মোশন দেখান "কর্কশ অতি শূকর আকার" তখন তাঁহার মুখটা যেন স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হইয়া পড়িত; আবার কখনও সারে গামা শেখান—কখনও এক দুই তিন, এক দুই তিন করিয়া নাচের মহলা দেন। বাবুরা মহলার সময় উপস্থিত থাকেন এবং অধিকাংশ সময়ই গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাংলানবীশ ডাক্তার, স্কুলের পণ্ডিত ও শিক্ষকেরা বাবুদের সঙ্গে থাকিয়া এই জন হিতকর কার্য্যের তারিফ করেন।

অভিনয় আরম্ভ হইল। গ্রামের লোক সবাই উৎসাহ করিয়া অভিনয় দেখে। ক্রমে আশে পাশের গ্রামের লোকও Educated হইতে আরম্ভ করিল। লোক আর ধরে না—বুঝিবা লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির ভাঙ্গিতে হয়। বাবুরা মনের আনন্দে অভিনয় করেন। নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন বাবুরা নিজে এবং সবাই বলে বাহবা কি বাহবা।

বাবুরা ঘুম থেকে ওঠেন বেলা নটা দশটায়, একটু আধটু বিষয় কর্ম্ম দেখিয়া স্নানাহার সারিতে দুইটা বাজে, তারপর একটু নিদ্রা দিয়া—অপরাহ্নে পাঁচটায় আসেন ষ্টেজে। এখন আরম্ভ হয় মহলা (Rehearsal) রাত্রি নটা পর্য্যন্ত মহলা চলে তারপর আহারাদি শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অভিনয় আরম্ভ করেন রাত্রি এগারটায়। সারা রাত্রি ব্যাপী অভিনয় চলে। একদিনও বাদ নাই, লোকশিক্ষার উৎসাহ কত।

বাবুদের অভিনয়ের একটা সুবিধা এই ছিল যে নিন্দাবাদ কখনও হইত না। যিনি যাহাই করেন সবাই প্রশংসা করেন—দর্শকদের সকলেই হয় বাবুদের প্রজা নতুবা কর্মচারী, খারাপ বলিবার সাধ্য কি! বিশেষতঃ বাবুরা ত পয়সা লইয়া অভিনয় করেন না—সবই ত কম্‌প্লিমেণ্টারী দর্শক—মন্দ সমালোচনা কে করিবে? সবাই এক বাক্যে বলে ভাদুড়ী মশাইও এমন পারেন কি না সন্দেহ (অবশ্য ভাদুড়ী মশাইয়ের নাম লক্ষ্মী মাষ্টারের মুখে শোনা)।

কলিকাতার থিয়েটার হইতে একটু আধটু পার্থক্য ঘটে বৈ কি। গ্রামের নাটক, একটু আধটু বেবন্দোবস্ত হইলেও মোটের উপর নাকি, অভিনয় হইত অতি চমৎকার। ইহাতে বাবুদের নিষ্ঠার ও উৎসাহের অভাব নাই, দ্বিতীয়তঃ ইহা অর্থলোভী কোম্পানী নহে—এবং সর্ব্বোপরি এই নাট্যকলার চর্চ্চা লোকশিক্ষার জন্য। এত বড় একটা মহান আদর্শের নিন্দা কে করিবে।

ভ্যাবলা ও হাবলা দুই ভাই সখির ব্যাচের ছোকরা। নাটকে তাহাদিগকে পরস্পরের বাহুতে সংবদ্ধ মল্লবীরের ভঙ্গী করাইয়া মুখোস ও পোষাক পরাইয়া তুরঙ্গম সাজান হইল। অনেক আয়োজন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে প্রম্‌পটার উইংসের পাশ হইতে বলিতেছেন 'ডাকনা' 'ডাকনা' 'এই ডাকনা'। উহারা কেবল মাত্র জানে উহারা চতুষ্পদ কি একটা সাজিয়াছে যাহার নাম তুরঙ্গম। তুরঙ্গম শব্দের অর্থ না জানা থাকাতে মহা বিপদেই পড়িল, বুঝিতে পারিল না—কি ডাক ডাকিবে। ভ্যাবলা খুব সেয়ানা ছেলে কিনা, চট করিয়া তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল—ভাবিল চতুষ্পদ যখন সাজিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তুরঙ্গম, মানে গরু। অতএব সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল 'হাম্বা' 'হাম্বা'। নিরক্ষর চাষী দর্শক, তাহারা অবাক। উহারা দেখে ঘোড়া অথচ শব্দ শোনে গরুর—ব্যাপার কি। তখন তাহারা মনে করিল অভিনয়ের ঘোড়া বুঝি গরুর মতই ডাকে। অমনি হাততালি পড়িল। এই হাততালির তালিম দর্শকদিগকে দিয়াছিলেন মোসন মাষ্টার নাটক জমাইবার জন্য। কলিকাতার থিয়েটারেও তো কম্প্লিমেণ্টারী টিকেট দিয়া হাত তালির ব্যবস্থা করা হয়।

ক্রমে ক্রমে 'এঙ্কোর প্লিজের' তাৎপর্য্য দর্শকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইল। একদিন এক যুদ্ধের দৃশ্যে, যুদ্ধের পর—এক ভৈরবীর গান ছিল। গান শেষ হইলে পর দর্শকরা বলিয়া উঠিল 'এঙ্কোর প্লিজ'—অমনি তিনজন মৃত সৈনিক তলোয়ার হাতে করিয়া তীরবেগে লাফাইয়া উঠিয়া যুদ্ধের পাঁয়তাড়া কসিতে লাগিল এদিকে ভৈরবীও গান ধরিয়া বসিল—ষ্টেজের উপর এক বিষম হট্টগোল। দর্শকরা মনে করিল নিশ্চয়ই একটা ভীষণ রকম কিছু হইতেছে, অমনি ঘন করতালি বর্ষণ হইতে লাগিল, কারণ তাহাদিগকে শেখান হইয়াছিল খুব ভাল অভিনয়ের

জায়গাতেই করতালি দিতে হয়। এদিকে নেপথ্যে লক্ষ্মী মাষ্টারের চীৎকার শোনা যাচ্ছিল—ড্রপ—ড্রপ—ড্রপ। সব মাটি কল্লে—ড্রপ।

ছোকরারা খুব পার্ট মুখস্থ করিত, প্রম্‌প্‌টারের উপর নির্ভর করিত না কারণ তাহাদের ভয় ছিল যদি ভুল হয় তবে রক্ষা নাই—সকলেই যে বাবুদের প্রজা। বাবুরা আবার শুনিয়াছিলেন বড় বড় অভিনেতারা মুখস্থ না করিয়া শুধু প্রম্‌টিংএর জোরে চালাইয়া দেয় সুতরাং তাঁহারা পার্ট মুখস্থ করিতেন না। ইহার ফলে ছোকরারা যখন গড় গড় করিয়া পাখীপড়ার মত পার্ট বলিত তখন বাবুরা সতৃষ্ণ নয়নে উইংসের পাশে দণ্ডায়মান প্রম্‌প্‌টারের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। একদিন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে এক ছোকরা উত্তরার ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রথম দৃশ্যে দ্রৌপদীকে দেখিয়া তাহার কথা ছিল "লক্ষ্মী স্বরূপিনী মরাল গামিনী সুন্দরী কে আসে মা পুরে।" শেষ দিককার এক দৃশ্যে এক উন্মাদ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উত্তরার কথা ছিল—"রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ, উন্মাদ ব্রাহ্মণ এক আসিতেছে পুরে। মুখস্তের চোটে শ্রীমান্ দ্রৌপদীকে দেখিয়া উন্মাদ ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিল এবং শেষ দৃশ্যে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিয়া ফেলিল—

"মরালগামিনী লক্ষ্মী স্বরূপিনী সুন্দরী কে আসে মা পুরে"—আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিকট আকার উন্মাদ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

এইরূপ ছোট খাট রকমের ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও নাকি বাবুদের অভিনয় হইত অতি চমৎকার অন্ততঃ—বাবুদের প্রজা ও কর্ম্মচারীদের ত এই অভিমত।

অভিনয়ের প্রভাব হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের মধ্যেও সংক্রামিত হইল। তাহারা 'রাম, রঘুবর, সীতাপতি' গাহিবার আড্ডায় বাবুদের অভিনয়ের সমালোচনা ও তারিফ করে। রাম সিং আট বছর বাংলা মুলুকে আছে, ভাল বাংলা জানে বলিয়া তাহার মনে মনে যথেষ্ট অহঙ্কার, সে অভিনয়ের ব্যাখ্যা করিত কলকাত্তাসে ক্যায়সা গাহানা ল্যায়া বাবুলোগ—এক এক গাহনা কা কিম্মত 'আশি রূপেয়া'—আশি রূপা গান (নিয়ে এই হাসি রূপ গান)।

অভিনয়ের প্রভাব চাষীদের মধ্যেও একটু একটু উঁকি মারিল। স্কুলের বালকরা একটু বেশীমাত্রায় Educated হইতে লাগিল। একদিন হারুসর্দ্দার তাহার পুত্র রসুলকে লইয়া ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত—পঞ্চানন মাইতির ছেলে স্কুলে যাইবার পথে পেনসিলের খোঁচায় তাহার ছেলের চোখ কাণা করিয়া দিয়াছে। ম্যানেজার বাবু তদন্ত করিয়া জানিলেন—স্কুলের ছাত্র শিবুমাইতি পথে চলিবার সময় রামের এ্যাক্‌টিং—'কার,—কার—কার কণ্ঠস্বরের কসরত করিতে গিয়া অসাবধানতাবশতঃ পেন্সিল দিয়া খোঁচা দিয়াছে—কিন্তু খোঁচা দেওয়াটা তার উদ্দেশ্য ছিল না। ম্যানেজার বাবু রসুলের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। এদিকে বাবুরা শিবুমাইতিকে পড়া ছাড়াইয়া তাঁহাদের নাটকের দলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন ভাবিলেন হয়ত এই বালকের মধ্যে অদ্বিতীয় অভিনেতা হইবার বীজ আছে, ভবিষ্যতে ইনি বাংলার গ্যারিক হইলেও হইতে পারেন।

"আশি রূপা গান"

'বনের পাখী' শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

কার—কার—কার কণ্ঠস্বর ?

৫

লোকশিক্ষার এই উচ্চ আদর্শের আকর্ষণ কিন্তু ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। গ্রামের অশিক্ষিত বর্ব্বর প্রজারা যেন বাবুদের শুভ ইচ্ছা সম্যক পরিপাক করিতে পারিতেছিল না। প্রথম চটকটা কমিয়া গেলে চাষারা একটা একটা করিয়া অভিনয়ের কামাই করিতে লাগিল। বাবুরা অনুভব করিলেন দর্শকসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। মোশন মাষ্টার লক্ষ্মীকান্ত বলিয়া দিয়াছেন দর্শক কম হইলে অভিনেতারা তেমন উৎসাহ পায় না সুতরাং অভিনয়ও তেমন জমে না। বাবুদের সঙ্কল্প, অভিনয় জমাইতেই হইবে, দর্শক কিছুতেই কমিতে দেওয়া হইবে না।

এহেন অবস্থায় দর্শক কমিতে দেখিয়া বাবুরা অধীর হইলেন। বচ্চন পাঁড়ে, রামসিং, লছমন দোবে, ইত্যাদি হিন্দুস্থানী দারোয়ান ও দেশী পাইক বরকন্দাজ দ্বারা প্রজাদের বাড়ী শ্রীসহী দিয়া পরোয়ানা পাঠাইলেন। প্রত্যহ বাবুদের বাড়ী শ্রী অভিনয় দেখিতে আসা চাই-ই। ইহাতে দর্শক বৃদ্ধি পাইল বটে কিন্তু দুই একদিনের জন্য মাত্র। চাষারা সারাদিন মাঠে চাষ-আবাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া রাত্রিতে মরার মত পড়িয়া নিদ্রা যায়। কালে ভদ্রে যাত্রা, কীর্ত্তন বা বারোয়ারীতে অষ্টপ্রহর মাতামাতি করে। বাবুদের বাড়ীর প্রাত্যাহিক আর্ট কালচার তাহাদের সহ্য হইল না।

এবার বাবুরা স্থির করিলেন জোর করিয়া প্রজাদের শিক্ষাদান করিতে হইবে। পুত্রকে জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার দাবী পিতার আছে। প্রজারা পুত্রতুল্য।

বাবুরা এবার নন্দী ভৃঙ্গীদের হুকুম করিলেন—দরকার হয়ত জোর করিয়া বাড়ী হইতে প্রজাদের ধরিয়া আনিতে হইবে। প্রজারা কি করে, অগত্যা হাজিরা দিত বটে কিন্তু অভিনয় কালে অধিকাংশ দর্শকই ঘুমাইয়া পড়িত। দর্শকদিগের মধ্যে নাসিকাধ্বনি শোনা যাইত বটে কিন্তু উৎসাহ সূচক করতালির বড়ই অভাব হইয়া পড়িল। উৎসাহ না পাইলে অভিনেতারা মনের মধ্যে জোর পায় না এবং অভিনয়ও ভাল জমে না। বাবুরা যখন উৎসাহের অভাব অনুভব করিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন—কি অকৃতজ্ঞ প্রজামগুলী, কলিকাতায় কত পয়সা খরচ করিলে নাটক দেখা ভাগ্যে ঘটে, সেই নাটক বাড়ীতে বসিয়া বিনাপয়সায় দেখিবে তাহার মধ্যেও নিদ্রা—এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় ভগবানই জানেন। বাবুরা হুকুম করিলেন—দারোয়ান পাইক বরকন্দাজগণ এবং দরকার হইলে ভাড়া করা লাঠীয়াল লাঠি-হস্তে দর্শকমধ্যে মোতেয়ান থাকিবে। যদি দর্শকদের মধ্যে কেহ ঘুমাইয়া পড়ে তবে তাহাকে লাঠির অগ্রভাগের সাহায্যে

জাগাইয়া দিতে হইবে। সিন উঠামাত্র জমিদারের অনুচরবর্গ দর্শকদের কলার রস গিলাইয়া দিত লাঠীর স্পর্শে। অনেকে সারাদিনের পরিশ্রমের পর এতই অবসন্ন হইত যে লাঠীর স্পর্শ একটু কঠোর না হইলে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিত না। ইহার ফলে অভিনয়ের শব্দের চতুর্গুণ শব্দ ও বাস্তব করুণ রসের অভিনয় আরম্ভ হইল দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে—'এই ওঠ না—সিন উঠেছে—এই ওঠ'। এঁ্যা—।

ম্যানেজারবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—কি করিলাম, ভগবান গড়িতে বানর গড়িলাম—খাল কাটিয়া কুমীর আনিলাম—এখন উপায় ?'

৬

এইরকম উৎকট নাট্যকলার রসচর্চ্চার সময় বাবুদের এক কুটুম্ব কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত। কুটুম্বটীর নাম মহেশবাবু, ইনি কলিকাতায় থাকেন,—আলীপুরের উকিল। বাবুদের আগ্রহাতিশয্যে সমস্তরাত্রিব্যাপী অভিনয় ও উৎকট রসচর্চ্চায় যোগ দিয়া একদিনেই ত্রাহিমাং ডাক ছাড়িয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। জরুরি কাজের অজুহাতে পরদিবসই কলিকাতা রওনা হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীমাষ্টার অতি ধীরে ধীরে মহেশবাবুর ঘরে ঢুকিয়া তাহার শরণাপন্ন হইল—তাহাকে যেমন করিয়া হউক কলিকাতা যাইতে হইবে নতুবা এ বদ্ধকারাগারে থাকিয়া প্রত্যহ রাত্রি-জাগরণে সে বাঁচিবে না। লস্করচৌধুরীদের ধাত ভাল করিয়াই মহেশবাবুর জানা ছিল অতএব তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না।

মহেশবাবুর চলিয়া যাওয়ার পর কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে লক্ষ্মীমাষ্টার কলিকাতা চলিয়া যাইতে চাহে। বাবুরা তৎক্ষণাৎ কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যাহাতে মাষ্টার গ্রামের বাহিরে যাইতে না পারে। মাষ্টারের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল—কি করিয়া পলায়ন করে রাত্রি-দিন এই তাঁহার চিন্তা 'ইয়' দাঁড়াইল। কলিকাতাতে বেতন কম হইলেও অন্যান্য অনেক সুবিধা ছিল বিশেষতঃ লক্ষ্মীমাষ্টার কলাচর্চ্চার সহায়তার জন্য এমন 'সুনিপুণা আর্টিষ্ট' বন্ধু করিয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে পৈত্রিক যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইতে হইয়াছিল।

একদিন একটা ছোট পালার অভিনয় রাত্রি প্রভাত হইবার পুর্ব্বেই শেষ হইল। সেইদিন শুভ শেষরাত্রিযোগে নৌকা করিয়া মাষ্টার পলায়ন করিল। প্রভাতের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল মাষ্টারকে পাওয়া যাইতেছে না। বাবুরা শুনিলেন। কি ভীষণ বিশ্বাস-ঘাতক! তৎক্ষণাৎ বাবুরা চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, নৌকা পাঠাইলেন, যেমন করিয়া হউক মাষ্টারকে ধরিয়া আনা চাইই চাই। হিন্দুস্থানী দারোয়ানের দল, দেশী পাইক বরকন্দাজ, লাঠীয়াল, ছোকরার দল সব ছুটিল। একখানা ছিপ নৌকা প্রায় তিন চার ক্রোশ দূরে নদীর

মধ্য স্থলে মাষ্টারের নৌকা ধরিয়া ফেলিল—নন্দী ভৃঙ্গীরা মাষ্টারকে টানিয়া বাহির করিল। মাষ্টার কত অনুনয় বিনয় করিল—পয়সা কবলাইল কিন্তু জমিদারের অনুচরেরা কোনও কথা শুনিল না—পাঁজা কোলা করিয়া মাষ্টারকে ছিপ নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দ্বিপ্রহরের সময় নবমী পূজার বলির মত বাবুদের সম্মুখে হাজির করিয়া দিল।

একবার জমিদারী সংক্রান্ত কোনও মোকদ্দমাতে হুকুম হইল মাষ্টারকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হইবে। বেচারী কি করে—'পড়েছি মোগলের হাতে' র মত রাজী না হইয়া করে কি। একটা মতলব করিল, জেলায় গিয়া হয়ত পালাইবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য। চারিজন বরকন্দাজ লক্ষ্মীমাষ্টারের দেহরক্ষীরূপে বরিশাল হইতে তাহাকে ঠিক সশরীরে আঠার জাঙ্গালে ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

মাষ্টার মনমরা হইয়া রহিল—অভিনয় করে, মহলা দেয় কিন্তু তাহাতে আর কোনও উৎসাহ নাই—এমন কি সাত দিনের সাত বোতল 'ভাইনাম প্যাডি' যেমন ছিল তেমনি রহিল—এক ফোঁটাও কমিল না—দমদিবার কলকে গুলি ব্যবহারের অভাবে ময়লা হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। মাষ্টারের চেহারা যেন আধখানা হইয়া গেল। কোনও ফন্দীই মাথায় যে ছাই আসে না!

এমন সময় মাষ্টার শুনিল গ্রামের বাচস্পতি মহাশয় কাশী যাইতেছেন। বাচস্পতি মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী মাষ্টারের জানা ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় বাচস্পতি মহাশয় অনেককে ধর্ম্মের জন্য ও অধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় এবং দায়ে পড়িয়া কাশীবাসিনী করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ এ দিকে যে তাঁর ভয়ানক ঝোঁক তাহার প্রমাণ লক্ষ্মী মাষ্টার অভিনয় কালেও পাইয়াছে। সখীদের নাচ দেখিতে বাচস্পতির ভয়ানক আগ্রহ, এমন কি নাচের মহলায়ও আসিয়া বাবুদের লোকশিক্ষার ব্রত যে যোগের ও ধর্ম্মেরই অঙ্গ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কিশোরী ভজন ব্যাপারেও বাচস্পতি অগ্রণী ছিলেন। অথচ সমাজের লোককে (বিশেষতঃ নারী হইলে) আটকাইবার জন্য তাহার আগ্রহ সকলের উপরে—নতুবা যে সমাজ রক্ষা হয় না।

বাচস্পতি মহাশয় যেদিন সন্ধ্যায় যাত্রা করিলেন সেদিন মাষ্টার অসুস্থতার ভাণ করিয়া ছুটি লইয়া নিজের শয্যায় শুইয়া রহিলেন। যখন সবাই মহলা দিতে ব্যস্ত তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া মুখখানা পেণ্ট করিয়া পরচুল পরিয়া নারী বেশে সজ্জিত হইল। সাজ সজ্জার ও অভাব নাই—তার উপর নৃত্যশিক্ষকটী আবার একজন ভাল মেক্‌আপ আর্টিষ্ট। রমণীর ছদ্মবেশ হইয়াছিল নিখুঁত। সন্ধ্যার অন্ধকারে গয়নার নৌকার (পূর্ব্ব বঙ্গের সেয়ারের নৌকা) ঘাটের পথে এক বটবৃক্ষের অন্তরালে বাচস্পতি মহাশয়কে দেখিয়া সে তাঁহার পায়ে পড়িয়া নানা মিথ্যা ছলনায় তাহাকে বুঝাইল যে সংসারের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সে কাশী যাইবে—সঙ্গে অনেক গহনা—(থিয়েটারের জন্য আনীত মেকী এক গিল্‌টীকরা গহনা দেখাইল)—বাচস্পতি প্রথমটা ইতস্ততঃ করিলেও লোভটা ছাড়িতে পারিল না। ইহা ছাড়া বাচস্পতি বহুদিন যাবত এই

কাজের কাজী ছিল। রমণীটিকে বলিয়া দিল, সে যেন গহনার নৌকায় উঠিয়া এমন ভাব দেখায় না যে, সে বাচস্পতির সঙ্গে চলিয়াছে। কি জানি, স্থানীয় লোকেরা যদি কেউ কিছু সন্দেহ করিয়া বাচস্পতির চরিত্রে দোষারোপ করে। জাহাজে উঠিয়া বাচস্পতি সব ঠিকঠাক করিয়া দিবে তাহার কিছু চিন্তা নাই। টিকেট কাটিল বাচস্পতি নিজের পয়সা দিয়া রমণীকে মেয়েদের ঘেরা ঢাকা কামরায় রাখিয়া আসিল—একবার জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম—ক্ষেমঙ্করী—। হায়, হায়, তারপর! প্রভাতে দেখিল জাহাজে তাহার ক্ষেমঙ্করী নাই—অনেক তালাস করিল—পাইল না। টিকেটের টাকাটাই লোকসান হইল। ইহার জ্বালায় বাচস্পতি অনেক দিন জ্বলিয়াছিলেন।

মাষ্টারের পলায়নের পর বাবুদের নাটকাভিনয় ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল কারণ একজন দক্ষ লোক না হইলে নাকি থিয়েটার চলে না এবং লক্ষ্মীমাষ্টারের মুখে গল্প শুনিয়া কলিকাতার কোন মাষ্টার আর সেই দেশে যাইতে স্বীকৃত হইল না।

গুরু চাই

বেতাল ভট্ট

গুরু চাই, গুরু চাই কোথা গেলে গুরু পাই,
গুরু বিনা ভেউভেউ কাঁদে সারা প্রাণটা।
তরুহীন মরুসম গুরুহীন মন মম,
উসখুস সুড়সুড় করে ডা'ন কাণটা।
পাঠশালা হ'তে সুরু, কলেজেও ছিল গুরু,
ফুটবলে গুরু ছিল 'দন্তপ্রফুল্ল,'
প্রিয়তমা যৌবনে গুরু ছিল গৃহকোণে,
চাকরীতে ছিল গুরু সাদা শিবতুল্য।
আজি মোর গুরু নাই বুক দুরু দুরু তাই
ভবনদী খেয়াঘাটে কেমনে বা তরবো?
এক পা চলিনি কভু গুরুছাড়া কই প্রভু?
হাত ধরো। কোথা যাই? কারে গুরু ধরবো?
কত শত স্থলচর তরী ছাড়া জলচর,
সবি যে খেয়েছি, গোটা গোটা রামপক্ষী,
কাসিম মিঞার হাতে খেয়েছি মেমের পাতে
গুরুছাড়া পরকাল কেমনে বা রক্ষি?
খেয়েছি অনেক ঘুষ ভয়ে কাঁপে ফুসফুস,
কারে ঘুষ দেব আজ পরলোক কিনতে।
ঢালিবারে লাল পানি কাঁপে ভরে হাতখানি
কাহার প্রসাদী করি খা'ব নিশ্চিন্তে?
শিরে চুল নেই কালো, হজম হয় না ভাল;
কাহিল হয়েছে দেহ, পড়ে' গেছে দন্ত,
অর্শে শোণিত ঝরে, বুক ধড়ফড় করে,
কোথা গুরু, কোথা গুরু, হায়রে, হা হন্ত!
পুরী কাশী কোথা যাবো? কোথা গেলে গুরু পাবো?
বেলুড় কি বোলপুর, কোথা গিয়ে খুঁজব?
শ্মশানে কি মন্দিরে মঠে, ঘাটে, নদীতীরে
কোথা গিয়ে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ পূজবো?
ন্যাড়া মাথা পাকা দাড়ী কারে ধরি কারে ছাড়ি
মাপিয়া দেখিব কার জটা কত লম্বা?
হাঁচিতে, তুলিতে হাই, কিবা জপি ভাবি তাই
'জয় রাধে' বলিব কি 'জয় জগদম্বা'!
গুরু মোর পা'ব যবে জানিনা কি হ'তে হবে
সৌর কি শাক্ত কি বৈরাগী শৈব।
কার উপদেশামৃতে সাহস পাইব চিতে?
কার কথা গিন্নীরে রাতদিন কৈব?
আমি এত খাই ব'কে মিথ্যাই ভাবে লোকে,
বিশেষতঃ শালাশালী উড়ায় তা হাস্তে,
গুরু পেলে বেশ জোরে সে নামে শপথ ক'রে,
চালাব সকলি নাহি ডরি টীকাভাষ্যে।
তা'ছাড়া ভক্তব'লে নামডাক নাহি হ'লে,
পশার খাতির খ্যাতি কেমনে আকর্ষি?
লোকে যে দেয়না দেনা, ধারে এটা ওটা কেনা,
চলেনা; সেয়ানা কিনা যত পাড়াপড়শী।

গুরু নিয়ে কারবার আনে কিছু রোজগার,
গুরুকৃপা মূলধন এ বয়সে সার যে,
গুরুর দোহাই দিলে সদয় বেহাই, মিলে
অল্প টাকায় মেয়ে হ'য়ে যায় পার যে।
পারাকে কে সোণা করে ছাই দিয়ে রোগ হরে,
আঙুল ঘষিয়া বা'র করে নানা গন্ধ,
করে কেবা প্লেগ রদ, দুধকে কে করে মদ,
কোথা পা'ব অবধূত অদ্ভুতানন্দ।
লয়ে পৈতৃক বাড়ী মাম্‌লা বেধেছে ভারী
খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়াদের সঙ্গে,
এ বিপদে গুরু বিনা উপায় ত দেখছি না,
গুরু গুরু ডাক ছাড়ে প্রাণের মৃদঙ্গে!
গুরু চাই, গুরু চাই চাই 'বড় গুরু-ভাই'—
ডেপুটী দেওয়ান জজ বড় বড় চাকরে',
ছেলেদের চাকরীর কিছুই হয়নি স্থির,
ছিপে লাগাতে হবে তাহাদের পাকড়ে'।
'গুরু-ভাই' মিলে, আর যদি রাজা জমিদার
পেট ভ'রে খেয়ে নিই চড়ি গাড়ী হস্তী।
মহাজনে বলি তবে "কার সাথে, দেখ সবে
দহরম মহরম গলাগলি দোস্তি।"
বুকে জ্বলে দিবানিশা গুরু ভজনের তৃষা
গুরুছাড়া ভবভার লঘু কেবা কর্‌বে?
পাদোদক করি পান পদরজে করি 'স্নান',
ধরারে দেখিব সরা কবে গুরু-গর্ব্বে? *

---

* পরমার্থিক কল্যাণের জন্য যাঁহারা গুরু খুঁজেন তাঁহারা যেন রাগ করিবেন না। লেখক।

সমস্ত দিন মস্তিষ্ক চালনের পর—
যখন—
মাথায় আগুন জ্বলে
তখন স্থির করিবেন যে আপনার মস্তিষ্ক ক্ষুধার্ত, সে পুষ্টিকর খাদ্য অন্বেষণ করিতেছে—তখন যা' তা' তেল মাখিলে সে ক্ষুধা তৃপ্ত হবে না,
তখন,—
ব্যানার্জ্জীর উপমাহীন
নিরুপমা
ব্যবহার করা উচিত, কারণ যাবতীয় কেশ তৈলের মধ্যে একমাত্র ইহাই প্রকৃত উদ্ভিজ্জ তৈলে প্রস্তুত—অধিকন্তু ইহা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সংশোধিত হয় বলিয়া ইহা কেশমূলে সহজে প্রবেশ করে চুলের গোড়া শক্ত করিয়া চুল উঠা বন্ধ করে, রুগ্ন কেশমূলকে সঞ্জীবিত করিয়া নূতন কেশ উৎপন্ন করে—শ্রান্ত মস্তিষ্ককে শান্তিদান করে, সেইজন্য সকল রকম মাথার যন্ত্রণা শীঘ্র তিরোহিত হয়—তাই মাথার যাতনা এই তেল
মাখলে ঠাণ্ডা হয়
মনোহারী দোকানে ও ডাক্তারখানায়
এক টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়
স্থানীয় দোকানে না পাইলে আমাদের পত্র লিখুন—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩ নং স্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা